তিমির-বলয়

তিমির বলয়

শ্রী সরোজকুমার রায়চৌধুরী

বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ
২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

সুহৃদ্বরেষু

এই উপন্যাসটি ১৩৬২ সালের শারদীয়া 'জন্মভূমি'তে
'বনহরিণী' নামে সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

—প্রকাশক

খেয়াঘাটের ঠিক উপরেই অনেকগুলি তেঁতুলগাছ এমন [illegible] ব্যূহ রচনা করেছে। জ্যৈষ্ঠের খর মধ্যাহ্নেও তার নিচে অনেকখানি স্থানে নিবিড়, কোমল, স্নিগ্ধ ছায়া বিছিয়ে রাখে। গ্রামের প্রবীণেরা সেখানে বসে তাস-পাশা-দাবা খেলেন হুঁকো হাতে। ছোট গ্রাম। এবং ছোট গ্রামের বারোয়ারী বৈঠকখানা এইটেই। এইখানে বসেই গ্রাম্য-সমস্যার আলোচনা এবং মীমাংসা হয়। নিচে, গভীর নিচে অনেকখানি বালুচর রোদে চিকচিক করে। শীতের সকালে প্রথম রোদ ওইখানেই এসে পড়ে। তাই ওখানেই লোকে গরু বাঁধে।
সেই বালুচরের কোল ঘেঁষে শীর্ণ নদী মন্থর ছন্দে বয়ে চলে।
এপার থেকে বালুচরে বাঁধা গরুগুলি, তেঁতুল বন এবং তারই ফাঁক দিয়ে একটি ছোট কুটিরের খড়ের চালের কিয়দংশ যেন ছবির মতো মনে হয়।

জ্যৈষ্ঠের শেষের দিক।
তখনও অল্প খানিকটা রাত্রি আছে। নদীর উপর অন্ধকারের আবরণ কিছু ফিকে হয়ে এসেছে। যে অসংখ্য বাদুড় সমস্ত দিন মাথা নিচু করে তেঁতুল গাছের ডালে ডালে ঝোলে এবং সন্ধ্যা হলেই খাদ্যান্বেষণে বাইরে বেরিয়ে যায়, তাদের প্রথম দলটি এইমাত্র ফিরল। কিন্তু পাখির কণ্ঠে এখনও কাকলি ফোটে নি। নীড়গুলি নিস্তব্ধ।
সমস্ত দিনের অসহ্য গরমের জের প্রথম রাত্রির অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে। লোকের ঘুম আসতে দেরি হয়। শেষ রাত্রের ঝিরঝিরে হাওয়ায় সকলেরই ঘুমটা খুব গাঢ় হয়। . . .

সারা গ্রামে এখন তাই প্রাণস্পন্দনের চিহ্ন নেই। মনে হচ্ছে যেন একটি অপ্রগলভা মেয়ে তেঁতুলগাছগুলির পায়ের তলায় শান্তভাবে ঘুমুচ্ছে, তার কোলের কাছে শিশু নদী।

কিন্তু অদূরে ওই ছোট কুটিরে কারা যেন জেগেছে। কাদের যেন চাপা সুরের কথাবার্তা, সন্তর্পণে চলা-ফেরার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

নদীর ধারে তেঁতুল বনের অদূরে এই যে আখড়া, এ প্রেমদাসের নিজের তৈরি নয়। বিবাহসূত্রে এইখানে এসে বাস করছে। সেই কথাই অবরুদ্ধ নিম্ন কণ্ঠে রাধারাণী বলছিল :

—ছেড়ে যাওয়া কি সোজা কথা গো। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে কত খেলাধূলো! মা মারা গেল, বাবার কাছে গান শেখা। তারপরে একদিন তুমি এলে, কি দুর্দিন সেদিন! মনে পড়ে?

মনে না পড়ার কিছু নেই। প্রেমদাস এই গ্রামে এসেছিল ভিক্ষায়। শুনলে এখানে কৃষ্ণদাস বলে একটি বোষ্টমের খুব অসুখ। দেখতে এল তাকে। ডাক্তারে বললে, বাঁচার কোনো আশা নেই। বড় জোর দুটো-তিনটে দিন। প্রেমদাসের আর ফিরে যাওয়া হল না। এবং কৃষ্ণদাস যখন অসহায় কন্যার কথা ভেবে ব্যাকুল হচ্ছিল, তখন প্রেমদাস নিজে থেকেই প্রস্তাব করলে, তোমার রাধারাণীর ভার আমি নিলাম। মৃত্যুপথযাত্রীর চোখ আনন্দে ছল ছল করে উঠল। সেই রাত্রেই কৃষ্ণদাসের সামনে উভয়ের মালাবদল হয়। পরের দিন কৃষ্ণদাস চিরকালের জন্যে চোখ বন্ধ করলে।

কি দুর্দিনই গেছে!

প্রেমদাস বললে, এক দুর্দিনে পথ থেকে তোমার আখড়ায় এসেছিলাম তোমাকে সাহস দিতে। আর এক দুর্দিনে আখড়া থেকে তোমাকে নিয়ে বার হচ্ছি। এই কি সোজা দুর্দিন গো!

রাধারাণী এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে। বললে, পরিতোষের ছোট ছেলেটা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে গেল, না গো?

—তাই তো সবাই বলছে।

—কিন্তু সে গেল না দেখ গাঁ ছেড়ে। যাবেও না।

—না বোধ হয়।

—তবে আমরা কেন যাব ? আমাদের ছেলে নাই, মেয়ে নাই, দুটো পেট, দু' মুঠো শাকপাতেও ভরবে না ?

প্রেমদাস শান্ত কণ্ঠে বললে, কাল পর্যন্ত ভরেছে। কিন্তু আর বেশি দিন ভরবে না। দেখছ না, পুকুরগুলো কি রকম তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে আসছে ? ওর শাকই হয়েছে গোটা গাঁয়ের সম্বল।

রাধারাণী একথার সত্যতা উপলব্ধি করলে মনে মনে। যাদের জমি নেই, দিনমজুরি করে খায়, তারা কবে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। বলে, শহরে গেছে। পালাতে পারেনি, শুধু জমি আর একখানা খড়ের ঘরের মমতায়, তারাই যারা এখনও ভরসা করছে, আষাঢ়ে আবার বর্ষা নামবে, শুকনো মাঠে আবার লাঙল চলবে, আশ্বিনে আউশ উঠবে, তখন দুটো পেট ভরে খেতে পাবে, কচুসিদ্ধ আর নতুন আউশের লাল লাল ভাত।

কিন্তু সত্যই কি সেই ভরসায় ?

এরা মেঘ চেনে। যে মেঘ জল ঢালে, ফসল ফলায়, আকাশে তার চিহ্নমাত্র নেই। জ্যৈষ্ঠ শেষ হতে চলেছে। কিন্তু সেই খর রোদ কোথায়, যে রোদ মানুষের নিশ্বাস নেওয়া পর্যন্ত কষ্টকর করে তোলে ? সেই দুঃসহ উত্তাপ বর্ষার জলভরা মেঘ ডেকে আনে। এ যেন কেমন ছায়া-ছায়া, মিঠে-মিঠে। এর ধরণই আলাদা।

না, বৃষ্টির ভরসা ওদের মনে নেই। নিজেদের মধ্যে যখন আলোচনা করে তখন সেই হতাশাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। আবার বাড়ি ফিরে বৃষ্টির কথা বলে পরিজনদেরও প্রবোধ দেয়, নিজেদেরও স্তোক দেয়। এ তো রাধারাণীর নিজের কানে শোনা।

তবু তারা গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছে না। কেন ? বৃষ্টির ভরসায় নয়, মাটি ওদের টানছে। সেই মমতা গাছগুলোর মতো ওদেরও যেন বেঁধে রেখেছে। নড়তে দিচ্ছে না।

প্রেমদাস সেই কথাই রাধারাণীকে বললে।

জানালা খুলে দিয়ে রাধারাণী দূরের বালুচরের দিকে চেয়ে ছিল। বললে, আমারও তো তাই হয়েছে গো। কে যেন আমার পা ধরে টানছে। নড়তে নারছি। যাব মনে করলেই বুকের ভেতরটা কেমন টনটন করছে।

গম্ভীর কণ্ঠে প্রেমদাস বললে, বোষ্টমের মায়া রাখতে নাই রাধু। আমাদের ঘর আর পথ এক। চল, ভোর হবার আগে পালাতে না পারলে গাঁয়ের লোক আটকাবে।

রাধারাণী মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর মুখ তুলে সে আবছা অন্ধকারেই ঘরখানার চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে।

প্রেমদাস হাসলে। বললে, কি দেখছিস? কি হীরে-মাণিক আছে তোর ঘরে? সারা রাত নিজেও ঘুমুলিনে, আমাকেও ঘুমুতে দিলিনে।

রাধারাণীকে প্রেমদাস তুই-তুকারি করে না সাধারণত। কিন্তু যখন ওকে খুব ভালো লাগে, তখন করে।

রাধারাণী বললে, হীরে-মাণিকই আছে গো, তারও চেয়ে বেশি। তুমি তার কি বুঝবা? তুমি তো এ বাড়িতে মানুষ হও নাই, উড়ে এসে জুড়ে বসেছ। তোমার চোখে পড়বে ক্যানে? আমার চোখে নিত্যি পড়ে। কত হীরে-মাণিক আছে।

প্রেমদাস হেসে বললে, থাকে থাক। আমরা শুধু ভিক্ষের ঝুলি আর একতারা নিয়ে বেরুব। আর দেরি কোরো না। চল।

রাধারাণী তথাপি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দূরের নদীর দিকে চেয়ে। বললে, নদীতে একটা ডুব দিয়ে এলে হত না?

প্রেমদাস সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, এত ভোরে?

—হ্যাঁ।

—তারপর কাপড় শুকুবা কি করে?

—গায়ে-গায়েই শুকিয়ে যাবে। এখনও রাত আছে একটু, টক্ করে আসি না একটা ডুব দিয়ে?

প্রেমদাস হাসলে। বললে, ওই নদী খুঁটে বেঁধে নিয়ে যেতে পারবি ?

—পারলে যেতাম। অমন জল কোথাও পাবা না গো !

—না। পিথিমিতে আর তো নদী নাই। ওই একটিই আছে !

প্রেমদাস ওর কাছে এসে ওর কাঁধে একখানা হাত রাখলে। বললে, গোসাই বলেন, যা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না, তার ওপর মমতা রাখতে নাই। কতদিন বলেছেন। শোন নাই ?

প্রেমদাস গোঁসাইএর উদ্দেশে প্রণাম জানালে।

রাধারাণী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, বলুন গা। বলা সওজ। গোঁসাই তো মেয়ে হয়ে জন্মান নাই ! তাহলে বুঝতেন।

হতাশভাবে প্রেমদাস কাঁধের ঝুলিটা খুলে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলে। বললে, তাহলে থাক। গিয়ে কাজ নাই। যা হবার এখানেই হবে।

রাধারাণী স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। প্রেমদাসের কথা যে ঠিক, সে বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। এ অঞ্চলে ভিক্ষা আর পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাচ্ছে না। কে ভিক্ষা দেবে ? সাধারণ গৃহস্থ, যারাই প্রধানত ভিক্ষা দিয়ে থাকে, তাদের ঘরে চাল নেই। তাদের নিজেদেরই দিন চলে না। ধনীরা চতুর্গুণ দামে চোরাবাজারে চাল বেচছে। মানুষ মরে মরুক। মানুষকে বাঁচাবার দায় ভগবানের, মানুষের নয়। নিজেদের লোহার সিন্দুক টাকায় ভরে উঠলেই তারা খুশি। হলই বা কালো টাকা। টাকার কি কালো-ধলো আছে ?

বাঁচতে হবে। জীবন বৈষ্ণবের কাছে অমূল্য সম্পদ। বেঁচে আছে বলেই সে ভগবানের নাম গান করতে পারে। নাম গান করবার জন্যেই তার বেঁচে থাকা। বাঁচবার জন্যেই প্রেমদাস এখান থেকে পালাতে চায়।

রাধারাণী বোঝে সেকথা। কিন্তু মন মানে না।

হঠাৎ সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তীরের মতো ছিটকে। উপুড় হয়ে পড়ল তুলসীতলায়। কি প্রার্থনা জানালে ঠাকুরের কাছে সেই জানে। কিন্তু কাঁদলে অনেকক্ষণ।

তারপর ফিরে এসে একতারা আর ঝুলিটা প্রেমদাসকে দিলে।

ভারী গলায় বললে, চল যাই।

প্রেমদাস বাঁ কাঁধে ঝোলা এবং ডান হাতে একতারাটা নিয়ে নিঃশব্দে বাইরে এসে দাঁড়াল।

অন্ধকার অনেকখানি ফিকে হয়ে এসেছে। গাছে গাছে দু'একটি পাখি পাখা ঝাপটাচ্ছে। ঘুম ভাঙ্গছে বুঝি।

চলে যাবার জন্যে এতক্ষণ প্রেমদাসের যেন একটা জেদ চেপেছিল। এখন, যখন রাধারাণী ঘরের জানালা বন্ধ করেছে, তার একবার মনে হল, বলে. আজ থাক বরং। কাল গেলেই চলবে। আজকের মতো দু'টি চাল তো রয়েছে।

কিন্তু বলা দূরে থাক, কথাটা ভালো করে ভাববারও যেন সময় পেলে না। রাধারাণী চক্ষের পলকে একমাত্র জানালাটি বন্ধ করে দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা আঁচলে বেঁধে ফেললে। এবং কিছুই না বলে, কোনো দিকে না চেয়ে, আগে আগে চলতে লাগল।

মাধবীতলার কাছে এসে প্রেমদাস বরং একবার দাঁড়ালে। জলের অভাবে লতাটি শীর্ণ হয়ে এসেছে।

কিন্তু রাধারাণী নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে নদীর পথে। কোনোদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

তেঁতুল বনের নিচেই নদীর বালুচরে যেখানে শীতকালে গরু বাঁধা হয়, সে যায়গাটা এখন শূন্য। কিন্তু জলের ধারে কাল বিকালে ছেলেমেয়েরা যে বালির ঘর তৈরি করেছিল, তার চিহ্ন রয়েছে। নিচে থেকে জল উঠে বালির ঘর ভেঙে গেছে। গর্তটা জলে ভর্তি। কিন্তু চিহ্ন রয়েছে।

প্রেমদাস সেই ভাঙা ঘরগুলির দিকে চেয়ে হাসলে। এই সংসার যে

ধোঁকার টাটি, এই রকম কোনো দার্শনিক তত্ত্ব হয়তো বা তার মনে এসে থাকবে।

রাধারাণী কিন্তু সোজা হাঁটু জলে নেমে পড়ল। চোখে-মুখে অনেক বার জলের ঝাপটা দিলে। কানের কাছটা গরম হয়ে উঠেছিল। সেখানেও ভিজা হাতটা কয়েক বার বুলোলে। তারপর প্রেমদাসের পিছু পিছু নদী পার হল।

নদীতে জল বেশি নেই। সব জায়গায় হাঁটুও ডোবে না।

তারপরে আরম্ভ হল হন হন করে হাঁটা।

নতুন হাট, কুমড়োপোতা। তারপরে বেলতলি।

ভিক্ষাসূত্রে কুমড়োপোতা পর্যন্ত প্রেমদাসের যাওয়া-আসা আছে। বেলতলি অনেক দূরে পড়ে যায়। কানসোনার মেলা যাওয়ার পথে একবার মাত্র সে বেলতলির উপর দিয়ে গেছে। মনে পড়ল, গ্রামের ও প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড বড় বটগাছ আছে। শাখায় প্রশাখায় এবং ঝুরিতে গাছটি অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে। এত বড় বটগাছ সে জীবনে কখনও দেখেনি।

বেলা হয়েছে খানিকটা। রোদে-গরমে রাধারাণীর সুন্দর মুখখানি আরক্ত হয়ে উঠেছে। আরও একটা মাঠ পার হওয়া যায়। কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে প্রেমদাসের আর এগুতে ভরসা হল না।

একটা দিনের মতো চাল তার ঝুলিতেই রয়েছে। মাটির উনান করে দু'টি ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিতে গেলে ওই বটবৃক্ষতলের মতো স্থান হয়তো সামনের গ্রামে পাওয়া যাবে না। দীঘির জলের মতো অমন সুন্দর জলও পাওয়া দুষ্কর।

রাধারাণীর দিকে চেয়ে বললে, কষ্ট হচ্ছে?

—কষ্ট হবে ক্যানে? হাঁটি না নাকি?

—মুখখানা তো কামরাঙার মতো লাল টকটক করছে।

—নিজের মুখতো দেখতে পেছ না?

রাধারাণীর মন প্রসন্ন নয়।

হেসে প্রেমদাস বললে, গাঁ পেরুলেই মস্ত বড় দীঘি আছে। তার পাড়ে প্রকাণ্ড বটগাছ। দুপুরে সেইখানে দুটি ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নেওয়া যাবে, কি বল ?

রাধারাণী সাড়া দিলে না। প্রেমদাস বুঝলে, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বটের ছায়ায় গুণ গুণ করে একখানি গান শুনিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত ওর মন প্রসন্ন হবে না।

কিন্তু তার আগেই রাধারাণীর মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। গ্রাম পার হতেই দূর থেকে বটের ঘন ছায়ায় ওর চোখ জুড়িয়ে গেল। আর তারই নিচে টলটল করছে দীঘির স্নিগ্ধ জল।

বললে, ওই গাছটার কথা বলছ ?

—হ্যাঁ। দেখেছ এত বড় বটগাছ কখনও ?

মুগ্ধ দৃষ্টিতে গাছটির দিকে চাইতে চাইতেই রাধারাণী আসছিল। একটা হোঁচট সামলে স্বীকার করলে, না।

গাছের তলায় আসতেই ছায়া যেন রাধারাণীর অঙ্গ থেকে সমস্ত পথশ্রম মুছিয়ে নিলে।

সামনেই দীঘি। ক'টি ছেলে ঝাঁপাঝাঁপি করে ঘাটের জল ঘুলিয়ে তুলেছে। কিন্তু দূরে স্বচ্ছ জল সূর্যকিরণে ঝিকমিক করছে।

পাশে ঠাকুরবাড়িতে মধ্যাহ্নআরতির ঘণ্টা বাজল।

প্রেমদাস বললে, ঠাকুরবাড়ি আছে।

—হ্যাঁ। দুটি পেসাদ পাওয়া গেলে এই দুপুরে আর রাঁধতে হত না।

রাধারাণী চোখ টিপে হাসলে।

মুগ্ধ নেত্রে প্রেমদাস ওর নৃত্যপরা চক্ষুতারকার দিকে চেয়ে রইল।

—কি দেখছ ?

—তোমার হাসি।—প্রেমদাস বললে, অমন করে চোখ নাচিয়ে বুঝি অনেক দিন হাস নাই। কেমন যেন নতুন ঠেকল।

—আহা !

রাধারাণী লজ্জিত ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তারপর বললে, হাসি না দেখে যাতে কাজ হয় তাই দেখ।

—কিসে কাজ হয়?

—ঠাকুরবাড়িতে পেসাদ পাওয়া যায় কি না তাই দেখ।

—তুমিও যেমন! ঠাকুর নিজেই দুটি ভাত পেছেন কি না তারই ঠিক নাই।

তবু প্রেমদাস উঠল। মাত্র একটি দিনের চাল আছে ওদের কাছে। শহরে পৌঁছুতে ক'দিন লাগবে কে জানে। কে জানে পথে কোথাও ভিক্ষা পাওয়া যাবে কি না। সুতরাং ফাঁকতালে একবেলা প্রসাদে চলে গেলে মন্দ কি!

জয় রাধে কৃষ্ণ! জয় রাধে কৃষ্ণ!

পূজারী ব্রাহ্মণ মুখ ফিরিয়ে চাইলে। প্রেমদাস তখন ভক্তিভরে প্রণাম করছে।

প্রণামান্তে মূর্তির দিকে চেয়ে প্রেমদাস গদগদ কণ্ঠে বললে, বড় সুন্দর মূর্তি ঠাকুর মশাই! বৃন্দাবনের তৈরি?

ভোগের ব্যবস্থা দেখে ঠাকুর মশায়ের মেজাজ খারাপ ছিল। ভোগের জন্যে দেওয়া হয়েছে পোয়া পাঁচেক চাল, আধ ছটাক ডাল, দুটো কচু আর একটা কাঁচকলা। এর আবার অর্ধেক সেবাইত নিয়ে যাবে। বিগ্রহের হয়তো এতেই চলে যাবে, কিন্তু পূজারীর চলে কি করে?

রেগে বললে, কে জানে কোথাকার তৈরি!

বলেই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আর একবার ভোগের দিকে চাইলে।

প্রেমদাস বুঝলে, প্রসাদ দূরের কথা আর একটা কথা বললে অপমানিত হতে হবে। ঠাকুর মশায়ের মেজাজ সুবিধার নয়।

ও ফিরে আসবে এমন সময় রাধারাণী ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

প্রেমদাস বললে, অনেক কালের মন্দির। মনে হয়, মূর্তি বৃন্দাবনের তৈরি। বেশ চমৎকার, নয়?

—হ্যাঁ।

বলে রাধারাণী মন্দিরের উঁচু দাওয়ায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। তার কণ্ঠ থেকে ছোট্ট ওই এক ফোঁটা কথা 'হ্যাঁ', কিন্তু তার সুরটা যেন তীরের মতো পূজারীর পিঠে গিয়ে বিঁধল। মানুষের চোখ পিছন দিকে থাকে না কেন, জানি না। একটা সামনে, একটা পিছনে থাকলেও চলত। পরিশ্রম বাঁচত। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার কী যে খেয়াল, দুটো চোখই তিনি পাশাপাশি সামনে দিকে বসিয়ে দিয়েছেন!

সুতরাং রাধারাণীর কণ্ঠস্বর শোনা মাত্র চোখ দুটো যেন একটা ঝটকা দিয়ে মুণ্ডটাকে ঘুরিয়ে দিল ওদের দিকে। মানে, সত্য করে বলতে গেলে রাধারাণীর দিকে।

এবং তারপর কিছুক্ষণ সে চোখে আর পলক পড়ল না।

রাধারাণীর প্রণাম হয়ে গিয়েছিল। নিঃশব্দে প্রেমদাসের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

পূজারীর অপ্রসন্নতা কেটে গেছে। জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছ, বৃন্দাবনের তৈরি মূর্তি কি না? ঠিক ধরেছ! এ মন্দির আজকের নয় হে, অনেককালের। ছোট ছোট ইট দেখে বুঝছ না? তখন বাবুদের অবস্থা ভালো ছিল, ভোগরাগের জুৎ ছিল। এখন বাবুরাও কাবু, ভোগও ঢোঁ ঢোঁ।

লোকটা বড় বড় দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

প্রেমদাস বললে, তাই দেখছি। ভেবেছিলাম, অনেক রাস্তা হেঁটেছি। শরীরও ক্লান্ত। দুটি পেসাদ পেলে ভালো হত। তা যে রকম বললেন,

- তাতে কি হয়েছে! তাতে কি হয়েছে!—পূজারী ব্যস্ত হয়ে উঠল,
- তোমাদের দু'জনের জন্যে দুটি পেসাদ কি আর হবে না? খুব হবে। আগে কত সাধু-সন্নিসী, বাউল-বোষ্টম আসত। পাঁচদিন সাতদিন থাকত। আমরাই দেখেছি, হাতি চড়ে, উটে চড়ে সন্নিসী আসতে। বড় বড় সাধু-মহান্ত! জটা কী! ডাক কী! যেন সিংহের গর্জন। আমরাই দেখেছি! তা সে রামও নাই, অযুধ্যাও

নাই। অতিথিশালাও ভেঙে গেল সেবারের ভূমিকম্পে। বাবুদেরও সে বোলবোলা নাই। সদাব্রতও বন্ধ। তাহলেও তোমাদের দুজনের জন্যে কি আর হবে না? আমি যতদিন আছি, ততদিন হবে। তোমরা চান-টান করে এস। আমি রান্না চড়াব, কি নামাব।

পূজারী অবিবাহিত। অর্থাৎ এই দুর্দিনেও তার মতো পাত্রের হাতে কন্যাসম্প্রদানে কেউ রাজি হয়নি। এইখানে ঠাকুর সেবা করে। তাতে দুবেলার অন্নসংস্থান হয়। আর মাইনে যে-টাকা পায়, তাতে গাঁজাটা-আশটা হয়ে যায়।

এদের দুজনের জন্যে প্রসাদ বিতরণ করলে তার রাত্রের ভাতটা থাকবে না নিশ্চয়ই, দিনের ভাতেও কিছু ঘাটতি হতে পারে। কিন্তু রাধারাণীর মুখখানি দেখা পর্যন্ত সেকথা সে আদৌ ভাবছিল না। ভাবছিল, কচু এবং কাঁচকলা দিয়ে কিই বা রাঁধা যেতে পারে! আর এই দিয়েই বা মানুষ খাবে কি করে?

হঠাৎ তার মনে পড়ল, কুঞ্জ ঠাকরুণের গাছে ফুল তুলতে গিয়ে দেখে এসেছে, তাঁর বেগুন গাছে ক'টি শলি বেগুন ধরেছে। খুব পুষ্ট এখনও হয়নি, কিন্তু নিতান্ত জালিও নয়।

কুঞ্জ ঠাকরুণের বয়স সত্তর পেরিয়ে গেলেও দৃষ্টি খুব প্রখর এবং সতর্কতারও অন্ত নেই। কিন্তু এই সময় তিনি নিশ্চয় রান্নাঘরে ব্যস্ত। ক্রমাগত যাতায়াতের ফলে পূজারীর উপর সন্দেহও কম। খিড়কি দিয়ে চুপি চুপি যেতে পারলে,

একটু তামাক খাবার খুব ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু সে-তৃষ্ণা সে সম্বরণ করলে। না! আর দেরি করা সমীচীন নয়। ঠাকুরঘরের শিকলটা তুলে দিয়ে সে একটা গোঁত্তা মেরে বেরিয়ে পড়ল।

বেশি কিছু নয়,—কাঁচকলা সিদ্ধ, কচুর তরকারি আর ডাল।

পূজারী কুণ্ঠিতভাবে বললে কিছুই নাই। খেতে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে বাবাজি।

—কষ্ট !—প্রেমদাস হাঁ করে উঠল,—ও কথা বলবেন না। অপরাধ হবে। অমেত্ত, যার নাম পেসাদ ! এমন কচুর দম জীবনে খাই নাই। একটু গব্যঘৃত পড়েছেন বোধ হয়।

কচুর দম ! পূজারী ব্যস্ত হয়ে উঠল ! দম কাকে বলছে ? দম নয়, তরকারি। গব্যঘৃত দূরে থাক, তেল পর্যন্ত পড়েনি। পাছে পুড়ে যায়, সেজন্যে কত কসরৎ যে তাকে করতে হয়েছে, সে শুধু সেই জানে আর নারায়ণ জানেন। তাকেই বাবাজি বলছে অমৃত !

পূজারী আনন্দে যেন লাফাতে লাগল।

—কচুর দম আর একটু দিই।

—বিলক্ষণ ! আর নয়। পেটে তিল ধারণের জায়গা নাই। কি চমৎকার আপনার হাতের রান্না !

—ছাই রান্না ! কিন্তু লজ্জা করছ না তো ?

—লজ্জা !—এবারে প্রেমদাস একটা হুঙ্কার ছাড়লে,—খেতে বসে লজ্জা আমাদের সাত পুরুষের কেউ কখনও করে নাই। জানেন ?

—কিন্তু তোমার বোষ্টুমি যেন লজ্জা করছে।

সেরকম সন্দেহ প্রেমদাসেরও হচ্ছে। ভাবলে, বোধ হয় অন্য লোকের সামনে তার সঙ্গে খেতে বসার জন্যেই।

মুখে বললে, না লজ্জা করবে ক্যানে। অমনি ওর খাওয়া ছিরিক-ছিরিক ! মা-মরা মেয়ে, বাপের আদরে মানুষ, তাই বুঝি।

—যাও, বাজে বোকো না—ভ্রূকুটি করতে গিয়েও রাধারাণী হেসে ফেললে।

—এই তো হাসে ! ওই তো তোমার বোষ্টুমি হাসে !

আনন্দে পূজারী যেন নাচতে লাগল। ওরা দুজন অবাক !

ওরা খেতে বসেছিল ভাঙা নাটমন্দিরের একাংশে। সাধারণত এ সময়টা ঠাকুরবাড়ি এবং নাটমন্দির নির্জন থাকে। ঠাকুরের সেবা হয়ে যায়, পূজারীও ভোগ নিয়ে বাড়ি চলে যায়। ক'টি ছেলে কাছেই কোথাও

বোধ করি খেলা করছিল। পূজারীর উচ্চকণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে তারাও এসে দাঁড়াল।

ওদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

পূজারী ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললে, একটু অম্বল হলে ভালো হত। ব্যবস্থাও করতে পারতাম, কিন্তু দেরি হয়ে যেত বলে আর

—কিচ্ছু দরকার ছিল না। এ যা হল, পিচুর।

—পিচুর না ছাই!

পূজারী বললে বটে প্রচুর কিছু নয়। কিন্তু শেষবার ওদের ভাত দেওয়ার পর হাঁড়িতে যা রইল, তাতে ওর নিজের পেটের একটি কোণও পুরবে না। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করবার সময় তখন ওর নেই। মনকে বললে, সে যা হয় হবে এখন।

জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের আখড়া কোথা বটে?

প্রেমদাস বললে, কেনারামপুরে। চেনেন?

- নাম শুনিছি। সে কোন দিকে বটে?

—ঝাড়া পচ্চিমে। দূর বেশি লয়। কোশ পাঁচেক হবে।

—কোথা যাবা?

—ঠাকুর যেখানে লিয়ে যান।

—রাতখানা এখানেই থাকবা তো? তোফা লাটমন্দির আছে।

এবার উত্তর দিলে রাধারাণী। তার থাকতে ইচ্ছা নাই। তোফা নাটমন্দিরের লোভেও না।

পাছে প্রেমদাস রাজি হয়ে যায়, সে জন্যে তাড়াতাড়ি বললে, না, না। খেয়ে-দেয়েই আবার বেরুতে হবে।

পূজারী আবার নাচতে লাগল: এই যে কথা বলেছে! কে বলে বোষ্টুমী কথা কয় না! কিন্তু ও ভাত কটা ফেললে তো চলবেনা। কত কষ্টের ভাত, জান না?

রাধারাণী মুখ তুলে ওর দিকে চাইলে। কৌতুকে তার চোখ দুটো নাচছিল। মৃদুকণ্ঠে বললে, এদিকেও ধান হয় নাই তো?

—কোথা পাবা ? সব ঢোঁ ঢোঁ। মাঠ দেখলা না ? গাঁয়ের সিকি লোক পালিয়েছে। নইলে আর চিন্তে কিসের ? তোমাদের আজ ছেড়ে দিতাম ভেবেছ ?

কি মনে করে প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর মশাই, আপনার ব্রেবাহ হয়েছে ?

পূজারীর হাস্যোজ্জল মুখে যেন একটা ঘন ছায়া নামল। এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই যেন তার পরাজয়ের সমস্ত পরিচয় নিহিত আছে। সেই উত্তর শোনার পর বৈষ্ণবীও বুঝি অন্য স্ত্রী-লোকদের মতো আর তাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করবে না। পূজারী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারলে না।

প্রেমদাস বুঝলে, এ বাজারেও এ পাত্রের গতি হয়নি। প্রশ্নটা করার জন্যে একটু লজ্জাও বোধ করলে।

বললে, ব্রেবাহ করেন নাই বুঝি ?

রাধারাণীর দিকে চেয়ে বললে, গোঁসাই বংশ সাধকের বংশ। ওঁরা কখনও বাঁধা পড়েন না। চেহারা দেখে বুঝছ না ?

রাধারাণীর মুখখানি একেবারে পাতের উপর ঝুঁকে পড়ল। হাসি গোপন করবার জন্যে কি না কে জানে।

থিয়েটারে অভিনেতাকে আড়াল থেকে তার বক্তব্য যুগিয়ে দেওয়ার প্রথা আছে। তাতে অভিনেতার সুবিধা হয়। প্রেমদাসের কথায় পূজারীর সেই সুবিধা হল। তার থতমত ভাবটা কেটে গেল।

উৎসাহিতভাবে বললে, যা বলেছ ! সংসার করতে আমি চাই না। মা কেঁদে কেঁদে মরেই গেল ! বললাম, মর তুই ! বিয়ে করা আমাকে দিয়ে হবে না। কি বল, ঠিক বলি নাই ? তবে হ্যাঁ,

বলে পূজারী বৈষ্ণবীর দিকে চাইলে। রাধারাণী মুখে এক গ্রাস ভাত পুরে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে ছিল। চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে আবার পাতের দিকে মন দিলে।

পূজারী প্রেমদাসের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, তবে হ্যাঁ। তোমার

মতো এমনি একটি বোষ্টুমী পেলে মালাবদল করতে পারি। দেশে দেশে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াই। ব্যাস!

—ঠাকুর মশাই গানও জানেন বুঝি?—প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে।

—জানি না। কিন্তু শিখে নিতে কতক্ষণ! বোষ্টমি হলে তখন এমনই গলায় গান আসবে। নয়?

—আসবে বই কি! গানের জন্যে ভাববেন না ঠাকুর মশাই। আপনি বোষ্টুমী দেখুন। আমি গান শিখিয়ে দিয়ে যাব।

—খোঁজ করছি। কিন্তু আমি আর কোথা পাব বল? তোমরা পাঁচজন আছ। তোমরা চেষ্টা করলে,

বাধা দিয়ে প্রেমদাস বললে, বোষ্টুমীর অনেক সুবিধে, জানলেন ঠাকুর মশাই। ওরাই ভিক্ষে করে আনবে, ওরাই রান্নাবাড়া করবে; আপনি সকাল-সন্ধ্যে ভজন গান আর পায়ের ওপর পা দিয়ে দিব্যি বসে বসে সেবা করুন।

লোভে পূজারীর চোখ চকচক করে উঠল: তাই নাকি! তাতেই বোধহয় তোমার চেহারাটা

বাধা দিয়ে প্রেমদাস বললে, আবার কিসে? দু'দিনে আপনার চেহারা লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু

—কিন্তু কি?

—অসুবিধেও আছে। জানলেন?

—কি অসুবিধে?

—বড় চোখে-চোখে রাখতে হয়।

—তার মানে?—পূজারীর গলা শুকিয়ে আসছিল।

—তার মানে একটু রাশ ঢিলে দিয়েছেন কি,

পূজারী ভয় পেয়ে গিয়েছে। শুষ্ক কণ্ঠে বললে, বেঁধে তো আর রাখতে পারব না।

—না। খুলেই রাখতে হবে; নইলে ভিক্ষে করে এনে খাওয়াবে কে?

—তবে?

রাধারাণী দেখলে এদের গল্প আর শেষ হবে না। বিবাহের প্রসঙ্গে ঠাকুর মশায়ের ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পেয়েছে। নিজের পাতা এবং স্বামীর পাতা তুলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

প্রেমদাস বললে, তা সে হবে এক রকম। বেলা অনেক হল। আপনি ছুটি সেবা করুন আগে। তারপরে কথা হবে।

কিন্তু পূজারী জানে সেবার বিশেষ জুৎ নেই। এক মুঠো ভাত আর গোটা ছুই কচুর টুকরো পড়ে আছে। অথচ ক্ষুধাও পেয়েছে খুব। বললে, আচ্ছা তা ছুটো খেয়ে নি। আমার খেতে কতক্ষণ। বসব কি উঠব।

বলেই ব্যস্তভাবে ভোগের ঘরের দিকে ছুটল।

দুই

গ্রাম থেকে বাইরে বেরিয়ে একটা বেলাতেই রাধারাণীর একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল। রাধারাণীর কাছে এ একটা আবিষ্কার। তাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন মুখর হয়ে উঠেছে। গান গাইছে। অনেক গান, যার অর্থ এতদিন সে ঠিক বুঝত না, এখন যেন তার চোখে নীল স্বপ্নের হেঁয়ালি রচনা করছে। কিন্তু হেঁয়ালিই কি বোঝা যায়?

না। কিন্তু তার ব্যঞ্জনা অনুভূতির তারে তারে ঝঙ্কার তোলে। সেও এক রকম বোঝাই।

রাধারাণী গ্রামের মেয়ে। তার ছোট গাঁয়ে সবাই তার শুধু পরিচিত নয়, আত্মীয়েরও অধিক। কেউ ভাই, কেউ বোন, কেউ, দাদা-কাকা-জ্যাঠা। রক্তের সম্পর্কে হয়তো নয়, কিন্তু একে পাতানো সম্পর্ক বললেও ভুল হবে। এই গ্রামে একদল আত্মীয়ের মধ্যে তার দেহে কৈশোর এল। বাবার কাছে গান শেখে:

কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী করেছি সার।

কিন্তু তার অর্থ বোঝার পরিবেশ ওই ছোট গ্রামে নেই। সে গান শেখে, গান গায়, কিন্তু অর্থ বোঝে না।

এমনি অবস্থায় তার মালাবদল হল। এল প্রেম, এল প্রেমদাস, কিন্তু এল না দেহ-সচেতনতা। আত্মীয়-পরিবেশের দৃষ্টিপাতে দেহ-সচেতনতা জাগার অবকাশ নিতান্তই অল্প।

তারপরে শৈশবে মা মারা যাওয়ার পর থেকে বাবার কাছেই মানুষ হয়েছে। বাবার কোলে যে মেয়ে মানুষ হয়, পুরুষের দৃষ্টি তার কাছে তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলে। রাধারাণীরও তাই হয়েছিল।

ঘরের বাইরে আসার কয়েক দণ্ডমধ্যে সে জীবনে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করল তার মধ্যে একটা শক্তি আছে, যা পুরুষকে আকর্ষণ করে। অমোঘ সে শক্তি। ভূমিকম্পের মতো গোটা পৃথিবীকে সে নাড়া দিতে পারে।

পূজারী পাগল। পাগলই হবে হয়তো। কিন্তু হলই বা পাগল, তারই দৃষ্টিপাতে রাধারাণীর এই নতুন আবিষ্কার। তারই দৃষ্টিপাতে সে শুধু তার নিজেকে নয়, সমগ্র নারীসত্তাকে, প্রাণতত্ত্বের কেন্দ্রশক্তিকেই আবিষ্কার করে ফেললে। এবং এই নবচৈতন্যের মধ্যে তার বর্তমান ভবিষ্যৎ, তার দিনরাত্রি সমস্ত কোথায় তলিয়ে গেল।

দুজনে পথ চলে। আগে প্রেমদাস, পিছনে রাধারাণী।

নিঃশব্দে চলতে চলতে হঠাৎ যদি অন্যমনে প্রেমদাস তার একতারায় একটা ঝঙ্কার দেয়, রাধারাণীর সমস্ত দেহে যেন কাঁপন লাগে, একটা মধুময় অব্যক্ত বেদনায় তার স্নায়ু-শিরা টনটন বেজে ওঠে।

অস্ফুট কণ্ঠে হয়তো বলে ওঠে: উঃ!

—কি হল? লাগল নাকি?

—না। দাঁড়িও না, চল।

প্রেমদাস কিন্তু দাঁড়িয়েই পড়ে। ওর দিকে ফিরে বলে, ঠাকুর মশায়ের কথা মনে পড়ছে, আর হাসি আসছে। বিয়ের জন্যে পাগল হয়েছে। পেথমে যখন কথা বললে, মনে হল মারবে বুঝি। তোমাকে দেখেই জল হয়ে গেল!

চক্ষের পলকে রাধারাণীর মুখে কে যেন আবীর মাখিয়ে দিলে।

প্রেমদাস মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল : ও কিগো !

—কি হল ?

একটা সুকুমার অনুভূতিতে প্রেমদাসের সমস্ত দেহ যেন অবশ হয়ে গেল।

—কিছু নয়।

বলে একতারায় দুটো ঝঙ্কার দিয়ে প্রেমদাস চলতে লাগল।

পাঁচ বৎসর হল তাদের বিবাহ হয়েছে। কখনও গাঁয়ে, কখনও ভিন্‌গাঁয়ে ঘুরে প্রেমদাস ভিক্ষা এনেছে। রাধারাণী রেঁধে দিয়েছে, আহ্নিকের জায়গা করেছে, তামাক সেজেছে, রোগের সময় সেবা করেছে। প্রেমদাস তাকে দেখেছে ঘরের মধ্যে, দাওয়ায়, উঠানে, বড় জোর নদীর পথে।

সে এক রূপ। ঘরণী বধূর রূপ। সন্ধ্যামণি ফুলের মতো। অপূর্ব, সুন্দর।

কিন্তু অবারিত আকাশের নিচে, দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে, অফুরন্ত পথের প্রবাহে পরস্পর সংলগ্ন দুটি পাতার মতো এই যে চলমান জীবন, এর আনন্দ অন্য। এর প্রতি পদক্ষেপে নতুন আনন্দ ক্ষরণ।

ঘরের গৃহিণী রাধারাণী এক। পথের সঙ্গিনী অন্য। এ সন্ধ্যামণি ফুলের মতো অপূর্ব সুন্দর নয়, আকাশের মেঘ-মায়ার মতো বিচিত্র। যে বহু নিরালা গৃহকোণে এক হয়েছিল, সেই আবার অবারিত মুক্তির মধ্যে এক থেকে বহু হল।

প্রেমদাসের অবাক লাগে।

ওই মুখে এত বিচিত্র রূপ কোথায় লুকিয়ে ছিল ? ওই চোখে এত ভাষা !

—একটু ব'সবা না ?

প্রেমদাস চমকে পিছু ফিরলে। রাধারাণী একটুখানি পিছিয়ে পড়েছে। ক্লান্তিতে পা চলছে না। মুখে সেই ক্লান্তির ছায়া।

রিক্ত প্রান্তর। রুক্ষ কঠিন মাটি ফেটে চৌচির। বসুন্ধরা যেন জরাগ্রস্ত। তার যেন নতুন ফসল ফলাবার ক্ষমতা শেষ হয়েছে।
সূর্য তখন ডুবু ডুবু। পশ্চিম দিগন্তে আলোর সমারোহের পরিপ্রেক্ষিতে বসুন্ধরার এই রিক্ততা, মনে হচ্ছে যেন ধনীর প্রাসাদে উৎসবের সমারোহের নিচেই অন্ধকার বস্তি।
কিন্তু সেকথা প্রেমদাসের মনে হলনা। তার স্নেহার্ত চোখ রাধারাণীর ক্লিষ্টসুন্দর মুখের উপর। এই দূরপ্রসারী মাঠের চারিদিকে চেয়ে দেখলে, কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই।
কোমল কণ্ঠে বললে, ওই নালতেডাঙার ইস্কুল। রাতটা ওইখানেই কাটাব ভাবছি। এইটুকু পায়ে-পায়ে আসতে পারবা না? একবার বসলে কিন্তু আর হাঁটতে পারবা না।
রাধারাণী স্কুলের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হিসাব করতে লাগল, পারবে কি না।
ওর চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে প্রেমদাস বললে, এক কাজ কর।
তার ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসির রেখা।
—কি কাজ?—রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে।
—মাঠ ফাঁকা। কেউ কোত্থাও নাই। আমার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এস ক্যানে।
লজ্জায় আবার রাধারাণীর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। চকিতে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে, সত্যই মাঠ নির্জন।
লজ্জিত মুখ নামিয়ে সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।
—এস।
প্রেমদাস ওর বাঁ-হাতখানি নিজের কাঁধের উপর নিয়ে, ডান হাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে, তার দেহের ভার নিজের উপর নিয়ে হাঁটতে লাগল।
সপ্তপদী নয়, সহস্রপদী। নালতেডাঙার স্কুল নিতান্ত কাছে নয়।

লোকালয়ের মতো প্রান্তরে সন্ধ্যা অকস্মাৎ নামে না। লোকালয়ে যার আবির্ভাব নটিনীর আকস্মিকতায়, প্রান্তরে সেই নামে নববধূর লজ্জাজড়িত স্খলিত মন্থরতায়।

ওরা যখন এসে পৌঁছল স্কুলে, অন্ধকার তখনও নিবিড় হয়ে আসেনি।

প্রাথমিক স্কুল। গ্রামের প্রান্তে হলেও সংলগ্ন। দু'খানি চালা সামনা-সামনি। প্রত্যেকটিতে দু'খানা করে ঘর। পূর্বদিকের চালার দু'খানি ঘরেই দরজা-জানালা আছে। বন্ধ। কিন্তু উত্তরদিকের চালায় কোনো ঘরেই দরজা জানালা নেই। ভিতরে বেঞ্চগুলো কিন্তু আছে।

খুশি হয়ে প্রেমদাস বললে, জায়গাটা ভালো পাওয়া গিয়েছে গো। বেঞ্চিগুলো জড়ো করে তোফা ঘুমুনো যাবে। কি বল?

ঘরের মধ্যে সাজান বেঞ্চগুলোর দিকে উঁকি দিয়ে রাধারাণী সভয়ে বললে, কেউ কিছু বলবে না তো?

উপেক্ষার সঙ্গে প্রেমদাস বললে, বলবে আবার কি? চুরিও করছি না, কিছুই না। রাতটুকুন শোব খালি। ভোর হলেই চলে যাব।

—খাওয়া-দাওয়া?

—তোমার ক্ষিদে পেয়েছে না কি?

—তা আবার পাবে না ক্যানে? কিন্তু রাঁধতে নারব।

বলে রাধারাণী একটা বেঞ্চে আড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

প্রেমদাস কি যেন একটু ভাবলে। বললে, এক কাজ করা যাক।

—কি?

—খেয়ে-দেয়ে কাজ নাই। কে যায় গাঁয়ের ভেতর?

—তাহলে?

—ওই দেখ সামনে পুকুর। হাত-পা ধুয়ে আসা যাক।

—তারপর?

রাধারাণী মুচকি মুচকি হাসছে। কিন্তু অন্ধকারে প্রেমদাস তা বুঝতে পারছে না।

বললে, তারপরেরটাও বলতে হবে? শরীরের যা অবস্থা, শোব কি মরব।

—একটা গান গাইবা না?

জবাবটা প্রেমদাস এড়িয়ে গেল। বললে, দাঁড়াও, আগে বেঞ্চিগুলো জড়ো করে পাতি।

বেঞ্চগুলো দিয়ে বেশ চওড়া একখানা খাট হল। ঝুলি থেকে কাঁথা একখানা বের করে পাতলে।

বললে, বাঃ! তোফা বিছানা হল। লাটসাহেবের মতো। চল, হাত-পা ধুয়ে আসা যাক।

শুয়ে শুয়েই রাধারাণী বললে, উঠতে নারি।

—কিন্তু হাত-পা ধুয়ে আসতে হবে তো? হাঁটু পর্যন্ত ধুলো জমেছে।

—তা তো জমেছে।

—তবে?

—তেমনি করে নিয়ে চল।

—কেমন করে?

—যেমন করে এই পথটুকুন আনলা।

প্রেমদাস ওর হাসি দেখতে পেলে না অন্ধকারে। কিন্তু কণ্ঠস্বরের তরলতা অনুভব করলে।

—তাই চল।

বলে ওকে হাত ধরে তুললে। এবং একরকম প্রায় পাঁজা-কোলা করেই নিয়ে গেল পুকুর ঘাটে। তালগাছের কটা গুঁড়ি দিয়ে ঘাট তৈরি। খুঁজে নিতে একটু বেগ পেতে হল।

জলে নেমে রাধারাণী বললে, একপেট জল খাও। খিদে মরবে খানিকটা।

তারপর কয়েক অঞ্জলি জল খেয়েই বলে উঠল: কী গন্ধ!

প্রেমদাসও জল খাচ্ছিল। বললে, হ্যাঁ, জলটা ভালো লয়। তা

কি আর করা যায়! পেটটা তো খানিকক্ষণের জন্যে ঠাণ্ডা থাকবে।

—সেই কথা!—রাধারাণী হাসতে হাসতে বললে,—ঠাণ্ডা জলে দেহটা যেন জুড়ুল। আর তোমাকে কষ্ট দোব না, চল।

বলেও কিন্তু ওর দেহের উপর ভর দিয়েই পথটুকু এল।

সেদিন তিথিটা বোধ হয় শুক্লা ত্রয়োদশী কিংবা দ্বাদশী। কারণ, ওরা যখন স্কুল-ঘরে ফিরে এল, তখন দূরে একটা তালগাছের আড়ালে চাঁদ উঠেছে। তারই আলো এসে পড়েছে স্কুলের বারান্দায়।

একবার চাঁদের দিকে, তারপর প্রেমদাসের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে রাধারাণী বললে, একটা বেঞ্চিল লিয়ে এস না। এইখানে একটু বসি।

কি যে হয়েছে রাধারাণীর কে জানে! সে কথা বলবার ভাষা ওর মুখে নেই, কিন্তু চোখে তার আভাষ ফোটে।

প্রেমদাস একখানা বেঞ্চ নিয়ে এল।

রাধারাণী বললে, ওখানে লয়। ওই কোণের দিকে পাত। বেশ আড়াল আছে।

কোণের দিকে বেঞ্চটা পাততে পাততে প্রেমদাস বললে, কে দেখবে? এরই মধ্যে গাঁ নিশুতি। কোথাও আলা বাজছে না।

তাই বটে। স্কুলের পরেই একটা শরবন। তারপরে ক'খানা জমির পরেই গ্রাম আরম্ভ হয়েছে। কোথাও মিটি মিটি একটা প্রদীপও জ্বলছে না।

রাধারাণী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, আলা জ্বলবে কি করে? কেরাচিন আছে? না ভাত, না কেরাচিন। মানুষ সাঁঝের আগেই খেয়ে লেয়, সাঁজ লাগলেই শুয়ে পড়ে। করবে কি?

প্রেমদাসের গা ঘেঁসে বসে রাধারাণী বলতে লাগল: আমাদের গাঁয়েও তাই, সব গাঁয়েই তাই।

বাঁ হাতটা রাধারাণীর কাঁধের উপর রেখে প্রেমদাস বললে, ক্যানে চাঁদের আলোয় বসে এমনি করে গপ্প করলেই পারে।

—গাঁয়ে-ঘরে পারে না।—রাধারাণী গম্ভীরভাবে বললে।

—ক্যানে ?

—পারে না। আমরা পারতাম ?

তাই বটে। পারে না। পারা যায় না। পারার কথা মনেই হয় না। ওরাও পারত না। চারটে দেওয়ালের মধ্যে অবারিত মুক্তি নেই, ব্যাপ্তি নেই, স্বচ্ছন্দ স্রোত নেই। সেখানে শুধু জীবন নয়, যৌবনও চলে একটা বাঁধা ছকের মধ্যে। কিন্তু কারণটা রাধারাণী ধরতে পারলেনা, বুঝতেও পারলে না। এইটুকু শুধু বুঝলে যে, গ্রামে-ঘরে পারা যায় না। সেখানকার হাওয়া অন্য রকম। তাই বললে, পারে না। কেউ পারে না। ওরাও পারত না।

হঠাৎ রাধারাণী প্রেমদাসকে একটা ঠেলা দিলে ঃ সর।

ধারের দিকে সরতে সরতে প্রেমদাস বললে, কি হল ?

—একটু শোব।

বলে প্রেমদাসের কোলের উপর মাথাটা রেখে ধুপ করে শুয়ে পড়ল। মাথায় ঘোমটা নেই। মুখের উপর তির্যকভাবে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। কোথাও আলো, কোথাও ছায়া। সেই আলো-ছায়ায় ওর চোখের তারায় যেন কিসের যাদু ভ্রমরের ডানার মতো কাঁপছে।

বললে, একখানা গান গাও ক্যানে।

প্রেমদাস গুণ গুণ করে গান ধরলে ঃ

'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।'

তৎক্ষণাৎ রাধারাণী শুরু করলে ঃ

'চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥'

পর পর কয়েকখানা গানই ওরা দুজনে মিলে গাইলে। চাঁদের আলোয় সমস্ত মাঠ যেন ভাসছে। গানের সুরগুলি যেন শ্বেতপদ্মের মতো সেই আলোর তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে নিরুদ্দেশে চলেছে।

এক সময়, তখন কত রাত্রি কে জানে, রাধারাণী বললে, চল ঘরে যাই।

এবং নিজেই আগে আগে গিয়ে সেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। বেঞ্চটা যথাস্থানে রেখে প্রেমদাসও এল।

রাধারাণী বললে, তোমার গায়ে কত জোর! জানতাম না।

ঘরের ভিতরে চাঁদের আলো ঢোকেনি। কিন্তু বাইরের আলোয় ঘরের অন্ধকার কেটে গেছে। খুব পরিষ্কার না হলেও পরস্পরকে বোঝা যাচ্ছে।

—ক্যানে? আমাকে কি লগবগে মনে হত?

—হ্যাঁ। কোনো জোরের কাজ করতে তোমাকে তো দেখি নাই।

—আজই বা দেখলি কি করে?

—অতখানি পথ আমাকে তো তুমি একরকম বয়েই লিয়ে এ'লা।

ওর পাশে শুতে শুতে প্রেমদাস বললে, ও, সেই কথা!

—হ্যাঁ।

বলে রাধারাণী একখানা হাত প্রেমদাসের গায়ের উপর ছড়িয়ে দিয়ে একটা আশ্চর্য ভঙ্গিতে চোখবন্ধ করলে।

দুজনেই যদিচ পথশ্রমে খুব ক্লান্ত ছিল, তবু খোলা জায়গায় শোয়া, অন্ধকার একটু থাকতেই ওদের ঘুম ভেঙে গেল।

প্রেমদাস আগেই উঠে ঘাট থেকে মুখ হাত ধুয়ে এল। রাধারাণী তখন উঠে বসে হাসছে।

প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে, মুখ হাত ধোবা না?

রাধারাণী ঘাড় নেড়ে নেড়ে হাসতে লাগল।

—কি হল?

—উঠতে নারছি। পা ফুলে উঠেছে। দুটোই।

—তাই নাকি?—চিন্তিতভাবে প্রেমদাস বললে, কই দেখি?

দুটি পায়ের পাতাই পাঁউরুটির মতো ফুলে উঠেছে। হাঁটুও। প্রেমদাস হিসাব করে দেখলে, কাল প্রায় দশ ক্রোশ হাঁটা হয়েছে। একদিনে, এবং প্রথম দিনেই, রাধারাণীকে অতটা হাঁটান ঠিক হয়নি।

বললে, আজ আর কোথাও যেছি না। এইখানেই থাকব।

খুশি হয়ে রাধারাণী বললে, সেই ভালো। একটা দিন দম লিই।

—কিন্তু থাকব কোথা? একটু পরেই তো ইস্কুল বসবে।

সামনের আমবাগানটির দিকে চেয়ে প্রেমদাস বললে, আমি বলি কি,

বাধা দিয়ে রাধারাণী বললে, আজ রবিবার লয়? ইস্কুল কিসের?

তাই বটে। প্রেমদাসের বার কিছুতে ঠিক থাকে না। কিন্তু রাধারাণীর বার ভুল হয় না কখনও। এর আগেও বহুবার দেখা গেছে। আজ রবিবারই বটে। স্কুল নেই। ছেলেরা আসবে না। একটু তদ্বির করলে মাস্টাররা হয়তো একটা দিন ওদের এখানে থাকায় আপত্তি করবে না।

কিন্তু রান্না? স্কুল ঘরের বারান্দায় দূরে থাক, উঠানেও রাঁধতে দেবে না।

সেই কথা বুঝিয়ে প্রেমদাস বললে, তার চেয়ে ওই আমবাগানই ভালো লয়?

রাধারাণী বললে, ভালো তো বুঝি। কিন্তু অতদূর যাই কি করে?

—দূর কোথা পেলা? ওই তো আমবাগান। চারখানা জমির পরেই।

বহু কষ্টে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে রাধারাণী বললে, তুমি তো বলছ। কিন্তু ওই চারখানা জমিই মনে হচ্ছে চার কোশ। তা জান?

রাধারাণীর মুখে কিন্তু হাসি। প্রেমদাস অবাক হয়ে গেল। মনে পড়ল, কিছুদিন আগেকার একটা কথা।

নদী থেকে আসবার পথে রাধারাণীর পায়ে একটা বাবলার কাঁটা ফুটেছিল। হয়তো একটু বেশিই ফুটেছিল, কিন্তু তাই বা এমন কি! তাতেই মেয়ের কি মেজাজ! কিছু বললেই খ্যাঁক করে উঠত।

প্রেমদাস কিছু বলেনি। মনে মনে মেনে নিয়েছিল, বাপের আদুরে মেয়েদের মেজাজ এই রকমই হয়।

কিন্তু আজ এ কি!

ওর মুখ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পায়ে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু ঠোঁটের হাসি ঠিক আছে।

প্রেমদাস ওর কাছে সরে এসে চুপি চুপি বললে, সকাল হয়ে গিয়েছে, নইলে পাঁজাকোলা করে লিয়ে যেতাম।

রাধারাণী মুখ নামিয়ে হাসলে। অস্ফুট কণ্ঠে বললে, সে লোভ যদি ছিল, আঁধার থাকতেই ঘুম ভাঙালা না ক্যানে?

—আমার ঘুম তো আঁধার থাকতেই ভেঙেছিল।

—খুব বাহাদুর! চল দেখি, আস্তে আস্তে যেতে পারি কিনা।

রাধারাণী পায়ে পায়ে চলতে লাগল। প্রেমদাস কাঁথাটা ভাঁজ করে ঝুলির ভিতর রাখলে। বেঞ্চগুলো আবার যথাস্থানে গুছিয়ে রাখলে। তারপর হন হন করে এসে রাধারাণীর সঙ্গ ধরল। গুণ গুণ করে গাইলে:

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥

পিছন ফিরে রাধারাণী একটা তীব্র কটাক্ষ হানলে। ভুরু বেঁকিয়ে বললে, আমি বলে হাঁটতে নারি, আর তোমার আমোদ বেড়েছে, লয়?

প্রেমদাস সে ভ্রূভঙ্গে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার গাইলে:

একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চিরদুখ অব দূরে গেল॥

আখর দিলে ঃ আবার আমার দুঃখ কি গো ?

রাধারাণী ঝঙ্কার দিলে ঃ আহা !

প্রেমদাস আখর দিয়েই বলল ঃ সকল দুঃখ দূর হয়েছে, আবার আমার দুঃখ কি গো ?

—না, কোনো দুঃখ নাই ! তুমি থাম।

একটু একটু হাঁটতে হাঁটতে রাধারাণীর হাঁটাটা যেন অনেকখানি সহজ হয়ে আসছে ক্রমেই। হঠাৎ একটা জায়গায় এসে রাধারাণী দাঁড়িয়ে পড়ল ঃ

—এই জমিখানা আমাদের গাঁয়ের নারাণ ঘোষের বেঁকির মতো লয় ?

প্রেমদাসও দাঁড়িয়ে পড়ল ঃ সত্যি। ক'খানা জমিই পর পর যেন তেমনি করে সাজান।

রাধারাণী বললে, আশেপাশে না চাইলে মনে হয় সেইখানটাতেই দাঁড়িয়ে আছি।

রাধারাণী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে, কি মনে করে কে জানে।

মিনিট কয়েক পরেই ওরা আমবাগানে এসে গেল।

বাগানের উত্তর দিকে একটা পূর্ব-পশ্চিম লম্বা সরু পায়ে-চলা রাস্তা গেছে। ওদিকে লোক-চলাচল হয়। সেদিক ছেড়ে দিয়ে ওরা পূর্ব দিকে গিয়ে বসল। আম গাছগুলি যেন এদিকেই ঘন বেশি। চমৎকার ছায়া, আর ঘাসের আস্তরণ। মাঝখানে একটা মাঝারি গোছের পুকুর।

রাধারাণী ঘাসের উপর বসল। প্রেমদাস তার পাশে ঝুলি ঝাম্পা রেখে বললে, একবার গাঁয়ের ভেতরটা ঘুরে আসি। কালকের মতো একটা ঠাকুর মশাই যোগাড় করতে পারি তো ভালোই। নইলে হাঁড়ি কুঁড়ি কিনে আনতে হবে। ভাত দুটি না খেলে চলবে না। দুটো মুড়িও চাই। রেতে খাওয়া হয় নাই, ক্ষিদে পেয়েছে বিস্তর। একা থাকতে পারবা তো ?

—দিনের বেলা, তা আবার পারব না ক্যানে। কিন্তু বেশি দেরি কোরো না যেন। তুমি আবার বসলে উঠতে চাও না!

এ অপবাদ তার আছে।

প্রেমদাস হেসে বললে, পাগল! এ কি আমাদের কেনারামপুর যে ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্দি আছ। আমি যাব আর আসব।

একতারায় দুটো ঝঙ্কার দিয়ে, গানের কি একটা কলি হুঁ হুঁ করে ভাঁজতে ভাঁজতে প্রেমদাস গাঁয়ের দিকে চলল। রাধারাণীকে শুদ্ধ নিয়ে গেলেই ভালো হত। কিন্তু ওর অতখানি হাঁটবার শক্তি নেই।

মাথায় পাগড়িটা বাঁধতে বাঁধতেই প্রেমদাস চলল।

গ্রামে ঢুকতেই উঁচু দাওয়ার উপর চাটাইএ বসে একটি মোড়ল গোছের লোক তামাক খাচ্ছিল। খালি গা, কাপড় হাঁটুর উপর পর্যন্ত গুটান। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গলায় তুলসীর মালা।

একতারায় দুটো ঝঙ্কার দিয়ে প্রেমদাস নিঃশব্দে সেখানে দাঁড়াল।

এর অর্থ সুস্পষ্ট। লোকটি কলকেটা হুঁকো থেকে নামিয়ে দিলে। প্রেমদাস দুই হাতে কলকেটা ধরে টানতে লাগল।

—বাবাজিকে নতুন লাগছে?—লোকটি জিজ্ঞাসা করলে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এ দিগরে কখনও আসি নাই।—প্রেমদাস উত্তর দিলে।

—আখড়া কোথা বটে?—লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করলে।

—আজ্ঞে কেনারামপুর।

—নাম শুনেছি যেন। সে কোথা বটে?

—রাজার হাট চেনেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—তার ঠিক দক্ষিণে।

—কোথা যাওয়া হচ্ছে?

লোকটিকে বড় ভালো মনে হল। প্রবীণ লোক। বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। প্রেমদাস সমস্ত কথাই বললে।

লোকটি চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, ব্যাপার সেই রকমই দাঁড়িয়েছে হে! বামুন, বোষ্টম আর বিধবা বোন, এ গেরস্তরই পুষ্যি। কিন্তু গেরস্ত নিজেই খেতে পেছে না, পুষ্যি পুষবে কি! আগে বোশেখ-জষ্টি মাসে জল-খাবারের বেলা হলে আর রাহী লোকের গাঁ পেরুবার উপায় ছিল নাঃ বিলক্ষণ, যাবেন কোথা এই রোদে! দুটি সেদ্ধ-পক্ক সেবা করে, একটু বিশ্রাম করে বিকেলে যাবেন! সে দিন আর নাই।

লোকটি একটু থামলে।

বললে, তা ঠাকুর সকাল বেলা তোমাকে যখন পাঠালেন; তখন তাঁর নাম একটু শুনি। কি বল হে?

একটি দু'টি করে কয়েকজন লোক সেখানে জুটেছিল। লোকটি তাদের দিকে চাইলে!

প্রেমদাস হাত জোড় করে বিনীত ভাবে বললে, ঠাকুর আমাকে গাইতে বলেছেন, আপনাদেরও শুনতে বলেছেন। কাজে কাজেই আমিও গাইব, আপনারাও শুনবেন। কিন্তু

—কিন্তুর কথা আমি জানি বাবাজি। আমাদের বাড়িতে তো চলবে না। বামুন বাড়ি সিধে পাঠিয়ে দোব। দুপুরে সেই খানেই দুটো সেবা হবে। গুড়-মুড়িটা এখানেই। কি বল?

সকল সমস্যার সমাধান করে লোকটি হা হা করে হাসতে লাগল।

প্রেমদাসের দুটি করতল তখনও সংযুক্ত। বললে, আজ্ঞে সে জন্যে লয়।

—তবে কি জন্যে বল।

—আজ্ঞে আমার সঙ্গে আমার বোষ্টুমীও আছেন।

—সঙ্গে দেখছি না তো।

—আজ্ঞে সঙ্গেই আছেন। ওই আমবাগানে আছেন।

—আমবাগানে! সেখানে কি করছেন?

প্রেমদাসকে সমস্ত ইতিহাস বলতে হল। অতিরিক্ত পথশ্রমে রাধারাণী যে প্রায় চলচ্ছক্তিহীন, তাও বলতে হল। তখন সেখানে একটা হাসির হর্‌রা উঠল।

প্রেমদাস বললে, পেসাদ দুটি জুটবে সে আশা তো করি নাই ; যা দিন কাল। ভেবেছিলাম, গাঁয়ের মধ্যে কিছু ভিক্ষে সিক্ষে করে ওই আমবাগানেই রান্না-বাড়া করব। আর রেতের বেলা ওই ইস্কুলে গিয়ে শোব।

লোকটি এ গ্রামের মোড়ল। তখনই পাড়ার একটি মেয়েকে ডেকে আমবাগানে পাঠিয়ে দিলে বোষ্টুমিকে ডাকতে। আরও কটি সঙ্গিনীকে নিয়ে নাচতে নাচতে সে চলে গেল।

বাবাজিও দাওয়ায় উঠে একটা চাটাই টেনে বসে নিশ্চিন্ত মনে একতারায় ঝঙ্কার দিলে।

তারপরে আরম্ভ হল গান।

প্রেমদাসের প্রপিতামহ না কে একজন মস্ত বড় সাধক ছিলেন। গৃহে থেকেও দিন রাত্রি তিনি সাধুসেবা আর নাম: কীর্তন নিয়েই থাকতেন। শেষ জীবনে তিনি সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবন চলে যান এবং সেখানেই দেহ রক্ষা করেন। সে জন্যে বৈষ্ণব সমাজে ওদের বংশের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে।

প্রেমদাস সাধক নয়। সাধনা করেও না। কিন্তু রক্তের সঙ্গে ও দুটি বস্তু পেয়েছিল। একটা হচ্ছে কাঞ্চন-বৈরাগ্য, আরেকটি গান গাইবার শক্তি। অর্থের জন্যে ওর কোনো আগ্রহ ছিল না।

আর গান গাইবার যে শক্তি সে হচ্ছে—কবি যাকে বলেছেন, ভগবান পাখির কণ্ঠে যে গান দিয়েছেন সেই টুকুই সে গায়, তার বেশি সে দিতে পারে না,—তাই। ওস্তাদের কাছে গান সে শিক্ষা করেনি। নিজে-নিজেও যে বিশেষ সাধনা করেছে, তাও নয়। এই বলা যেতে পারে

যে, ভগবান ওর গলায় যে গান দিয়েছেন তার সঙ্গে একটুখানি যাদুও মিশিয়ে দিয়েছেন। যে শোনে, সে সমস্ত কাজ ভুলে সেই খানেই আটকে যায়। বস্তু-জগতের সঙ্গে তার যোগ ছিঁড়ে যায়।
বিশেষ আজকে তার গানে যেন একটি বিশেষ মেজাজ জমেছে। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই গান শুনতে লাগল।

সমস্ত দিন দু'জনে একটি বারের জন্যেও দেখা হল না।
প্রেমদাস বাইরে বসে গানের পর গান গাইলে। আর রাধারাণী মেয়েদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করতে লাগল। খাবার সময় প্রেমদাস যে বামুন বাড়িতে কখন খেয়ে এল, রাধারাণী জানতেও পারলে না। রাধারাণীর স্নানাহারের খবরও প্রেমদাস পেলে না।
দুপুরে একটু বিশ্রামের পর বিকেলে প্রেমদাস আবার যখন বাইরে দাওয়ায় এল, তখন প্রচুর লোক জুটে গেছে। সকলেই ছট ফট করছে গান কখন আরম্ভ হবে।
দুঃখীর গ্রাম। চাষ-বাস, দুঃখ-ধান্ধা করে কোন মতে দুবেলা দুটি অন্নসংস্থান করে। দুর্ভিক্ষের জন্যে সেই অনেক দুঃখের শাকান্নও বন্ধ প্রায়। অনেকেই দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায় না। আনন্দও নির্বাসিত। সেই নিরানন্দ গ্রামে প্রেমদাস যেন এক ঝলক আনন্দ নিয়ে এসেছে। ওরা ক্ষুধা ভুলে যাচ্ছে। অন্নসংগ্রহের চেষ্টাও শিথিল হয়ে যাচ্ছে।
সকালে অনেকগুলি গান প্রেমদাস গেয়েছে। করযোড়ে বললে, এ বেলা থাক। যদি অনুমতি দেন, আজ রাতও ইস্কুলে কাটাই। সন্ধেবেলা ওখানেই গান হবে।
এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? সকলে সাগ্রহে সম্মতি দিয়ে নিজের নিজের ধান্ধায় চলে গেল। সকলে নয় অবশ্য, অনেকে। যারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল তারা রইল।
তখন আরম্ভ হল দুঃখের কথা।

দিন আর চলে না। একবেলার যোগাড় হয় তো অন্য বেলার চিন্তা। অনেক পরিবার আছে, যাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই পেটপুরে খায়, বড়রা নয়। একদিন স্বচ্ছলতা ছিল, এখন দুঃখের কথা প্রকাশও করতে পারেনা, লজ্জায় কারও কাছে হাত পাততেও পারে না।

—নামটা আর নাই বললাম। কিন্তু বিপদটা কি রকম বোঝ।

ছোট মোড়ল খুবই ব্যস্তভাবে একবার ভিতরে যাচ্ছিল, একবার বাইরে এসে বসছিল। বাড়িতে দু'জন অতিথি। ব্যস্ত হবারই কথা। ভিতর থেকে এইমাত্র সে বাইরে এল। সমস্ত কথাটা সে শোনেনি। শুধু বিপদের কথাটাই কানে গিয়েছিল।

বললে, বিপদের কথা আর বোলোনা গোষ্ট। গাঁ ষোলো-আনা সব্বারই বিপদ। সব্বাঙ্গে ঘা, তুমি ওষুধ দেবা কোথা? মানুষ আধপেটা খেয়ে আছে। গরুগুলোর টিক্নে বেরিয়ে গেল। ঘরের চাল কেড়ে যে য'টা দিন পারছে, টিকিয়ে রাখছে। অনেকে তো গরু বেচেই দিলে।

প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে, কিনছে কে? কার খামারে খড় আছে?

—গেরস্ত কিনছে না।

—তবে?

—কসাই। বলছে, গরুর আর দাম কি মশায়, চামড়াখানারই যা দাম! আর শুনবা? শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়।

সবাই স্তব্ধভাবে বসে রইল।

হঠাৎ ছোট মোড়ল জিজ্ঞাসা করলে, পালেদের সেই বিধবা বৌটার খোঁজ পাওয়া গেল?

—ক্ষেপেছ! কে খোঁজ করছে বল? এরাও ভাবছে বাঁচা গেল, একটা পেট কমল। সেও ভাবছে, বাঁচা গেল. উপোস আর সইতে নারি।

—কিন্তু কোথা গেল বলতো? একা কোথা যাবে?

—একা যাবে ক্যানে? নিচ্চয় মানুষ আছে পেছুনে।

—কিন্তু তেমন মেয়ে তো নয়।

—হতে কতক্ষণ! বারোমাস, ত্রিশদিন কে উপোস করতে পারে বল।

—অনেক দিন চুপি চুপি আমাদের বাড়িতে খেয়ে গিয়েছে।

—তাই নাকি? ওরা জানতে পারলে আবার লাঠি লিয়ে আসত মার করতে।

—তা আসত। —ছোট মোড়ল হাসলে.—সর্মান জ্ঞান খুব খর।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।

ছোট মোড়ল প্রেমদাসকে জিজ্ঞাসা করলে, তারপরে বাবাজি সন্ধ্যের পরে ইস্কুলেই আসর বসবে। চাঁদের আলো আছে, মন্দ হবে না। কিন্তু রেতে তোমাদের আহারের কি করা যায়?

—কিছু না। শুধু দুটো মুড়ি হলেই চলবে।

—তাই হবে। মুড়ি আর দুধ। কিন্তু রেতে উঠে ক্ষিদে পাবে না তো?

—কী যে বলেন মোড়ল মশাই! ক্ষিধে পাবে ক্যানে।

– না পেলেই হল। যে ঘরে দরজা জানালা আছে, সেই ঘর একখানা খুলে দোব! নিচ্চিন্দে ঘুমুতে পারবা।

সন্ধ্যায় গানের আসর বসল।

নিচের উঠানে ঘাসের আস্তরণে শ্রোতাদের বসবার জায়গা। আর গত রাত্রে ওরা যে বারান্দায় প্রথমে বসেছিল, সেখানটা গাইয়েদের জন্যে। গোটা দুই শতরঞ্চ সেখানে পেতে দেওয়া হয়েছে। কীর্তন বিনা-আসনে হতে নেই।

একজন খোল বাজিয়ে যোগাড় হয়েছে। এই গ্রামেরই একজন। কোনো কীর্তনীয়ার দলে নাকি খোল বাজায়।

প্রেমদাস এবং রাধারাণী পাশাপাশি বসল। একটু সুমুখের দিকে সেই খোল-বাজিয়ে। গোটা গ্রাম যেন ভেঙে পড়ল। বুড়ো-বুড়ি থেকে

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পর্যন্ত কেউ বাকি নেই।

সমস্ত দিনের পর প্রেমদাস ও রাধারাণীর এই প্রথম সাক্ষাৎ। দুজনে দু'জনের দিকে একবার চাইলে মাত্র। কিন্তু কেউ কাউকে কোনো কথা বললে না। নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময় শুধু।

প্রথম গান গাইলে প্রেমদাস। চণ্ডীদাসের সেই পদটি ঃ

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে॥

শ্রীমতীর মনে আশঙ্কা জেগেছে, কোন মুহূর্তে কানুর প্রেম উড়ে যায়। বিশ্বাস কি? খলের তো অভাব নেই। তাদের কাজই হল, গড়া জিনিস ভাঙা কিন্তু ভাঙা জিনিস ক'জন গড়তে পারে? সে বড় শক্ত কাজ, অসম্ভব বললেই চলে। যদি ভাঙে এই প্রেম! যদিই ভাঙে? তাহলে শ্রীমতী কি একটা দিনও বাঁচবেন? তার কি নারীবধের পাপ লাগবে না?

আখর দিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেমদাস গাইতে লাগল। শ্রীমতীর দুঃখে ওর দুটি চোখে যেন শ্রাবণের ধারা নেমেছে। রাধারাণী পর্যন্ত অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে।

কিন্তু কে এই শ্রীমতী? সে কি ও নিজেই? রাধারাণী সম্বন্ধে এ ভয় তো ওর ছিল না। ওকে নিয়ে পথে বেরিয়ে এই কি তাহলে প্রথম জাগল?

তারপরে গাইলে রাধারাণী। চোখ বন্ধ করে কারও দিকে না চেয়ে ও গাইতে লাগল চণ্ডীদাসের সেই পদটি ঃ

শুনহে চিকন কালা।
বলিব কি আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা॥

সে জ্বালার শেষ নেই। তবে অবলা আর বলেছে কেন? চরণ থাকতেও সে চলতে পারে না, মুখ থাকতেও বলতে পারে না, চোখ থাকতেও দেখতে পায় না। এ জ্বালার তুলনা কোথায়?

কণ্ঠের সমস্ত অমৃত ঢেলে রাধারাণী গাইলে পর পর তিন খানা গান। তাকে যেন গানে পেয়েছে। সে যে কত ভাল গায় প্রেমদাসেরও সে ধারণা ছিল না। তার মনে হল বাজনা যেন ঠিক হচ্ছে না। বাজিয়ের কাছ থেকে খোল কেড়ে নিয়ে সে নিজেই বাজাতে লাগল।

তারপর কত রাত্রে গান শেষ হল।

লোকজন একে একে চলে গেল। ওদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল। রাধারাণী নির্জীবের মতো দেওয়ালে মাথা রেখে বসে রইল।

বেঞ্চগুলো কালকের মতো সাজিয়ে তার উপর প্রেমদাস কাঁথাটি পাতলে। দরজা বন্ধ করে ডাকলে, এস।

রাধারাণী সাড়া দিলে না। তেমনি করে বসে রইল।

প্রেমদাস আবার বললে, শরীর ভালো লাগছে না?

—না।

রাধারাণী ধীরে ধীরে ওর পা-তলায় এসে বসল।

প্রেমদাস ওর কপালে হাত দিয়ে বুঝলে জ্বর নয়। হয়তো ক্লান্তি। ওকে উৎসাহিত করবার জন্যে বললে, কী গানই গাইলা! তুমি যে এত মিষ্টি গাইতে পার, জানতাম না।

রাধারাণী বললে, কাল থেকে আর গাইব না।

—ক্যানে?

—গান কেউ শোনে না।

—বলিস কি! গাঁ যেন ভেঙে পড়েছিল।

—আমার গান শুনতে লয়।

—তবে?

—আমাকে দেখতে।

প্রেমদাস স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

রাধারাণী হঠাৎ শিউরে উঠে ওকে জড়িয়ে ধরলে।

—কি হল? ভয় করে?

প্রেমদাস ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

—হ্যাঁ। তুমি কাছে থাকলে করে না। না থাকলে করে।—রাধারাণী একটু পরে জবাব দিলে।

—আমি সব সময় তোর কাছেই তো আছি।

—সব সময় থাক না।

রাধারাণী মনের সমস্ত কথা স্পষ্ট করে বলতে পারলে না। কাছেই তো থাকে ও। কিন্তু তা নয়। কাছে থাকলেই সব সময় কাছে থাকা যায় না। তার মানে আরও অনেক কিছু। কিন্তু মনের সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলার ভাষা ওর নেই।

প্রেমদাস ভাবলে, আজকের দিনটা ঘটনাচক্রে ওরা বিচ্ছিন্ন ছিল, সেই অভিযোগই রাধারাণী করছে হয়তো।

বললে, আচ্ছা। কাল থেকে আর এমন হবে না। সব সময় কাছে কাছে থাকব।

রাধারাণী সান্ত্বনা এবং সাহস পেলে কি না বোঝা গেল না। প্রেমদাসের হাতের উপর মাথা রেখে নিঃশব্দে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল।

তিন

কাক-কোকিল ডাকতেই প্রথমে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল এবং তারপরেই স্বয়ং ছোট মোড়ল ব্যস্তভাবে এসে উপস্থিত।

বললে, ঝুলি-ঝম্পা গোছাও কি, আজ তোমাদের যাওয়া হবে না।

প্রেমদাস অবাক। এ রকম কোনো কথা কালও হয়নি। অন্ধকার থাকতেই তারা হয়তো বেরিয়ে যেত। শুধু ছোট মোড়ল এবং গ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা না করে যাওয়াটা ভালো দেখাবে না বলেই এখনও যায় নি।

হাত জোড় করে বললে, একটা দিন তো খুব আনন্দ হল। আর ক্যানে? এবার অনুমতি করলে আস্তে আস্তে যাই।

ছোট মোড়ল ফোঁকলা দাঁতে হো হো করে হেসে বললে, আনন্দ হল কি হে! আনন্দর এখন হয়েছে কি! আজ আনন্দ হবে। অষ্ট পহর! ভেবেছ কি!

ব্যবস্থাটা নিশ্চয় কাল গান ভাঙবার পরে হয়েছে। হয়তো কালকের গান ওদের খুব ভালো লেগেছে।

প্রেমদাস বিপন্ন দৃষ্টিতে রাধারাণীর দিকে চাইলে।

ছোট মোড়ল বীরের মতো বুক ফুলিয়ে বললে, ওদিকে চাইছ কি হে! কোনো দিকে চেয়েই সুবিধা হবে না। তারপরে গিয়ে তোমার বোষ্টুমির পা এখনও ঠিক হয় নাই! এই অবস্থায় ওকে ছেড়ে দেওয়া যায়! এটা গাঁ বটে না কি! কেমন করে যাবা যাও দিকি! ছোট মোড়ল লাঠি ধরলে এখনও দুশো লোককে ভাগড়া করতে পারে।

বলে শূন্য হাতটাই হাওয়ায় একবার আস্ফালন করলে।

রাধারাণী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বাইরে পালাল।

প্রেমদাস বুঝলে, অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লে হয়তো যাওয়া যেত, (কি হয় তো এক ক্রোশ পথ ছুটে গিয়ে গলায় গামছা দিয়ে ওদের টেনে নিয়ে আসত, বলা কিছুই যায় না,) কিন্তু এখন যাওয়ার কোনো উপায় নেই। গ্রাম্য আতিথেয়তা প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর। অতিথিকে আটকাবার জন্যে এরা লাঠিও ধরতে পারে।

ছোট মোড়ল বললে, গতবারে ফসল কিছুই হল না। এবারেও অবস্থা সুবিধার লয়। তবু ছোট মোড়ল তো মরে নাই! তোমাদের দু'জনকে সারাজীবন বসিয়ে খাওয়াবার ক্ষ্যামতা, তোমার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে, এখনও আমার আছে। মনে কিন্তু কোর না। চল।

বলেই বাইরে সমবেত কৌতূহলী শিশু-জনতার দিকে একটা হুঙ্কার দিলে : এই ছুঁড়িগুলো, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছিস কি! বোষ্টুমীকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে হবে না?

ওরা কাজ পেয়ে ছুটল বৈষ্ণবীর কাছে।

হাতের কলকেটা প্রেমদাসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, তামাক পেয়েছ সকাল থেকে ?

—তামাক আমি খুব বেশি খাই না আজ্ঞে।—প্রেমদাস বললে,—তবে তামাক একটু খেতে হবে। সকালে উঠেই যা গালাগালিটা আপনার কাছে খেলাম !

ছোট মোড়ল হেসেই অস্থির !

বললে, যা বলেছ বাবাজি ! কিন্তু কথাটা কি জান, তোমাদের ওপর কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছে।

একটু থেমে ভারি গলায় বললে, ভগমান আমাকে সন্তান তো দেন নাই। বৌটাকেও সকাল সকাল লিয়ে পালালেন। সংসার বলতে আছে একটা বিধবা ভাজ, আর তার একটা ছেলে !

ছোট মোড়লের করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে প্রেমদাসের মন কোমল হয়ে আসছিল ! জিজ্ঞাসা করলে, ছেলেটি লায়েক হয়েছে ?

—সব দিকে।—ছোট মোড়লের করুণ চক্ষু অকস্মাৎ কঠোর হয়ে উঠল। বললে,—মদ, গাঁজা, চরস, কিছু বাকি নাই। সে যে কোথায় থাকে, কি করে, কি খায়, কেউ জানে না। অতি হারামজাদা !

—বাড়িতে থাকে না ?

—থাকবে না ক্যানে ? পাঁচদিন, দশদিন থাকে। তারপরে হঠাৎ ডুব দেয়। দিন কতক কোথায় কোথায় ঘুরে রোগা ইঁদুরটার মতো ফিরে আসে। মাথার চুলে খড়ি উঠছে। চোখ লাল, ধুঁকছে। আবার দু'দিন থেকে তেল-জল পেয়ে যেই সুস্থ হয়ে ওঠে, আবার পালায়।

—বিয়ে দিয়েছেন ?

—তাও দিইছি। তাকে লিয়েও ঘর করবে না। সেটা বাপের বাড়িতে পচছিল। তা তারাই বা এই দুর্ভিক্ষের দিনে কত খাওয়াবে বল ? অবস্থাও তাদের তেমন সুবিধার লয়। এই মাসখানেক হল

লিয়ে এইচি। থাক্। স্বামী লিয়ে সুখ তো পেলি না। তা বিধবা মেয়েও তো বাড়িতে থাকে। তেমনি করে থাক। আর যাই হোক, আমার বাড়িতে ভাত-কাপড়ের দুঃখু তো পাবি না। তা তেমনি করেই আছে।

ছোট মোড়ল চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল।

তারপর বললে, তা মেয়েটা ভালো, জান বাবাজি। মুখ বুজে খেটে যায়। দুখসইও আছে। তা ভালো বলে তো কপালের লেখন খণ্ডাবে না। সে ক্ষ্যামতা শিবের বাবারও নাই। কি বল ?

—তা তো বটেই।

হঠাৎ একটা ঝটকা দিয়ে ছোট মোড়ল যেন এ সমস্ত সাংসারিক দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা করলে, বলছিলাম কি, মাছ চলে তো বাবাজির ?

—হ্যাঁ, আজ্ঞে, তা চলে। আমরা তো গৃহী। গোঁসাই আমাদের মাছ খেতে অনুমতি দিয়েছেন।

—ভালোই হল।—ছোট মোড়ল উৎসাহের সঙ্গে বললে,—অনেক দিন মোড়ল-পুকুরে জাল পড়ে নাই। বিষ্টি নাই, জলও মরে আসছে। দেখি, আজ একবার জাল নামিয়ে দুটো ভালো মাছ যদি পড়ে। আমি বলি কি,

কি বলবে, ভুরু কুঁচকে ছোট মোড়ল সেই কথাটাই একবার ভেবে নিলে। বামুন বাড়িতে সিধে পাঠানর ঝামেলা অনেক। তরি-তরকারি-মাছ বলতে গেলে ওদের গোটা সংসারের জন্যেই পাঠাতে হয়।

বললে, আমি বলি কি, বামুনবাড়িতে সিধে না পাঠিয়ে যদি আমার বাড়িতে তোমার বোষ্টুমী নিজেই যদি রেঁধে লেয়। কেমন হয় ?

—ভালো হয়।

বামুন বাড়ির রান্না সেদিন প্রেমদাসের মনঃপূত হয়নি। মনে হয়েছে, ওরা রাঁধতে জানে না। যদি একটা ভালো মাছ পাওয়া যায়, ওদের হাতে পড়লে সেটা মাটি হয়ে যাবে হয়তো।

—না কি তোমার বোষ্টুমী শুধু গাইতেই জানে, রাঁধতে জানে না?
ছোট মোড়ল রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করলে।
উত্তরে প্রেমদাস শুধু হাসলে।
—বড় গুণী লোক হে তোমরা!—ছোট মোড়ল গম্ভীরভাবে বললে,—তোমাদের কাছে-পাওয়া কত ভাগ্যির কথা! তুমি যখন গাইছ, মনে হচ্ছে এমন মিষ্টি গান বুঝি কেউ গাইতে পারে না। আবার তোমার বোষ্টুমী যখন গাইছে, তখন মনে হচ্ছে এ মানে ভালো গান আর হয় না। তোমাদের জোড়া মিলেছে ভালো। এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ!
ছোট মোড়ল হাসতে লাগল।
বললে, তোমাদের গান শুনে গাঁয়ের লোক পাগল। রাত দুপুরে আমার বাড়ি এসে হাজির। বললে, বাবাজিদের কাল কিছুতেই যাওয়া হবে না। সে কি তক্ক! কেউ বাড়ি থেকে উঠবে না। শেষে যখন বললাম, তাই হবে। কাল ওদের আমি আটকাব, তখন একে একে উঠল। ওই দেখ, সব পিঁপড়ের মতো সার বেঁধে আসছে এই দিকে। আর লয়। ওঠ।
প্রেমদাস চেয়ে দেখলে, সার বেঁধেই আসছে সত্যি। বহুলোক।
কিন্তু কাল রাত্রে রাধারাণীর কেমন যেন স্ফূর্তি ছিল না। রাত্রে ঘুমের ঘোরেও মাঝে মাঝে ওকে জড়িয়ে ধরেছে। কেন অমন করেছে? ভয়ে? কিসের ভয়ে? জিজ্ঞাসা করতে প্রেমদাসের সাহস হয়নি, কিন্তু প্রশ্নটা তার মনের মধ্যে অহরহ ঘুরছে। মনটা রাধারাণীর প্রসন্ন হলে জবাব একসময় পাবে নিশ্চয়ই। সুতরাং অকারণে প্রশ্নটাকে মনের মধ্যে তোলপাড় না করে অপেক্ষা করাই ভালো।
মনে মনে মনকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রেমদাস একহাতে একতারা এবং অন্য কাঁধে ঝুলিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।
বললে, চলুন মোড়ল মশাই। ওঁরা আসবার আগেই উঠে পড়ি।
তারপরে বাইরে আরম্ভ হল প্রেমদাসের গান।

কীর্তন নয়, বাউল। একতারা আর ডুবকি বাজিয়ে। বাঁ হাতে একতারায় ঝঙ্কার দিচ্ছে। ডান হাতের ডুবকিটা ডান পায়ের হাঁটুতে বিচিত্র কৌশলে ঠুকে বাজনা বাজাচ্ছে। আর তারই তালে তালে বাজছে পায়ের নূপুর।

গ্রামের লোক আর বাকি কেউ নেই। উপরের দাওয়ায় এবং নিচের রাস্তায় তারা কাতারে কাতারে কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে নিঃশব্দে শুনছে। মাছি নড়ে তো মানুষ নড়ে না।

এই জলসার যে উদ্যোক্তা সেই মোড়ল কিন্তু নেই। সে মাথায় একখানা ভিজে গামছা জড়িয়ে মোড়ল-পুকুরের পাড়ে বসে মাছ-ধরান দেখছে। একটু অন্যমনস্ক হলেই জেলেরা দুটো মাছ সরিয়ে ফেলবে। সুতরাং সেখান থেকে তার নড়বার উপায় নেই।

প্রেমদাসের গানের সুর এত দূর আসছে না। কিন্তু ছোট মোড়লের ভারিক্কি মুখ দেখলে সন্দেহ হয় ও বোধ হয় এখান থেকেই সমস্ত গান শুনতে পাচ্ছে, এবং গায়কের জন্যে আর এই গানের উদ্যোক্তা হিসাবে নিজের জন্যে গৌরবে ও গর্বে তার বুক দশ হাত ফুলে উঠেছে।

কিন্তু রাধারাণীর বোঝা প্রেমদাসের তুলনায় অনেক হালকা।

'পায়েতে লাল পাগড়ি, মাথাতে সোনার নূপুর' গাইতে প্রেমদাসের গলার শিরা যখন ফুলে উঠেছে, কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে টপ্ টপ্ করে, রাধারাণী তখন ঘড়া কাঁখে নিয়ে এলোকেশীর সঙ্গে হাসতে হাসতে কমল সাগরে স্নান করতে চলেছে। চলার তালে তালে তার ডান হাতটা দুলছে। সঙ্গে পাড়ার আরও একদল মেয়ে জুটেছে।

এলোকেশী হচ্ছে ছোট মোড়লের ভ্রাতুষ্পুত্রবধু। যার কথা একটু আগে ছোটমোড়ল প্রেমদাসকে বলছিল। ওর সঙ্গে রাধারাণীর খুব ভাব হয়ে গেছে। ওরা একই বয়সী হবে বোধ হয়। রাধারাণীর মতো সুন্দরী না হলেও এলোকেশীও দেখতে মন্দ নয়। মুখখানি বড় মিষ্টি, বড় শান্ত, কিছু করুণ। একবার দেখলেই ওকে ভালোবাসতে ইচ্ছা করে।

এলোকেশীর শ্রমশক্তি দেখে রাধারাণী অবাক হয়ে গেছে। ঘর-নিকোনো থেকে গোরু-বাছুরকে খেতে দেওয়া এবং রান্নাবাড়া বলতে গেলে সংসারের সমস্ত কাজই ও করে। এবং করে হাসি মুখে। খুব লক্ষ্য করলে তবেই বোঝা যায়, ওই হাসির অন্তরালে বেদনার একটা ম্লান ছায়া সকল সময় মুখখানি আচ্ছন্ন করে রয়েছে।

স্নান করতে যাওয়ার পথে এবং পুকুরের জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে চুপি চুপি নিজের সমস্ত দুঃখের কথাই ও রাধারাণীকে বলে ফেললে। সাধারণত নিজের দুঃখের কথা ও কাউকে বলে না। কেউ নিজে থেকে তুললেও এড়িয়ে যায়। কিন্তু কি জানি কেন, রাধারাণীকে দেখেই ওর মনে হয়েছে একে সব কথা বলা যায়। একে সব কথা না বলে থাকা যায় না। শ্বশুরবাড়ি এসে পর্যন্ত ওর মতো সহৃদয় বন্ধু ও একটিও পায়নি।

একটি একটি করে প্রায় সমস্ত কথাই বললে।

শুনে রাধারাণীর মন হাহাকার করতে লাগল। আহা গো, আহা গো! বললে, তোমার এত রূপ, এত গুণ, তবু তোমার দিকে ফিরেও চায় না! সে কি পিচাশ! তার শরীরে কি মানুষের রক্ত নাই?

—তার দোষ নাই ভাই।

—তবে?

—এ বাড়ির হাল চাল তুমি কি কিছু বুঝতে পার নাই?

বিস্মিতভাবে রাধারাণী বললে, কিসের হালচাল?

এদিক-ওদিক চকমক করে চেয়ে এলোকেশী ফিস ফিস করে বললে, আমার শাশুড়ী আর খুড়শ্বশুরের সম্পর্কটা?

—না তো।

—সবাই জানে।

তা জানতে পারে। কিন্তু উভয়েরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। কারও মধ্যে চপলতা নেই। বাইরে থেকে এক আধ দিনের জন্যে এসে এখন দুজনের সম্পর্ক ধরা কঠিন। রাধারাণী এটা ভাবতেও পারেনি।

গালে হাত দিয়ে বললে, তাই নাকি!

এলোকেশী তার আগের কথার পুনরুক্তি করে বললে, এ গাঁয়ের সবাই জানে।

—কিন্তু মোড়ল মশাইকে দেখলে,

বাধা দিয়ে এলোকেশী বললে, না ভাই, ইদিকে খুব ভালো লোক। দয়া-মায়া আছে, দান-ধ্যান আছে। এই আকালের দিন কত লোককে চাল, মুড়ি, পয়সা দেন কেউ জানেও না। কিন্তু ওই একটি দোষ। শুধু আমার শাশুড়ী নয়, এগাঁয়ে আরও তিন-চারটি আছে। তবে দাপট আমার শাশুড়ীরই বেশি।

আবার বললে, ইদিকে মহাদেবের মত মানুষ। আমি যখন এলাম, একদিন বড় ঘরের দাওয়ায় বসে কাঁদছি, কাছে এসে বললেন, মা কপালে যা আছে তা কেউ খণ্ডাতে পারবে না। দুঃখু করে কি করবে বল? ওটা অমানুষই হয়ে গেল। কিন্তু আমি তোমাকে এনেছি। অপরাধ আমারও হল বই কি! তা জীবনভোর তোমার খাওয়া-পরার যাতে কষ্ট না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করে যাব। এই বা কে বলে বল।

—তা বটেই তো।

—কিন্তু মানুষটা যে ক্যানে অমানুষ হয়ে গেল, সে খবর কে রাখে?

সেই খবরটা জানবার জন্যে রাধারাণীও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে।

এলোকেশী বললে, আমার খুড়শাশুড়ী থাকতেই তো এই কাণ্ড আরম্ভ হয়। তারপরে যখন তিনি কিছুতেই বন্ধ করতে পারলেন না, তখন আপ্তহত্যে করলেন।

কি সর্বনাশ! রাধারাণী শিউরে উঠল!

বললে, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সবাই জানে।

আবার বললে, ও লোকটাও তো মানুষ ভাই! ওর মনের অবস্থাটা বোঝ। সেদিন এসেছিল।

—তারপরে ?

—কি বিচ্ছিরি চেহারা হয়েছে ভাই, দেখলে কান্না পায়। ঠিক যেন শ্মশানের চিতা থেকে উঠে এল। চোখ বসা, গাল ভাঙা, মুখের মধ্যে শুধু নাকটা খাঁড়ার মতো খাড়া হয়ে আছে।

—তুমি আটকে রাখলে না ক্যানে ?

—কাকে আটকাব ? ও কি আর মানুষ আছে ! ছুটে এলাম ওকে দেখে। চেহারা দেখে তখন আর আমার লজ্জাসরম নাই। নিজের হাতে বেশ করে গায়ে-মাথায় তেল মাখিয়ে দিলাম। বালতি বালতি জল এনে বেশ করে চান করিয়ে, গা মুছিয়ে, খেতে দিলাম। তারপর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে এলাম, ঘুমোও। আমি শেকল বন্ধ করে যেছি। বিকেলে আসব ফের।

—তোমার শাশুড়ী ?

—উনি দেখলেন সব। কিছু বললেন না।

—তারপরে ?

—বিকেলে শাশুড়ী বেড়াতে বেরুলে আমি ঘরে গেলাম। দেখলাম, তক্তাপোষের ওপরে চুপ করে বসে। তারপরে ভাই, পা ধরে কত কাঁদলাম। বললাম, ক্যানে ওইসব ছাই ভস্ম খাও ? ক্যানে বাড়িতে থাক না ? তোমার কিসের দুঃখু ? তোমাদের বাড়ি এ গাঁয়ের মাথা। কাকা এ গাঁয়ের কত্তা। কাকার নাম করতেই ভাই, কি রকম চনমন করে উঠল। বললে, সব সত্যি। আমি ছাইভস্ম খাই, তাও সত্যি। এক দিন অজ্ঞান হয়ে যাই। কারা লিয়ে গিয়ে হাসপাতালে দিয়ে এসেছিল। সেখানে ডাক্তার বললে, আমার সামনেই বললে, শরীরে আর কিছু নাই। আর বেশিদিন বাঁচবে না। তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে শরীরের ওপর আরও অত্যাচার করলাম, তবু কিছু হল না তো। কাকী মরে বাঁচল, আমার প্রাণটা তো কিছুতেই বেরুছে না !

এলোকেশী চুপ করলে।

বললে, অমন মূর্তি কখনও দেখি নাই। বললাম, তুমি আমার মুখের দিকেও চাইবানা? সাফ জবাব দিলে, না। বললাম, তবে আমাকে বিয়ে করলা কিসের জন্যে? বললে, আমি করি নাই। কাকা জোর করে বিয়ে দিয়ে এনেছিল। আমি কি করব?

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, ক'দিন ছিল?

—সেই রেতেই পালিয়েছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সেই ফাঁকে।

তারপরে বললে, শরীরে সত্যিই কিছু নাই। অনেক খারাপ রোগও ধরিয়েছে। আমার কাছে কিছু গোপন করলে না। কত কাঁদলে, কত আদর করলে আমাকে। বললে, এক এক সময় বাঁচতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। আর বাঁচা যায় না।

এলাকেশী কাঁদতে লাগল।

বললে, কি হবে ভাই?

রাধারাণীর পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। ওর বাঁচাও শাস্তি, মরাও শাস্তি। একটা ভয়ঙ্কর শাস্তি ওর জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে কণ্টকসেতু রচনা করেছে। অথচ ওর অপরাধ কি? ও কেন শাস্তি পাচ্ছে? তারও জবাব কেউ দিতে পারে না। জবাব দেওয়ার নামে বিস্তর হেঁয়ালি বানায় শুধু।

রাধারাণীর বাবা বলত, ঠাকুরকে ডাক। ভালো-মন্দ যা কিছু সব তাঁর হাত থেকে নাও। দেখবে, সব সহজ হয়ে গিয়েছে।

এলোকেশীকে সেই কথাই ও বললে।

আজ সন্ধ্যার আসর কিন্তু কালকের মতো জমল না।

প্রেমদাসের দিক দিয়ে অবশ্য কোন ত্রুটি হল না। তার সাধা-গলার গান, যখন যে অবস্থায় যেমন করেই গায়, একরকম উৎরে যায়। কিন্তু রাধারাণীর গান তার মেজাজের উপর একান্ত করে নির্ভর করে। আজকে তার গান তেমন জমলই না। অন্যে হয়তো অতখানি বুঝলে

না, কিন্তু প্রেমদাসের বুঝতে দেরি হল না যে, রাধারাণীর মেজাজ ঠিক নেই। কোথায় কি ঘটে থাকতে পারে যার জন্যে তার মেজাজ ঠিক নেই, তা সে জানে না। কয়েকবার তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না।

তারপরে আর এসব নিয়ে সে মাথা ঘামালে না। রাধারাণীর মেজাজের কোনোদিনই সে দিশা পায়নি। আজও পেলে না। হয়তো যথার্থই কিছু একটা ঘটে থাকবে। নয়তো কিছুই ঘটেনি, এমনিতেই মেজাজ ঠিক নেই। তার জন্যে মাথা ঘামান মিথ্যা।

গান শেষ হয়ে গেলে আহারাদির পরে যথারীতি প্রেমদাস বেঞ্চগুলো পাতলে। তার উপর কাঁথাটাও বিছালে। সর্বশেষে তামাক সেজে হুঁকোটা নিয়ে বিছানায় বসে তামাক খেতে লাগল।

রাধারাণীর গ্রামের ভিতর থেকে খেয়ে ফিরতে একটু দেরি হল। কণ্ঠস্বরে বুঝলে, তার সঙ্গে আরও মেয়ে আছে। স্কুলের ওদিকের চালার এক কোণে বসে তারা গল্প করতে লাগল।

অনেকক্ষণ ধরে বেশ মৌজ করে তামাক খেয়ে হুকোটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে প্রেমদাস শুয়ে পড়ল। তারপরে হয়তো একটু তন্দ্রাকর্ষণ হয়েছিল। মনে হল, কে যেন তার পায়ে হাত বুলোচ্ছে।

চমকে প্রশ্ন করলে, কে?

সাড়া পাওয়া গেল না।

কোমল হাতের স্পর্শ। প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে, সাড়া দিছনা ক্যানে?

—সাড়া আবার কি দোব? তোমার এই ফাটা পায়ে আমি ছাড়া আর কার হাত বুলোবার দায় পড়েছে?

প্রেমদাস হেসে বললে, হঠাৎ তোমারই বা দায় পড়ল ক্যানে?

—আমারও পড়ে নাই। দেখলাম তুমি ঘুমুছ,

—ভাবলা সেই ফাঁকে একটু পুণ্যি করে লিই। কি বল?

রাধারাণী হেসে বললে, তা বলতে পার।

এও তার আর এক মেজাজ! কখন যে সে রাগবে, কখন পদসেবা করবে, তা সে নিজেও জানে না। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু সে বুঝলে, রাধারাণীর কিছু একটা বক্তব্য আছে এবং সেই জন্যে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন সে কিছুই বলে না, নিঃশব্দে পা টিপে যায় শুধু, তখন নিজেই জিজ্ঞাসা করলে, আজ তোমার গান তেমন জমল না ক্যানে?

—ভালো লাগছিল না।

প্রেমদাসও সেই রকমই সন্দেহ করছিল। জিজ্ঞাসা করলে, ক্যানে?

—সে অনেক কথা।

—শুনিই না। গোপন কথা তো লয়?

—না, গোপন আর কি?

—তবে বল ক্যানে, শুনি।

একটু কি যেন ভেবে রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা ছোট মোড়লকে দেখে তোমার কি মনে হয়?

প্রেমদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, ভালো। খুব ভালো। এমন মানুষ হয় না।

উত্তর শুনে রাধারাণী হাসতে লাগল।

প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে, হাসছ ক্যানে?

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, ওর একটা ভাইপো আছে জান?

—মহাদেব। তাকে দেখলাম যে!

রাধারাণী চমকে উঠল: কবে? কোথা গো?

—আজ বিকেলে এসেছিল যে! চব্বিশ ঘণ্টা মদে আর গাঁজায় চুর হয়ে থাকে। বিকেলে এসে কাকাকে ডাকলে। মনে হল ছোট মোড়ল যেন ওকে ভয় করে। চাওয়ামাত্র পাঁচটা টাকা দিয়ে দিলে। সব্বনেশে ভাইপো!

রাধারাণী অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বললে, আজ এসেছিল!

কী সে ভাবছিল? জানতে পারলে সে কি মহাদেবের সঙ্গে দেখা করত? এলোকেশীর হয়ে তাকে কি বোঝাতে চেষ্টা করত? ভালো হয়ে থাকবার জন্যে, ভদ্র হয়ে থাকবার জন্যে, অন্তত এলোকেশীর জন্যে? কী ভাবছিল সে?

প্রেমদাসের কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল। উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলে, ক্যানে বল তো? কী হয়েছে ওর?

একটু ভেবে রাধারাণী উত্তর দিলে, বড় দুঃখী লোক?

মহাদেবের উপর প্রেমদাস খুব প্রসন্ন হতে পারেনি। ছোট মোড়লের মুখে তার কথা শুনেও না, তাকে দেখেও না।

বিরক্তভাবে বললে, দুঃখুটা কিসের? খাওয়া-পরার ভাবনা নাই, মাথার উপর অমন কাকা; তারও ছেলে নাই। যা কিছু আছে, সবই ওর।

—কাকার জন্যেই তো গো!

—ক্যানে? কাকা ওর কি করেছে কি?

একটু ইতস্তত করে রাধারাণী বললে, কাকার সঙ্গে ওর মায়ের সম্পক্কটা ভালো লয়।

বলতে গিয়ে রাধারাণী হেসে ফেললে। কিন্তু প্রেমদাস চমকে উঠল। রাধারাণীর মুখে শুনেও সে যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিল না; গ্রাম্য-সমাজের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। অনেক সময় মিথ্যা করেও অনেকের নামে অনেক কথা রটে।

জিজ্ঞাসা করলে, এসব তুমি কার কাছে শুনলা?

—ওই মহাদেব না কি, ওর বৌ হল এলোকেশী। সমস্ত দিন বসে বসে সেই আমাকে ওদের বাড়ির সব কথা বলেছে।

রাধারাণী বলে চলল: ছোট মোড়লের বৌ না, সে তো ওই জন্যেই আপ্তহত্যে করেছে।

—বল কি!—প্রেমদাস চমকে উঠল।

—হ্যাঁ। ছেলেটাও মরবার জন্যই ওই সব ছাইভস্ম খেছে। কিন্তু

মরতে তো পারছে না! আহা, এলোকেশীর দুঃখুর কথা শুনলে বুক ফেটে যায়। এখনও আমার বুকটা কি রকম করছে।

প্রেমদাস স্তম্ভিত।

অনেকক্ষণ পরে বললে, কিন্তু ছোট মোড়লকে দেখে তো,

—না। ইদিকে লোক ভালো। এলোকেশীর ওপরও দয়ামায়া আছে। —রাধারাণী তৎক্ষণাৎ বললে,—কিন্তু ওই একটা দোষ!

—গিন্নীকে কেমন দেখলে?

—তা দজ্জাল বলে তো মনে হয় না। তবে,—মুচকি হেসে রাধারাণী বললে,—সাঁঝের দিকে বেশ-বাসের একটু পরিপাটি আছে। হ্যাঁ।

প্রেমদাসও হাসলে। স্তব্ধতা একটুখানি যেন কাটল। কিন্তু তারপরে আবার দুজনে নিঃশব্দে বসে রইল।

এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল: বাবাজি, ঘুমুলা না কি?

—কে?

—আমি মহাদেব। দরজাটা একবার খোল তো।

প্রেমদাস শঙ্কিতভাবে রাধারাণীর দিকে চাইলে। তার অর্থ, কি অবস্থায় সে আছে কে জানে! দরজা খোলা কি ঠিক হবে?

মহাদেব কিন্তু ধাক্কা দিয়েই চলেছে।

রাধারাণী চুপি চুপি বললে, দরজা খুলেই দাও। নইলে ভেঙেই ফেলবে হয়তো। দেখছ না কাণ্ড!

প্রেমদাস উঠতে উঠতে বললে, খুলছি, দাঁড়াও হে!

দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার! এত রেতে?

মহাদেব সে প্রশ্নের আর উত্তর দিলে না। কঠোর ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আর ক'দিন থাকবা তোমরা? পরের ভাত বড় মিষ্টি লাগে, লয়?

প্রেমদাস অবাক হল না। বুঝলে ক্রমাগত নেশা করার ফলে ছেলেটির মস্তিষ্কের স্থিরতা নেই। ছেলে নয়, ওরই সমবয়সী হবে প্রায়।

হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি যাও নাই? বস, বস।

একটা বেঞ্চের উপর তাকে স্নেহভরে নিজের পাশে বসালে। বললে. আমি ভেবেছিলাম চলে গিয়েছ বুঝি ?

মহাদেব গোঁ গোঁ করে বললে, না। তোমাদের জন্যেই থাকতে হল।

—আমাদের জন্যে ? ক্যানে ?

—তোমাকে আমার সন্দ হয়।

প্রেমদাস উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে সন্দ হয় ? কিসের সন্দ ?

মহাদেব হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠল ঃ কিসের সন্দ ! জান না বাড়িতে আমার বউ আছে ?

—বাড়িতে তোমার বউ আছে তা আমার কি !

রাধারাণী দরজার আড়ালে এসে দাঁড়াল। পরিষ্কার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, বাড়িতে মানুষ-জন এলে অত যদি সন্দ, তাহলে নিজে বাড়িতে থাকলেই তো পারেন। নিজে বাড়ি ছেড়ে থাকেন ক্যানে ?

হঠাৎ মেয়ে মানুষের ধমক খেয়ে মহাদেব প্রথমটা হতচকিত হয়ে গেল। একটা জবাবও তার মুখে এল না।

তারপর বললে, সে আমার ইচ্ছে। তোমার কি ?

রাধারাণী জবাব দিলে, তাহলে এলোকেশীও যা ইচ্ছে তাই করবে। আপনার কি ?

এবারে মহাদেব সত্যই থতমত খেয়ে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে বোকার মতো শুধু রাধারাণীর প্রশ্নটারই পুনরাবৃত্তি করলে ঃ আমার কি !

—হ্যাঁ, আপনার কি ! আপনি কিসের সোয়ামী ! খেতে পরতে দেন, না বাড়িতে থাকেন ? আমরা তো ভাবছি, ওকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। গিয়ে বোষ্টম করে মালাবদল করে বিয়ে দিয়ে দোব।

—খুন করে ফেলব ! খুন করে ফেলব !

মহাদেব ছিটকে উঠানে গিয়ে দাঁড়াল। প্রেমদাস ছুটে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এসে আবার বেঞ্চে বসাল। বললে, তোমারই তো দোষ

মহাদেব। তুমি বাড়িতে থাকবা না। অমন সোন্দর বউ, তাকে আদর-যত্নও করবা না। এ তো ভালো কথা লয়।

এবারে মহাদেব কেঁদে ফেললে। একেবারে ছোট ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বলতে লাগল : তাহলে এইবারে আমি নিশ্চয় মরব।

প্রেমদাস ওর মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, ক্যানে, মরবাই বা ক্যানে? তুমি ভালো হও, ভালো হয়েই বাড়িতে থাক।

—আমার ভালো হবার আশা নাই।

—ক্যানে, আশাই বা নাই ক্যানে? নেশা কি কেউ করে না?

—আমার শরীরে অনেক রোগ ঢুকেছে।

—বেশ তো। চিকিচ্ছে করাও।

—করিয়েছি। কিছু হয় নাই। জান বাবাজি, কবে আমি মরে যেতাম। নয়তো কাকীর মতো আপ্তহত্যে করতাম। শুধু ওই আপদটার জন্যেই পারি না। ভাবি, বেঁচে আছি তবু তো শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে ঘর করছে।

রাধারাণী আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল। হয়তো পাগলের প্রলাপ। তবু চোখের জলে ভিজানো স্বচ্ছ সরল কথাগুলোয় যে আন্তরিকতা মেশানো ছিল, তাইতে তার বুক ফেটে যেন কান্না আসছিল।

কিন্তু মুখে ঝঙ্কার দিয়ে বললে, আহা! কত দরদ!

কান্না থামিয়ে মহাদেব আরক্ত চোখ তুলে যেখানে আড়ালে ও দাঁড়িয়েছিল সেইখানে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানলে।

গর্জে উঠল : তুমি মেয়ে মানুষ, তুমি তার কি বোঝ?

—না। যত বোঝমান উনি!—রাধারাণী আবার টিপ্পনি কাটলে।

আবার রেগে উঠছে দেখে প্রেমদাস মহাদেবকে শান্ত করবার জন্যে বললে, ও মেয়েমানুষ, ওর কথা শোন ক্যানে?

মহাদেব বলতে লাগল : আমাকে কেউ বোঝে না বাবাজি। ভাবে গাঁজাল, মাতাল, পাগল!

—কে বললে!—প্রেমদাস সান্ত্বনা দিয়ে বললে,—আমি তো বুঝতে পারছি।

—পারছ?

—খুব পারছি।

—কি বুঝছ বল তো?

—বুঝছি যে যাই বলুক, বউকে তুমি খুব ভালোবাস।

—এ্যাই!—মহাদেব লাফিয়ে উঠে ওর হু'খানা হাত জড়িয়ে ধরলে,—তুমি বুঝেছ। কেউ বোঝে নাই, বউও না। খালি তুমি বুঝেছ!

হঠাৎ মহাদেবের গলা যেন বুঁজে এল। বললে, বাবাজি, আমি সত্যই বউকে খুব ভালোবাসি। ইচ্ছে করে ওর কাছাকাছি থাকি।

—তা থাক না ক্যানে?

—পারিনা। কে যেন আমাকে ঠেলতে ঠেলতে পথে বার করে দেয়।

বলতে বলতে মহাদেব শিউরে উঠল। তার চোখ স্থির হয়ে গেল। মাথার চুলগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল।

—মহাদেব! মহাদেব!

ভয়ে প্রেমদাস প্রায় চিৎকার করে উঠল।

মহাদেব ধীরে ধীরে ওর দিকে চাইলে। অত্যন্ত সহজ, শান্ত দৃষ্টি। মৃদু হেসে বললে, তোমার কাছে বিড়ি আছে বাবাজি?

অত্যন্ত সহজ কথা। এতক্ষণ ধরে যে সমস্ত কথা হচ্ছিল, তা যেন সত্য নয়, স্বপ্ন মাত্র।

অকস্মাৎ ওর এই সহজ স্থরের কথায় প্রেমদাস, এবং ঘরের ভিতরে রাধারাণীও, যেন থতমত খেয়ে গেল।

—বিড়ি! বিড়ি তো নাই।

—আচ্ছা। তাহলে উঠলাম।

মহাদেব তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হন হন করে চলতে লাগল। প্রেমদাস এসে তার হাত চেপে ধরল।

বললে, চল। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না।

মহাদেব দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সমস্ত দেহ জেদে শক্ত হয়ে উঠেছে।

—তামাক খাবা ?

মহাদেব ইতস্তত করতে লাগল, খাবে কি খাবে না।

স্কুল ঘরের দিকে টেনে আনতে আনতে প্রেমদাস বললে, চল একটু তামাক খাওয়া যাক।

মহাদেব আপত্তি করলে না।

প্রেমদাস তামাক সেজে ছুটো টান দিয়ে কলকেটা ওর হাতে দিলে।

মহাদেব নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগল। টানছে তো টানছেই। অনবরত টেনেই চলেছে।

প্রেমদাস অক্লান্ত ভাবে কলকের পর কলকে সেজে দেয়। মহাদেব নিঃশব্দে টেনে যায়। কেউ কোনো কথা বলে না।

অবশেষে ভোর হল।

প্রেমদাস বললে, চল তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

মহাদেব শান্ত ছেলের মতো উঠে দাঁড়াল এবং নিঃশব্দে প্রেমদাসকে অনুসরণ করতে লাগল।

ছোট মোড়ল গোয়ালঘর থেকে গরু বার করছিল। ওদের ছুজনকে দেখে অবাক। তারও ধারণা ছিল মহাদেব চলে গেছে। কিন্তু জানে, মহাদেব তাকে দেখলেই চটে যায়, তাই সে সাড়া না দিয়ে দেখতে লাগল ওদের গতিবিধি।

মহাদেবকে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে প্রেমদাস যখন ফিরছে, তখন ছোট মোড়ল ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার!

প্রেমদাস সমস্ত কথা বললে। ছোট মোড়ল স্থির হয়ে শুনতে লাগল।

ওর কথা শেষ হতেই ছোট মোড়ল প্রেমদাসের হাত ছুটো ধরে বললে, এ গাঁয়ের কেউ পারে নাই। তুমি হয়তো পারবা। আমার মহাদেবকে তুমি থিতু করাও, আমি এই গাঁয়েই তোমার আখড়া করে দোব। তোমার নামে পাঁচ বিঘে জমি লেখাপড়া করে দোব। আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

বলেই হাঁটু গেড়ে বসে খপ করে ওর পা ছুটো চেপে ধরলে।

—আহা, করেন কি, করেন কি, মোড়ল মশাই!

বলে চকিতে পা ছাড়িয়ে ওর হাত ধরে ওঠালে।

ছোট মোড়লের সমস্ত শরীর তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে। ছুই চোখে শ্রাবণের ধারা নেমেছে। ঠোঁট কাঁপছে।

কোনোমতে বললে, আমাকে তুমি বাঁচাও!

চার

আবার পথ।

ছোট মোড়ল ছাড়েনি। আরও ক'টা দিন থাকতে হয়েছিল ওদের। সকলেই আশা করেছিল, প্রেমদাস থাকলে মহাদেব থেকে যাবে হয়তো। ঘর একবার বশ হয়ে গেলে হয়তো ঘরের মধ্যে স্থিতি লাভ করবে ছেলেটা।

এলোকেশী প্রাণপণ যত্ন করেছে মহাদেবের। সময়ে নাওয়ানো-খাওয়ানো, এমন কি ঘুম পাড়ানো পর্যন্ত। রাধারাণী, এলোকেশী ওর কাছে বসে গল্প করেছে। পালা করে পাহারাও দিয়েছে।

রাধারাণী কত গল্প করেছে, গান শুনিয়েছে, রঙ্গ-তামাসা করেছে,—নতুন জামাই এলে যেমন করে, তেমনি করে। তাতে করে মহাদেবের বিষণ্ণতা মাঝে মাঝে কেটেছে, পরিষ্কার বোঝা গেছে।

তথাপি মহাদেবকে রাখা গেল না। দিনেই কখন এক সময় পালিয়ে গেল।

হয়তো ও ইচ্ছে করে পালায় না। বোঝা না গেলেও মহাদেব হয় তো ঠিকই বলেছে ঃ কে যেন ওকে ঠেলতে ঠেলতে পথে বার করে দেয়।
এলোকেশী কথাটা বিশ্বাস করে। রাধারাণীও।
বলে, অমন হয়। ওরা দুজনেই নাকি, কেউ বাপের বাড়িতে, কেউ মামার বাড়িতে অমন ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছে। কোনো কোনো মানুষের ঘাড়ে নাকি অপদেবতা ভর করে। তখন নিজেরই উপর আর তাদের জোর থাকে না। অপদেবতায় যা বলায় তাই বলে, যা করায় তাই করে। তখন আর তার নিজের সত্তা বলে কিছু থাকে না।
বইতে আছে না, শঙ্করাচার্য এক রাজার মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। মড়া বেঁচে উঠল। ঘর-সংসার করতে লাগল। বাইরের দেহটা সেই রাজারই বটে। সেই আকৃতি। সেই চোখ-মুখ-কণ্ঠস্বর। কিন্তু ভিতরের সত্তাটা শঙ্করাচার্যের। এও তেমনি।
বাইরের মানুষটা মহাদেব, ভিতরের মানুষটা অন্য। বাইরের মানুষটার আর দাম কি! ভিতরের মানুষটাই তো চালায়।
আচার্য-গিন্নীর কাছে এই কথা শুনে ভয়ে এলোকেশীর হাত-পা যেন পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। আচার্যেরা দৈবজ্ঞের বংশ। ওরা হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। অপদেবতাদের সম্বন্ধেও অনেক কথা জানে। ওদের কথা অবিশ্বাস করা যায় না।
এলোকেশী রাধারাণীকে বললে, তবে ভাই আমি কার সেবা করলাম? কাকে অত যত্ন করলাম? ভাবতেও ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে!
রাধারাণী এই প্রশ্নের তখন জবাব দিতে পারেনি। এলোকেশীর জায়গায় নিজেকে বসিয়ে ব্যাপারটা কল্পনা করতেই তার গা যেন গুলিয়ে উঠল!
এই কথাটা সমস্ত পথ রাধারাণী মনের মধ্যে নানাভাবে তোলাপাড়া করতে করতে আসছিল। প্রশ্নটা প্রেমদাসের কাছে তুললে রান্না করবার সময়।

বিলের মধ্যে নানা রকম গাছের মস্ত বড় একটা বাগান। মধ্যেখানে প্রকাণ্ড বড় একটি পুকুরও আছে। জায়গাটা যদিও চারিদিকেই গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে, কিন্তু ভারি মনোরম।

গ্রামে গিয়ে ভিক্ষার, কিংবা কোনো জিনিস কেনার প্রয়োজন ছিল না। মোড়ল-বাড়ির সকলেই ওদের খুব ভালোবেসে ফেলেছিল। আগের দিন রাত্রেই মোড়ল গিন্নী ওদের জন্যে তিন-চার বেলার মতো চাল-ডাল-বেগুন-কচু, এমন কি নুন-তেল-লঙ্কা পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছিল। একটা ন্যাকড়ায় বেঁধে কিছু গুড়-মুড়িও।

বেরিয়েছিল ওরা একটু রাত থাকতেই। গ্রামে যাকে বলে হাঁড়িতোলা রাত। তখনই গ্রামের বহু লোক এসেছিল ওদের বিদায় দিতে। ছোট মোড়ল প্রেমদাসের এবং গিন্নী রাধারাণীর হাতে ধরে কত সেধেছিল না-যাবার জন্যে।

বার বার করে বলে ছিল, থেকে যাও। আমাদের তো ছেলে থেকেও নাই। জানব তোমরাই আমাদের ছেলে-বউ। আখড়া করে দিছি, কিছু জমি লিখে দিছি, থাক।

জাতে কে বড়,—বৈষ্ণব না সদ্‌গোপ—সে প্রশ্নের মীমাংসা কোনো-দিনই হবে না। কেউ কারও হাঁড়িতে খায় না। প্রেমদাসও জাত-বৈষ্ণব। খুবই গোঁড়া।

কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে তার মন থেকে জাতের হিসাব মুছে গেল। ছোট মোড়ল এবং বড় গিন্নীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললে, তোমরাই আমাদের বাপ-মা, একথা কোনো দিন ভুলব না। কিন্তু থাকতে বোলো না। থাকতে পারব না।

—ক্যানে পারবা না বাবা?—ছোট মোড়ল কাঁদতে কাঁদতে করুণ মিনতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল।

—সে আর একদিন বলব বাবা। আজ আসি।

প্রেমদাস কারণ বলে নি। এই বাগানে ঝুলিঝাম্পা নামিয়ে বললে, মানুষ-জনের মধ্যে অনেক দুঃখ রাধু। দিনে এইখানেই দুটো রাঁধা-বাড়া হক?

স্বামীর মুখে নিজের নাম শুনে রাধারাণী কেমন যেন হয়ে গেল। একমুখ হেসে বললে, তুমি আমার নাম করলা যে! কখনো তো কর নাই।

—ভালো লাগল না?

ঘাড় বেঁকিয়ে রাধারাণী জানালে, লাগল। কিন্তু কখনো তো নাম ধরে ডাক নাই?

—গাঁয়ে-ঘরে পারা যায় না।

গাঁয়ে-ঘরে অনেক কিছুই পারা যায় না। ইচ্ছাও হয় না। কিন্তু বাইরে পারা যায়। এ তত্ত্ব এই ক'দিনেই রাধারাণী বুঝেছে। প্রেমদাসের মুখে নিজের নাম শুনে তার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

বললে, আর গাঁয়ে ফিরে যাব না।

প্রেমদাসও বললে, না। মানুষজনের মধ্যে অনেক দুঃখ। কিন্তু

—কিন্তু কি?

উত্তর না দিয়ে প্রেমদাস মিটি মিটি হাসতে লাগল।

রাধারাণী ঠেলা দিয়ে বললে. কিন্তু কি, বল। তোমার হাসি দেখলে গা জ্বলে যায়!

প্রেমদাস বললে, ছেলে পিলে হলে তো আর এমন নিরিবিলি বনে-গাছতলায় থাকা যাবে না। তাই বলছিলাম।

রাধারাণী ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে জলে নামল।

রান্না করতে করতে রাধারাণী এলোকেশীর কথাটা বললে। জিজ্ঞাসা করলে, অপদেবতার কথাটা তুমি বিশ্বাস কর?

অদূরে একটা গাছে ঠেস দিয়ে প্রেমদাস চুপ করে বসে ছিল। হাসতে হাসতে বললে অপদেবতা যদি সত্যিই থাকে, তাহলে আছে। আমি বিশ্বেস করলেই কি, আর না করলেই বা কি।

—কিন্তু তোমার বিশ্বাসটা কি তাই সুধুছি। মহাদেবের বাইরেটা

মহাদেব, আর ভেতরে অন্য লোক, ভাবতেই যে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে গো !

প্রেমদাস শুধু বললে, কাঁটা দেবারই ব্যাপার।

—তাহলে এলোকেশীর কি হবে ?

—কি আর হবে ! অপদেবতা থাকে, আবার চলেও যায়।

—মহাদেবেরও একদিন চলে যেতে পারে তো ?

—পারেই তো। গোঁসাই বলতেন, ও কি ও করছে রে, ভূতে করাছে !

রাধারাণী একটা কাঠি দিয়ে ভাতটা নেড়ে দিতে যাচ্ছিল। থমকে বললে, সে আবার কি !

—গোঁসাই বলতেন, সব মানুষের মধ্যেই দেবতাও আছেন, অপদেবতাও আছেন। যেটা ভালো সেটা দেবতা করান, মন্দটা অপদেবতা।

রাধারাণী বিশ্বাস করতে পারলে না। সে শুনে এসেছে, অপদেবতা বাইরে থাকে তক্কে তক্কে। সুযোগ পেলে মানুষের ঘাড়ে চাপে। সেটা যে সব মানুষের ভিতরেই আছে, এ কি বিশ্বাস করার ব্যাপার !

হেসে বললে, বাজে বোকো না, যাও। তোমার ভেতরেও আছেন ?

—আছেন বই কি !

—আমার ভেতরে ?

—তাও আছেন।

—বাজে কথা।

প্রেমদাস তারও প্রতিবাদ করলে না। সে সমস্ত ক্ষণ অন্য কথা ভাবছিল। সেই কথারই জের টেনে বললে, কি আশ্চয্যি ব্যাপার দেখ !

রাধারাণী চমকে বললে, কোথা ?

ভয়ে ভয়ে সে চারিদিকে চাইতে লাগল।

প্রেমদাস বললে, এই ছোট মোড়লদের কথা আর কি।

—কি কথা ?

—এমনিতে ছোট মোড়ল লোক খারাপ লয়।

রাধারাণী সায় দিলে, তা লয়।

—মহাদেবের ওপর টানও খুব !

—তা আর বলতে ! বুড়ো মানুষ, ব্যাগর্তাতে তোমার পা জড়িয়েই ধরলে !

—গিন্নীরও মন ভালো। আমরা পর, আমরা চলে আসতেই কি কান্না কাঁদলে ! আর মহাদেব তো তার নিজের পেটের সন্তান।

—তা বটে।

—মহাদেবও ধর গিয়ে মন্দ লয় ! বউটাকে ভালোও বাসে। ইচ্ছে করে তার কাছে থাকে। তাকে ছেড়ে যেতে সত্যিই চায় না। তবু ছেড়ে যায়।

—সেইটেই তো অপদেবতা গো ! তার জন্যেই তো ঘরে থাকতে লারে !

—তাই বলছি। আর দেখ, এলোকেশী তো নিষ্পাপ।

—ওরে বাবা ! সতীলক্ষ্মী যাকে বলে ! ওই মাতাল-গাঁজাল সোয়ামীকে কি যত্নটা করলে, নিজের চোখেই তো দেখলাম।

—তবেই দেখ গেরোর চক্রটা ! চারটে মানুষকে, দোষ তাদের যাই হোক, একেবারে যেন চরকি ঘোরাছে ! সোনার সংসারটাকে একেবারে তছনছ করে দিলে, অ্যাঁঃ !

এই কথাটাই কাল থেকে সমানে ভাবছে প্রেমদাস। ঘটনার কঠিন অনিবার্যতা তাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। যতই ভাবছে, কিছুতেই আর দিশা পাচ্ছে না। একেই সে বলছে গ্রহের চক্রান্ত।

যৌবনের উন্মত্ততায় একটা ভুল ছোট মোড়ল এবং গিন্নী করে ফেলেছে। ভেবে-চিন্তে নয়। এমন ভুল কেউ বড় একটা ভেবে-চিন্তে করে না। অকস্মাৎ করে বসে। বীজটা এইখানে। কিন্তু তার যে গাছটা উৎপন্ন হল, সেটা কী ভয়ঙ্কার। কী প্রকাণ্ড তার ব্যাপ্তি ! একটা

বৌ আত্মহত্যা করলে। একটা ছেলে বয়ে গেল। একটা মেয়ের জীবন বিষময় হয়ে উঠল। একটা সংসার ধ্বংসের পথে।

আর ছোট মোড়ল আর বড় গিন্নী। তাদের মধ্যদিনের ভুল অপরাহ্ন বেলায় এমনই সহজ, স্বাভাবিক এবং হয়তো বা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে যে, আজ তারা নিজেরাও সম্ভবত অসহায়। প্রবল স্রোতে তৃণের মতো ভেসে চলেছে। ভুল সংশোধনের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ।

কিন্তু সে যাই হোক, এবিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা প্রত্যেকেই মেলবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে। ছোট মোড়ল, বড় গিন্নী, এলোকেশী, এমন কি মহাদেব নিজেও। কিন্তু অনিবার্য এবং প্রচণ্ড ঘটনা-প্রবাহ এমন বিচ্ছিন্নভাবে তাদের পৃথক পৃথক কক্ষে এমন-ভাবে আবর্তিত করছে যে মিলনের লেশমাত্র সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

রাধারাণী বললে, অপদেবতার কি দয়া-মায়া কিছুই থাকে না গো ?

প্রেমদাস ম্লান হেসে বললে, অপদেবতা কখনো তো চোখে দেখি নাই, দেখা যায় কিনা তাও জানিনা! দেখা হলে শুধুই।

বাধা দিয়ে রাধারাণী ব্যস্তভাবে বললে, রক্ষে কর বাপু! আর দেখা হয়ে কাজ নাই!

একটুখানি কি যেন ভেবে প্রেমদাস বললে, তোমার মদনকে মনে পড়ে ?

—সেই যার কিসের-যেন-কলে হাত কেটে গিয়েছিল ?

—হ্যাঁ ?

—মদন মরেই গেল তারপরে, না ?

—হ্যাঁ। তুমি সেই কলটাকে কি বলবে ? দয়া-মায়া নাই ?

—কলের আবার দয়া-মায়া কি ? কল কি মানুষ ?

—ঠিক তাই। আমার কি মনে হয় জান ? অপদেবতাই বল, আর গেরোই বল, সেও ঠিক অমনি কলের মতো। মানুষ নয়। গরু-ভেড়ারও মমতা আছে। তাও নয়। কল।

রাধারাণী বড় বড় চোখ মেলে গভীর আগ্রহে যেন ওর কথাটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল। বোঝাতে প্রেমদাসও পারছেনা। নিয়তির অন্ধ গতিবেগ মানুষের জীবনকে বলির পশুর মতো যে নিষ্করুণ ট্র্যাজেডির গহ্বরে টেনে নিয়ে যায়, তাকে সেও বোঝেনি। কিন্তু সেই অমোঘ শক্তির প্রচণ্ডতার একটা আভাস হয়তো ঈষৎ অনুভব করছে।

অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে রাধারাণী বললে, তাই বটে। কলই বটে। চোখও নাই, কানও নাই। খালি আপন মনে ঘুরে চলে।

—কিন্তু আমরা মানুষ। আমরা সইতে পারি না। আমাদের চোখ ফেটে জল পড়ে।

প্রেমদাস তার পাগড়ির প্রান্ত দিয়ে চোখটা মুছলে।

তারপর বললে, ছোট মোড়ল অমন করে বললে থেকে যাবার জন্যে। জমি পর্যন্ত লিখে দোব বললে। কত কাঁদলে। থাকলাম না ক্যানে জান ?

— ক্যানে ?

— ভয়ে।

ভয়ই বটে। একটা অজ্ঞাত শীতল ভয়। রাধারাণীর তো থেকে যাবার খুবই ইচ্ছা করছিল। সেও রাজি হয়নি ভয়ে। বললে ঃ

—ওই অপদেবতার ভয় তো ? আমারও তাই।

একটু ভেবে প্রেমদাস বললে, আর মজা দেখেছ, যত নষ্টের গোড়া তো ছোট মোড়ল বড় গিন্নী ? কিন্তু ওদের ওপরও আমার রাগ হয় না। তোমার হয় ?

রাধারাণী সিদ্ধ আলুগুলো ছাড়াচ্ছিল। মুখ না ফিরিয়েই তৎক্ষণাৎ বললে, না। দুঃখু হয়।

—ঠিক তাই। অথচ মহাদেব ওদের কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলে না !

—না।

—আচ্ছা এলোকেশী ক্ষমা করতে পেরেছে ?

—রাগ আছে বলে তো মনে হয় না।

—কিন্তু ছোট মোড়ল কি রকম মহাদেবকে ভয় করে দেখ নাই তো!

—খুব ভয় করে?

—ভীষণ। ওর সামনে কি রকম থতমত খেয়ে যায়। টাকা চাইবামাত্র যেখান থেকে পারে টাকা এনে দিয়ে দেয়।

রাধারাণী মন্তব্য করলে, ভালোবাসে খুব।

প্রতিবাদ করে প্রেমদাস বললে, না। এটা ভালোবাসা লয়, ভয়।

তারপরেই বললে, রান্না হল তোমার? ক্ষিদে পেয়েছে খুব।

রাধারাণী ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে, এই যে হয়েছে।

আহারাদির পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে প্রেমদাস আবার ঝুলি-ঝাম্পা কাঁধে তুলে নিলে। বললে, আর দেরি নাই সাঁঝ লাগাদ শহরে পৌঁছে যাব।

শহরের কথাটা রাধারাণী বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল। কোনো একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যে তারা পৌঁছুতে চায়, এ আর তার মনেই পড়ছিল না। মনের সামনে বড় হয়ে ছিল চলাটাই।

'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।' পরশ পাথরই তার লক্ষ্য, তার অনেক কামনার ধন। কিন্তু অভ্যাস লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্যটাই বড় করে তুললে। পরশপাথর মনের চোখের আড়ালে চলে গেল। খোঁজাটাই বড় হয়ে দাঁড়াল।

রাধারাণীরও বুঝি তাই হয়েছিল। তারা চলেছে। চলে আসছে। গ্রাম থেকে গ্রামে। মাঠ থেকে বিলে, সেখান থেকে আবার মাঠে। গত কয়েক দিনে এইটেই তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এই পথ যে একদিন শেষ হবে, তাদের যে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, এ ভুলেই গিয়েছিল।

তাই সেই লক্ষ্য সন্নিকট শুনে সে চমকে উঠল। বললে, ইরি মধ্যে?

প্রেমদাস হেসে বললে, ইরি মধ্যে কি গো! কবে থেকে হাঁটতে আরম্ভ করিছি ভাব তো। মনে হচ্ছে যেন জন্ম-জন্ম হেঁটেই আসছি।

—তাই বটে!—রাধারাণীও হাসলে,—হাঁটতে আমার পায়ে আর ব্যথা করে না।

প্রেমদাস একবার পিছন ফিরে দূরের দিকে চাইলে। তার দেখাদেখি রাধারাণীও।

একটা দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রেমদাস বললে, হুই দূরে নালতেডাঙ্গা লিকলিক করছে! দেখছ?

রাধারাণী দেখতে পেলে কি না ভগবান জানেন। জিজ্ঞাসা করলে, আর আমাদের কেনারামপুর?

মুখে একটা ফুঁ দিয়ে প্রেমদাস বললে, কেনারামপুর কি এখানে! সে কি দেখা যায়?

কিন্তু দেখা যায়। চোখের সীমানার বাইরে দিগন্তরেখার ওপারে হলেও দেখা যায়। রাধারাণী দেখতে পেলে।

দেখতে পেলে : আকাশ জুড়ে মেঘ উঠেছে। দেখতে দেখতে ঝড় এল। তালের পাখায়, আমের বনে, বটের শাখায় কোলাহল পড়ে গেছে। পুকুরে গিন্নীরা বউরা গিয়েছিল গা ধুতে। মেঘের অবস্থা দেখে কলরব করতে করতে তারা ফিরছে। কিন্তু রাধারাণীরা ভয় পায় না। তারা ছুটেছে আমবাগানে আম কুড়োবার আনন্দে। তারপরে নামল বৃষ্টি। বৃষ্টি নয়, একেবারে শিলাবৃষ্টি। মোটা মোটা বরফের শিলা। সেই শিলাতে দত্তদের টুনুর মাথা ফুটে গিয়েছিল। ক'দিন ধরেই ভুগেছিল। মাথার মধ্যে সেই এক ফোঁটা জায়গায় তার টাকের মতো ছিল। বোঝা যেত না অবশ্য। চুলে ঢাকা থাকত।

দেখতে পেলে।

আজকের কেনারামপুরকে নয়। অনেক দিন আগেকার কেনারামপুরকে। তখন ওদের বয়স ছিল আট, কি নয়। একটি ঘণ্টার ঘটনা এক মিনিটেই দেখে নিলে।

প্রেমদাস বললে, গাঁয়ের লোকে কি ভাবছে কে জানে !

রাধারাণী সাড়া দিলে না।

প্রেমদাস বললে, হয়তো ভাবছে এরা হঠাৎ গেল কোথা ? এঁ্যাঃ !

রাধারাণী হাসলে। তার গয়ারামকাকা শেষে খুব জোরের সঙ্গে একটা এঁ্যাঃ বলে।

বললে, গেল বছর এমনি সময় গয়ারাম কাকার ছোট ছেলেটাকে সাপে কাটে। কত ওঝা এল। ঝাড়-ফুঁক। কিছুতেই বাঁচানো গেল না। গয়ারামকাকা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল।

—বড় ভালো লোক। কিন্তু একটু যেন ছিট আছে, না ?

—সেই থেকেই।

প্রেমদাস একটু পরে বললে, এখন সবাই কি করছে বল তো ?

—এখন ?—ভ্রূ কুঁচকে রাধারাণী কি যেন ভাবলে।

বললে, গোবিন্দ জ্যেঠা আমাদের আখড়ার সামনে আমতলায় বসে কাবারী চাঁচছে। জ্যেঠার একখানি তো চালা-ঘর। তার জন্যে কত কাবারী লাগে ভগমান জানেন। কিন্তু জ্যেঠার কাবারী চাঁছা আর শেষ হয় না !

রাধারাণী হাসলে।

প্রেমদাস বললে, গন্‌শা বোধ হয় এখনও চানও করে নাই, খায়ও নাই। ডোবায় ডোবায় লোপা দিয়ে দিয়ে মাছ ধরছে। আর তার মা বাড়ি থেকে চিলের মতো চ্যাঁচাচ্ছে।

—হ্যাঁ।—রাধারাণী হাসলে। বললে, ওর দাদা তো ডোবার জলেই মারা যায়। সেই ভয়েই চেঁচায়। তখন তুমি আস নাই।

না। ওর দাদাকে প্রেমদাস দেখেনি। জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছিল ?

—আমাদের বয়িসী। থাকলে এতদিন আমার মতোই হত।—অন্য-মনস্কভাবে রাধারাণী বললে।

প্রেমদাস তার প্রশ্নের পুনরুক্তি করলে : কি হয়েছিল ?

রাধারাণী বললে, তারও অমনি মাছ ধরার বাতিক ছিল কি না। কিন্তু একটা ব্যামো ছিল। কেউ বলে ডাকিনি, কেউ বলে ফিট।

আবার সেই অপদেবতা! রাধারাণী হাসলে।

প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে, তারপরে?

—তারপরে একদিন ভত্তি দোপর বেলা। হঠাৎ ব্যামোটা উঠে পড়ল। আর পড়ল ডোবার জলে মুখ গুঁজে! জলে পড়লে তো আর রক্ষে নাই।

—মরে গেল?

—তক্ষুনি!

—আহা রে!

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মা-বাপের কোল ছেড়ে কেন চলে যায়? সংসারে ক'দিন মাত্র থেকেই তাদের যাবার সময় হয়ে আসে? শুনলেও বেদনায় মনটা কেমন ছমছম করে ওঠে।

—আর তোমার গঙ্গাজল?

হ্যাঁ, গঙ্গাজল। সমবয়সী এই মেয়েটির সঙ্গেই রাধারাণীর ভাব সবচেয়ে বেশি। শৈশবে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তুজনে 'গঙ্গাজল' পাতিয়েছিল। সেই সখ্যতা কোন দিন ম্লান হয়নি।

রাধারাণী বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, এমনি করে একদিন চলে আসতে হবে জানলে 'গঙ্গাজল' পাতাতাম না।

প্রেমদাস বলে, মানুষ-জনের মধ্যে অনেক তুঃখু রাধু। রাধারাণী বলে, এমন জানলে 'গঙ্গাজল' পাতাতাম না। একই কথা। এবং পথে নেমেই এই যে তত্ত্ব তারা লাভ করেছে, এইটেই তাদের পীড়া দিচ্ছে সব চেয়ে বেশি।

পাঁচ

শহর। গঙ্গার এপার থেকেই দেখা যায় কিসের-একটা-কলের চিমনি থেকে অবিরত ধোঁয়া উঠছে।

রাধারাণী প্রেমদাসের হাত ধরে টানলে। চুপি চুপি বললে, আগুন লেগেছে।

—কই ?

রাধারাণী নিঃশব্দে চিমনিটির দিকে আঙুল দেখালে।

প্রেমদাস ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আশ্বস্ত হয়ে বললে, আগুন লয়, কলের ধুমো।

ধোঁয়া বটে! তার আর থামা নেই। সেইদিকে অবাক হয়ে চেয়ে আসতে আসতে রাধারাণী হোঁচট খেলে। প্রেমদাস ধরে না ফেললে, পড়েই যেত।

প্রেমদাস চুপি চুপি সতর্ক করে দিলে: দেখে চল। এ কেনারামপুর লয়। পাথরের রাস্তা। লাগলে পায়ের নখ উল্‌টে দেবে।

রাধারাণী অপ্রস্তুতভাবে হাসলে। সাবধানে হাঁটতে লাগল।

বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে শহর। দূর থেকে সে এক অপূর্ব শোভা!

রাধারাণী আবার প্রেমদাসের আঙুল ধরে টানলে।

—কি ?

—যাত্রা হচ্ছে।

—কোথা ?

রাধারাণী চোখের ইসারায় গঙ্গার ওপারে শহরটাকে দেখালে।

প্রেমদাস হাসলে: যাত্রা হবে ক্যানে ?

—তবে ?

—বিজুলী আলা। ঘরে ঘরে জ্বলছে।

—অত জোর আলা।

—হবে না? একি কেনারামপুরের হেরিকেন পেয়েছ?

তাই বটে। রাধারাণী গম্ভীরভাবে বললে, খুব কেরাচিন খায়।

—কিসে?

—ওই আলায়।

প্রেমদাস হো হো করে হেসে উঠল: কেরাচিন কোথা পাবা?

—তবে?

—বিজুলীতে জ্বলে। আকাশের ওই বিদ্যুৎ আছে না? ওতেই। তারে তারে। গিয়ে দেখবা মজা! জ্বালতে দেশলাই লাগেনা।

—তবে?

—কল আছে। পিট্ করে টিপবা আর দপ্ ক'রে আলা জ্বলে উঠবে।

রাধারাণী গালে হাত দিলে: অবাক কাণ্ড! দেশলাই লাগে না?

প্রেমদাস আরও কয়েকবার কি কি উপলক্ষ্যে যেন শহরে এসেছিল। এখানকার কিছু কিছু তার দেখা এবং চেনা।

ভারিক্কি চালে বললে, এ আর অবাক কি! আগে গঙ্গা পেরুই, তারপরে কত অবাক হতে পার হয়ো!

জিজ্ঞাসা করলে, হাওয়া-গাড়ি দেখেছ?

রাধারাণী অপ্রস্তুতভাবে ঘাড় নাড়লে।

—কি করে দেখবা? তোমাদের কেনারামপুরে তো যায় না।

—না।

—হাওয়ায় চলে। ভোঁক ভোঁক। ভয় তো উকিই।

—ক্যানে?

—ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে। চাপা দেয়।

—ঘাড়ের ওপর পড়ে ক্যানে?

—ক্যানে! একটু আনমনা হলেই পড়ে। শহরের পথ সমজে চলতে হয়। আবার হোঁচট খে'লা তো? এপারেই এই, ওপারে তোমাকে লিয়ে কি যে আমি করব, ভেবে পাইনা। দেখি।

রাধারাণী লজ্জায় আঘাতটা দেখালে না। এবারে কিন্তু বেশ চোট লেগেছে। বললে, ও কিছু নয়। চল।

প্রেমদাস চেয়ে দেখলে, শহরের কাছাকাছি এসে রাধারাণীর মুখের চেহারা কেমন যেন বদলে গেছে। সেই চঞ্চল, সপ্রভিত ভাব আর নেই। ঠোঁটে সেই দৃঢ়তা, চোখে সেই আত্মপ্রত্যয়, কিছুই যেন নেই। চোখে কেমন ফ্যাল-ফ্যাল চাউনি, ঠোঁটে কেমন বোকা-বোকা শৈথিল্য। এ যেন অন্য রাধারাণী।

মাঠের পথে, অপরিচিত গ্রাম্যপরিবেশে এই মুখেরই কত বিচিত্র রূপ প্রেমদাসকে বারে বারে অভিভূত করেছে। নব নব আনন্দে তার মন নেচে উঠেছে। গেয়ে উঠেছে ঃ 'নব রে নব নিতুই নব, যখনই হেরি তখনই নব।'

পথ চলতে চলতে যখনই পিছু ফিরে চেয়েছে, নতুন আলোর ঝলকানি লেগেছে ওর চোখে। মনে হয়েছিল, রাধারাণীর এত রূপ ঘরের সংকীর্ণ সীমানায় প্রকাশের বুঝি পথ পাচ্ছিল না। বাইরে উদার আকাশের নিচে দাঁড়াতেই অতি সহজে বিনা আয়াসেই যেন নিজেকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগল।

কিন্তু এ কী! এ কোন রাধারাণী!

প্রেমদাস আবার পিছু ফিরে চাইলে। দেখলে, পিছনে ঠুং ঠুং শব্দে বিভ্রান্ত হয়ে অনেক দূরের একটা রিক্‌শাকে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে রাধারাণী পথের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে!

প্রেমদাসের রাগও হল, হাসিও পেল। সে রাধারাণীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার জন্যে তার দিকে এগিয়ে আসতেই রাধারাণী সেইখান থেকেই দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল ঃ

—গাড়ি চাপা পড়বা যে, গাড়ি চাপা পড়বা যে! সামনে মানুষে-টানা গাড়ি দেখতে পেছ না? কানা নাকি!

নিজের মূর্খতায় প্রেমদাস গাড়ি চাপা পড়তে যাচ্ছে, এই ভয়ে প্রেমদাসের উপর রাগে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

পথচারীরা রাধারাণীর চিৎকারে কেউ বা অবাক হয়ে গেল, কেউ বা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসতে লাগল।

প্রেমদাস এসে ওর একটা হাত ধরে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে চলল। বিড় বিড় করে বললে, তোমাকে শহরে এনেই বিপদ করলাম দেখছি!

ভয়ে রাধারাণীর মুখ বিবর্ণ এবং দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। প্রতিবাদে একটা কথাও বলতে পারলে না।

যে কথা বলে না, শুধু নিঃশব্দে অনুসরণ এবং অনুকরণ করে যায়, যত বোকাই হোক, তাকে নিয়ে অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে হঠাৎ এক একটা বেফাঁস কথা বলে বসে, কথা না বলে পারে না, অসুবিধা হয় তাকেই নিয়ে।

রাধারাণীকে নিয়ে প্রেমদাসের সেই হয়েছে অসুবিধা।

নৌকায় গঙ্গা পার হচ্ছে। গঙ্গার দিকে চেয়ে রাধারাণীর চোখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। প্রেমদাসের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললে, কী বড় নদী!

ফিস ফিস করে বললে, কিন্তু অনেকেই যে শুনতে পেলে তাদের মুখের কৌতুকপূর্ণ হাসি থেকেই বোঝা গেল। প্রেমদাসের সেদিকেও চোখ আছে।

অন্যমনস্কভাবে শুধু একটা হুঁ দিলে।

—আমাদের গাঁয়ের মানে অনেক বড়, নয়?

প্রেমদাস এবার আর হুঁ-ও দিলে না। অন্য দিকে চেয়ে বিরক্তভাবে বসে রইল।

একটি বৃদ্ধ গোছের লোক,—তারও বেশি কথা বলার অভ্যাস, কথা না বলে থাকতে পারে না,—বললে, নদী নয় মা, গঙ্গা।

গঙ্গা! মা গঙ্গা! প্রেমদাস তা বলছে না কেন? ওর যেন কি হয়েছে!

রাধারাণী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে খানিকটা জল নিয়ে নিজের মাথায় ছিটিয়ে দিলে, প্রেমদাসের মাথায়ও।

প্রেমদাস গোঁ হয়ে বসে রইল। ভালো-মন্দ কিছুই বললে না।

শহরের সমুদ্র-তরঙ্গে পড়ে রাধারাণী যে বোকা মেরে গেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু বুদ্ধি এবং আত্মপ্রত্যয় যে পরিমাণে কমেছে, কৌতূহল সেই পরিমাণে বেড়েছে। কোথায় কি হচ্ছে, কে কি বলছে, সব দিকে তার লক্ষ্য আছে।

পথ দিয়ে মেয়েরা চলেছে, তরুণী বধূ কিংবা কলেজের মেয়ে, রাধারাণীর লক্ষ্য পড়ে গেছে সেদিকে।

—কি সোন্দর শাড়িখানা, লয়?

—হ্যাঁ।

—কেমন করে পরে দেখেছ? আমাদের মতো করে লয়। কি রকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। লয়?

মুহূর্ত মধ্যে সব ভুল হয়ে গেল রাধারাণীর। তাদের গ্রাম, গ্রামের সমাজ, সমাজের রীতি, কিছুই আর মনে রইল না। এখানে সবই বিচিত্র, সবই স্বতন্ত্র। এ যেন অন্য জগৎ।

—কেমন করে কথা কয় শোন।

প্রেমদাসের জন্যে অপেক্ষা না করেই রাধারাণী দাঁড়িয়ে পড়ল। ক'টি মেয়ে, কোথায় যেন যাবার কথা, যাবে কি না তাই নিয়ে ওদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছে। সেই কথা। রাধারাণী তাই শুনতে লাগল।

হাঁ, হাঁ, হাঁ, হাঁ। একটা ছ্যাক্‌রা গাড়ি ওর উপর এসে পড়ে আর কি! ঘোড়ার নাকটা প্রায় ওর মাথার কাছে এসে পড়েছে। গাড়োয়ান অনেকক্ষণ থেকেই ঘণ্টা দিচ্ছিল। কিন্তু শুনবে যে, সে তো আত্মহারা হয়ে শহরের মেয়ের কথা শুনছে!

তাদেরই একজনের হঠাৎ খেয়াল পড়ে যেতেই সে খপ করে ওর হাত ধরে টেনে নিলে। না নিলে একটা কাণ্ড না ঘটে যেত না।

একটা মেয়ে ধমক দিলে : হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ, ঘোড়ার গাড়ির ঘণ্টা শুনতে পাও না ?

যখন রাধারাণী বুঝলে, মেয়েটি হাত ধরে তাকে টেনে না নিলে সে গাড়ি চাপা পড়ত, তখন তার ভয় হয়েছে।

বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বললে, শুনতে পাব না ক্যানে,

অন্য মেয়েটি ওর কথা শুনেই হেসে বললে, ছেড়ে দে। গেঁইয়া, দেখছিস না ?

প্রথম মেয়েটি বললে, ছাড়ব কি ! ও তো আবার এখুনি গাড়ি চাপা পড়বে।

রাধারাণীকে বললে, তুমি কি একলা বেরিয়েছ ? না সঙ্গে কেউ আছে ?

—একলা বেরুবে ক্যানে, ওই যে

রাধারাণীর কথা শেষ হবার আগেই প্রেমদাস হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়ল। বিরক্তভাবে বললে, আমি তোমাকে খুঁজে মরছি, আর তুমি এখানে,

একটি ছোকরা কাছেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল আর ঘটনাটা উপভোগ করছিল।

এগিয়ে এসে প্রেমদাসকে বাধা দিয়ে ব্যঙ্গ করে বললে, খুঁজে মরলে হবে ক্যানে বাবাজি, তোমার পাগড়ির সঙ্গে ওর শাড়ির খুঁট বেঁধে রাখ। নইলে আবার হারাবে। কিন্তু তাতেও ক্ষতি নেই, গাড়ি চাপা পড়বে যে !

চশমার আড়ালে ছোকরার চোখ দুটো কৌতুকে নেচে উঠল।

ওর কথা শুনে মেয়েগুলি মুখে রুমাল চাপা দিয়ে সরে পড়ল।

কিন্তু ওরা আস্তানাটা পেয়েছে ভালো।

কাছারীর সীমানার ঠিক বাইরে, রাস্তার ধারেই যে আমগাছ, তারই নিচে। এখানটায় বাজারের হট্টগোল, গাড়ি-ঘোড়া নেই। কিন্তু মামলা করতে যারা আসে, এইটেই তাদের যাওয়া-আসার পথ। সেইখানে রাস্তার উপরেই একটা গ্যাসপোস্ট। তার আলোতে রান্নার কাজ

হয়তো চলেনা, কিন্তু রাত্রে অনেকখানি নিরাপদ বোধ হয়। পাশেই একটা পান-সিগারেটের দোকান আছে। সে লোকটাও অনেক রাত্রি পর্যন্ত থাকে।

কয়েকজন ধনী লোক এবং কতকগুলি প্রতিষ্ঠান লঙ্গরখানাও খুলেছে। দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট বহু নর-নারী সেখানে দিনের বেলায় খায় এবং রাত্রের খাবারও বাটিতে করে নিয়ে আসে। তাদের রান্না-বাড়ার ঝামেলা নেই। তারপরে সমস্ত দিন এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায় এবং ভিক্ষা-সিক্ষাও করে। তাইতে হাত-খরচটাও চলে। রাস্তার দু'পাশে যে গাছের-সারি তার নিচে-নিচে এই শ্রেণীর অনেক ভিক্ষুক-পরিবার থাকে। কিন্তু তারা এতই নিম্ন শ্রেণীর,—কিংবা হয়তো গ্রাম্য-সমাজে ঠিক নিম্নশ্রেণীর নয়, এখানে এসে অভাবের তাড়নায়, লঙ্গরখানায় খেয়ে এবং ভিক্ষাবৃত্তির ফলে আচার-আচরণে নিম্নশ্রেণীতেই নেমে গেছে,—যে, তাদের সঙ্গে প্রেমদাস এবং রাধারাণী মিশতে পারেও না, চায়ও না।

এরা লঙ্গরখানায় যায় না।

এদিকটায় সকালের দিকে এবং সন্ধ্যার পর লোক-চলাচল হয়তো কিছু থাকে, কিন্তু গাড়ি-চলাচল থাকে না বললেই চলে। সত্য কথা বলতে কি, সেদিনে রাধারাণী সেই যে গাড়িচাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়, তারপর অনেক খুঁজে পেতে শুধু অন্যমনস্ক, কৌতুহলী রাধারাণীকে গাড়িচাপার হাত থেকে নিরাপদ করবার জন্যেই প্রেমদাস এই দিকটায় আস্তানা গেড়েছে।

কোর্টের ভিড় দশটার পরে।

ওরা তার আগেই দুটি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে রাস্তার দিকে মুখ করে একখানা চট পেতে বসে।

প্রেমদাসের গায়ে বহির্বাস, মাথায় পাগড়ি, বাঁ হাতে একতারা, ডান হাতে ডুবকি আর পায়ে নূপুর। কাছারীর উকিল-মোক্তার এবং মক্কেলদের আসবার মুখেই আরম্ভ হয় গান। অপূর্ব প্রেমদাসের কণ্ঠ! লোকে

দাঁড়িয়ে পড়ে তার গান শোনবার জন্যে। পয়সা-আনি-দুয়ানি, এমন কি সিকিও পড়ে মাঝে মাঝে।

প্রথম প্রথম প্রেমদাস একাই গাইত। গাছটার আড়ালে রাধারাণী হয়তো চুপ করে বসে থাকত, নয়তো পা মুড়ে গুঁড়ি মেরে ঘুমুত। হঠাৎ কি মনে হল,—হয়তো পয়সার আমদানীতে তার সাহসও বেড়ে গেল,—রাধারাণীকেও নিয়ে এসে পাশে বসালে। গাওয়ালে একখানা গান।

সরকারি উকিলের গাড়ি সেইখানে এসে থেমে গেল।

—কে গান গায়?

—একটি ভিখিরী স্ত্রীলোক।—একজন বললে।

—চমৎকার গলা তো! চেহারা দেখে মনে হয় না ভিখারী।

প্রেমদাস সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, আজ্ঞে না হুজুর। আমরা জাত বোষ্টম। ভগবানের নাম-গান করাই আমাদের বিত্তি। আমরা ভিখিরী নই।

সরকারি উকিল কি ভাবলেন তিনিই জানেন। একবার প্রেমদাসের, একবার রাধারাণীর মুখের দিকে চেয়ে একখানা একটাকার নোট ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

এই আরম্ভ হল ভিড় জমা।

কাছারীর মাঠে গাছতলায় এক বৈষ্ণব-দম্পতি এসেছে, তারা নাকি অদ্ভুত গায়, এই কথাটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল।

কাছারীর উকিল-মোক্তার-মক্কেল তো অবসর সময়ে জমেই, হাকিম-রাও যাওয়া-আসার পথে এক মিনিট গাড়ি থামিয়ে গান শুনে যান। তার উপর শহরের লোকেরা আছে। সব চেয়ে আশ্চর্য, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান এবং রিক্সাওয়ালারা পর্যন্ত এদিকে সওয়ারী নিয়ে এলে ওদের গান শুনে যেতে লাগল।

অর্থ আসে। অর্থ আসতে লাগল। কিন্তু গান চলে সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। সুতরাং বিলাস করবার মতো অর্থ আসে

না। খাওয়া পরার জন্যে একটা বৈষ্ণব-দম্পতির যে পরিমাণ প্রয়োজন, সেই রকম অর্থই আসে।

কিন্তু রাধারাণীর বিরক্তি লাগে।

এই উন্মুক্ত জীবন, যেখানে কোনো আবরণ নেই, সেখানে সে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে থাকে। মনের দলগুলি নিরিবিলি বসে মেলতে পারে না। সহস্র পুরুষের দৃষ্টি তার গায়ে যেন কাঁটার মতো বেঁধে।

এই জীবনে সে অভ্যস্ত নয়।

বৈষ্ণবীর জীবন ঠিক অন্তঃপুরিকার জীবন হয়তো নয়। তারা বাইরে বার হয়, গান গায়, ভিক্ষা করে। কিন্তু কাদের সামনে বার হয়? কোথায় গান গায়? কাদের কাছে ভিক্ষা করে?

বার হয় একটা পরিচিত এবং সমধর্মী পরিবেশের মধ্যে। তাদের আত্মীয় বললেও ভুল হয় না। মর্যাদার এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তাদের সগোত্র বলা চলতে পারে। তাদের সকলের নাম না জানলেও তাদের দৃষ্টিতে আত্মীয়তার স্পর্শ আছে। এদের দৃষ্টির মতো বেঁধে না। তারপরে সেখানে একটা ঘর ছিল। জীবন সর্বক্ষণের জন্যে এই রকম অনাবৃত ছিল না।

—উঃ! লোকটা সেই থেকে হাঁ করে চেয়ে আছে। ভিজে কাপড়টা কি করে ছাড়ি বল তো?

রাধারাণী প্রায় কেঁদে ফেললে।

প্রেমদাস একদিন বলেছিল, কিন্তু গাঁয়ে একই ঘাটে মেয়ে-পুরুষ কি চান করে না?

—করে। কিন্তু সে এ রকমের নয়! তুমি বুঝবা না।

প্রেমদাস বুঝবে না,—মেয়েদের আব্রুর কথা কি করে বুঝবে সে?—যে ওই একই ঘাটে উভয়ের মাঝখানে গ্রাম্য-পরিবেশের একটা পর্দা ঝুলছে। সেই পর্দাই মেয়েদের আব্রু রক্ষা করে।

অবশেষে বললে, দেখি কাছাকাছি কোথাও একটা ঘর পাই কি না।

উপায় নেই বলেই থাকা। নইলে তারও বিরক্ত লাগছিল। সত্যই,

শহরের লোকগুলো যেন কি রকম! প্যাঁট প্যাঁট করে চায়! লজ্জা নেই, সংকোচ নেই, একটা ভদ্রতার আবরণ পর্যন্ত নেই। ভালো-মন্দ লোক সব জায়গাতেই আছে। কিন্তু এ রকম দেখা যায় না!
আপন মনেই প্রেমদাস এই সমস্ত কথা বিড় বিড় করে বকতে লাগল।

বাস্তবিক ওরা এসেছে দিন-পোনের হল। সকল সময় এক জায়গায় পাশাপাশি রয়েছে। একই জায়গায় বসা, খাওয়া, ভিক্ষা করা, শোওয়া। কিন্তু নিতান্ত আটপৌরে প্রয়োজনের এবং অভাব-অভিযোগের কথা ছাড়া একটা কথাও হয় না। সত্য সত্যই সব সময় বিশ্বশুদ্ধ লোক যে ওদের দিকে প্যাঁট প্যাঁট করে চেয়ে আছে, তা তো নয়। কিন্তু সেই চেয়ে থাকার আবহাওয়াটা সকল সময় যেন ওদের আড়ষ্ট করে বেঁধে রেখেছে। গাড়ী চাপা পড়তে যাওয়ার সেই ব্যাপারটার পর রাধারাণী রাস্তায় বার হয় না। কিন্তু তু'বেলা খাওয়ার পর সামনের পানের দোকানে পান কিনতে তাকে একবার করে যেতে হয়। গ্রামের অনেক অভ্যাস জীর্ণ পাতার মতো একে একে ঝরে গেছে। কেবল খাওয়ার পরে পান খাওয়ার অভ্যাসটা যায় নি। বরং তার সঙ্গে একটুখানি জর্দার অভ্যাস যোগ হয়েছে।
কিন্তু তাও একদিন বন্ধ হয়ে গেল।
পানের দোকানে বেশির ভাগ সময় বসে একটি বার-তের বছরের ছেলে। আগে বাপের সাকরেদি করত। এখন তার উপর বাপ ভরসা করে দোকান ছেড়ে দিতে পারে।
ছোট ছেলে বলেই রাধারাণী নিজে যেত। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মনের মতো করে তু'টি পান তৈরি করাত। একটি নিজে খেত। একটি প্রেমদাসের জন্যে নিয়ে আসত।
যখনই যায়, দেখে একটি ছোকরাও আসে সেই সময় পান কিনতে। পানের দোকানের ছেলেটার সঙ্গে তুটো রসিকতা করে। রাধারাণীও চলে আসে, সেও চলে যায়।

রাধারাণী লোকটির মতলব হয়তো বুঝতেই পারে না। কি হয়তো বুঝতে পারলেও করবে কি? এখানে তার আছেই বা কে? কি করতেই বা পারে? সুতরাং লক্ষ্য করেও করে না। পান কেনে, পয়সা দেয়, চলে আসে।

সেদিনও সে গেছে। লোকটিও এসে দাঁড়াল, এবারে প্রায় তার গা ঘেঁসে। রাধারাণী কিছু বলে না দেখে হয়তো তার সাহস বেড়ে যাচ্ছিল। রাধারাণী সরে এল। কিছু বললে না।

কিন্তু পানের দোকানের ছেলেটা, বয়স অল্প হলেও বোধ করি পানের দোকানে বসে বসে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। বয়সের তুলনায় বোঝে বেশি।

সে আর থাকতে পারলে না। বললে, তুমি যাও মা, তোমার পান আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রাধারাণী বুঝলে। চলেও এল। কিন্তু কথাটা লোকটার মুখের উপর যেন চাবুকের মতো পড়ল। লোকটা বারুদের মতো ফেটে পড়ল: ও কথা বললি কেন? আমি কি ওকে কিছু বলেছি?

ছেলেমানুষ হলেও দোকানের ছেলেটি ভয় পেলে না।

হেসে বললে, বলবেন কেন বাবু? কিন্তু আমি ছেলেমানুষ বলে কি কিছু বুঝি না?

বাবুটি আরও রেগে গেল। বললে, কি বুঝিস তুই? বাঁদর কোথাকার!

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল: কি হয়েছে, কি হয়েছে!

ছেলেটি কিন্তু রাগেনি। তখনও হাসছে। আঙুলে করে দুটি সাজা পান বাড়িয়ে দিয়ে বললে, হয়নি কিছু। এই নিন পান।

—না। তোর দোকানে আর কোনদিন পান নোব না। যাঃ!

বলে বাবুটি হন হন করে চলে গেল।

ছেলেটি তখনও হাসছে। বলছে, আর তুমি আসবে না বাবু। সে আমিও জানি। শক্ত ওষুধ পড়ে গেছে!

—কি হল রে! কি হল রে!—কৌতূহলী জনতা থেকে প্রশ্নটা উঠল।

—হয়নি কিছু।

—বাবুটি রাগারাগি করছিল যে!

—বাবুতে অমন করে।

বলে নিজের কাজে মন দিলে।

লোকগুলো চলে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা তারা আন্দাজ করলে। এবং কথাটা প্রেমদাসের কানেও পৌঁছুল।

সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। রাধারাণীকেও না, পানের দোকানের ছোকরাটিকেও না। কিন্তু সকালের দিকে, বিকেলের দিকে ঘুরতে লাগল। খুঁজতে লাগল একটা ঘর। যেখানে রাধারাণী গান গাওয়ার সময়টা ছাড়া একটা অন্তরাল পাবে। নইলে আরও কিছুদিন এই অনাবৃত জীবনযাত্রা চলতে থাকলে রাধারাণী ওই ওদের মতো হয়ে যাবে, ওই গাছগুলোর নিচে যারা রয়েছে। রাধারাণী হারিয়ে যাবে।

অবশেষে বাসা একটা পেল।

একটু দূরে। শহরের এক প্রান্তে। তা হোক।

এদিকটায় শহরের চেয়ে গ্রামের আদলই বেশি। গোলপাতার ঘর। উঁচু দাওয়া। দেয়ালগুলো ইঁটের। রাস্তার উপরেই। বাড়ির বৃদ্ধ মালিক তাঁর ব্রাহ্মণীকে নিয়ে এইখানে থাকেন। ব্রাহ্মণ সারা রাত্রি তামাক খান, আর কাশেন। ব্রাহ্মণী বাতের যন্ত্রণায় ছট ফট করেন। পিছনে অনেকখানি জায়গা রয়েছে বাঘ-ভেরেণ্ডার বেড়া দিয়ে ঘেরা। তারই এক প্রান্তে গোয়াল-ঘর। সেখানে থাকে একটি বুড়ি গাই, খোঁড়া। আর বোধ করি তারই একটি দুহিতা, আসন্নপ্রসবা।

এতদিন ব্রাহ্মণ দম্পতি নিজেরাই এদের পরিচর্যা করে এসেছেন ; তখন বুড়ি গাইটিও পা ভাঙেনি। দুহিতাটিরও প্রসব সম্ভাবনা ছিল না : এখন তাঁদের নিজেদের গো-সেবার সামর্থ্য নেই। মাইনে দিয়ে লোক রাখবারও পয়সা নেই।

রাধারাণী এবং প্রেমদাস উভয়েই গোয়াল সংলগ্ন একটি চালায় থাকবার বিনিময়ে সানন্দে গাভী দুটির পরিচর্যার ভার নিতে সম্মত হল। বাধ্য হয়ে নয়, শহরের আওতার বাইরে গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে এমনি একটা আশ্রয়ই যেন তারা খুঁজছিল।

একপ্রান্তে কতকগুলো কলাগাছ রয়েছে। তার নিচেই একটা ডোবা। সেখানে বাসন-কোশন মাজা চলে। এপাশে কয়েকটি ওলগাছ, সাবুই ঘাসের বন। এবং আরও কি কি খানিকটা জায়গা জঙ্গল করে তুলেছে। অন্য যে কেউ এ রকম বন্য জায়গায় হয়তো পয়সা দিলেও থাকতে রাজি হত না। কিন্তু ওরা মনে মনে যেন এমনি একটুখানি জায়গারই খোঁজ করছিল।

চালাটা বাসোপযোগী করে নিতে দিন দুই গেল। সে-পয়সাটা প্রেমদাস-কেই দিতে হল। তারপরে একদিন ওরা এসে উপস্থিত হল। এবং ঘরে ঝুলি-ঝাম্পা নাবিয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল, সে একটা দৃশ্য। সেই হাসি যেন বললে, বাঁচলাম, বাঁচলাম, এতদিনে বাঁচলাম।

এতক্ষণে তাদের মনে হল, এই যে মাসাধিক কাল ওরা শহরে এসেছে, এর মধ্যে একদিনও ওরা পরস্পরের দিকে চায়নি, হাসেনি, কথাও বলেনি। শুধু কোনোমতে সহ-অস্তিত্ব বজায় রেখে গেছে। অথচ পরস্পরের দিকে চেয়েছে, হেসেছে, কথাও বলেছে। না বলে মানুষ থাকতেও পারে না। কিন্তু সে কিছুই নয়। অন্তরাল না পেলে মন কখনও দল মেলতে পারে না। শীতের সাপ যেমন মাটির নিচে লুকিয়ে থেকে বসন্তের প্রতীক্ষা করে, মানুষের মনও তেমনি আড়াল না পেলে মনের গভীরে লুকিয়ে পড়ে।

মেঝের দিকে চেয়ে রাধারাণী বললে, একটা তক্তাপোষ না হলে শোয়া যাবে না। মেঝেয় জল উঠছে।

—এদের বাড়িতে পাওয়া যাবে না ?

—দেখ না।

ভাঙা মতো তক্তাপোষ পাওয়া গেল একটা। কিন্তু একটা পা নড়বড় করছে।

প্রেমদাস বললে, তুমি ওই দিকে একটা উনুন তৈরি করে রান্নার যোগাড় কর। আমি একটা মিস্ত্রি দেখি। আজ আর আমতলায় যাব না। কি বল ?

—হ্যাঁ।

বাসা বাঁধতে গেলে টুকিটাকি কম জিনিসটা লাগে না। হাঁড়ি-কড়াই শিল-নোড়া, কৌটা-বাটা, কত যে জিনিস তার আর শেষ নেই।

রাধারাণী কাছে এসে হাসতে লাগল।

—কি হল ?

—মসলা তো এনেছ। বাঁটা হয় কিসে ?

—এতদিনে কিসে হত ?

—আহা! এতদিন তো গুঁড়ো মসলা আনা হত।

তাই বটে।

প্রেমদাস বললে, ওবেলা শিল-নোড়া আনব। এবেলার মতো দেখ না, ঠাকুর মশাইদের শিলনোড়ায় যদি হয়।

খাওয়া-দাওয়ার পরে প্রেমদাস আর বিশ্রাম পেলে না। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে যে ক'টা টাকা জমিয়েছিল সেগুলোর সৎকার করে নানা জিনিস নিয়ে এল। তাই কি সব আনা হল ? থেকে থেকে একটা জিনিস মনে পড়বে, আর প্রেমদাসকে ছুটতে হবে।

রাত্রে খেয়ে দেয়ে শুয়েছে। তক্তাপোষ মেরামত-করা, তার উপর কাঁথাটি পাতা। প্রেমদাস লাফিয়ে উঠল :

—কী ভয়ংকর !

রাধারাণীও উঠে বসল ঃ এ মশায় তো ঘুমোন যাবে না।

ওপাড়ায় আমতলাতেও মশা ছিল। কিন্তু হাওয়া থাকায় বসতে পেত না। তাও এত মশা নয়। এখানে এই এঁদো জায়গায় মশাগুলো আয়তনে যেমন বড়, সংখ্যায় তেমনি বিপুল এবং ডাকও তেমনি।

প্রেমদাস বললে, ডাক শুনেছ? যেন মেঘ ডাকছে!

রাধারাণী হাসতে লাগল ঃ টাকা আছে তো? কাল একটা মশারি কিনে তবে অন্য কাজ।

—কিন্তু আজকে?

—আজ আর ঘুমুবার আশা নাই।

প্রেমদাস বললে ঃ

বৈকালে ওই দিকে একটা সাপের খোলস দেখে সুধোলাম, ঠাকুরমশাই, সাপ আছেন নাকি?

ঠাকুরমশাই বললেন, আছেই তো। পোড়ো বাড়ি, সাপ থাকবে না?

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। বললাম, তবেই তো।

ঠাকুরমশাই বললেন, তবেই তো কি! সাপে ভয় নয় হে! মানুষের সাড়া পেলে সাপ থাকে না, পালিয়ে যায়! ভয় মশাকে। বুঝলে?

রাধারাণীর দিকে চেয়ে প্রেমদাস বললে, তখন বিশ্বেস করি নাই। এখন দেখছি, ঠাকুরমশাই সত্যি বলেছিলেন। এ মশা সাপের চেয়েও ভয়ংকর।

দুজনের কেউই চোখের পাতাটি বুঁজতে পারলে না। সারারাত জেগে, হেসে, গল্প করে আর গান গেয়ে কাটালে।

সব সময় নিজের চারিদিকে একটা উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডল রচনা করে ঠাকুর মশাই থাকেন। তাঁর কাজ কিছু নেই। বয়স যাট পার হয়ে গেছে। সুতরাং কাজ করার বয়স নেই। প্রয়োজনও নেই। দশ-বিশ ঘর শিষ্যসেবক আছে। তারা যে প্রণামী বৎসর বৎসর পাঠায়, বুড়ো-বুড়ির চলে যায়। একটা নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ-দম্পতির আর কত লাগে!

সুতরাং ঠাকুর মশাই চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতেই থাকেন এবং গৃহিণীর সঙ্গে খিটিমিটি করেন। সে যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে যখন বাইরের দাওয়ায় এসে বসেন, তখন খিটিমিটি বাধে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে। এবিষয়ে তাঁর কোনো বয়সের বাছ-বিচার দেখা যায় না। পাঁচ থেকে পোনেরো যে কোনো বয়সের ছেলেই তাঁর যোগ্য প্রতিপক্ষ।

ব্যাপার দেখে প্রেমদাস কিংবা রাধারাণী কেউই সহজে ওঁদের কাছে ভেড়ে না। নিজের নিজের কাজ করে এবং দূরে দূরে থাকে। ঠাকুরমশাই প্রেমদাসকে দেখলেই জ্বলে যান, ঠাকরুণও রাধারাণীকে দেখলে। সুতরাং না ডাকলে ওরা কেউই ওদিক মাড়ায় না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা রাধারাণী হাসতে হাসতে এসে দাঁড়াল।

প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে?

রাধারাণী টিপে টিপে হাসতে হাসতে বললে, ঠাকুর মশাইদের সম্বন্ধে তুমি যা ভাব, তা লয়।

—কি ভাবি? কি লয়?

—দিনরাত ঝগড়াঝাঁটি করে বটে, কিন্তু দু'জনে খুব ভাব।

—কি রকম?

—দু'জনে এখুনি সিনেমা গেল।

—বল কি! —উৎসাহে প্রেমদাস উঠে বসল,—তুমি নিজে দেখলা?

—রিক্শা করে গেল, কত ঢাকাঢুকি দিয়ে।—চোখ টিপে, একটা ঢোঁক গিলে রাধারাণী বললে,—আমি কি জানি, কোথা গেল? কে সুধোবে বাবা, যা ফণি-মনসা! ওদিকের গলিতে বিমলি দাঁড়িয়ে ছিল, সেই বললে।

—কি বললে?

—বললে, সিনেমায় গেল। সপ্তাহে একবার করে সিনেমায় যাওয়া চাইই। নতুন বই এলে দেখবেই। জাননা?

না। জানা দূরের কথা, ভাবতেই পারেনা। ওরা দুজনে কলহ

করছে, গালাগলি করছে এই দেখতেই এরা অভ্যস্ত। গলাগলি করে সিনেমায় যাচ্ছে, তা এদের কল্পনারও অতীত।

প্রেমদাস হেসে বললে, রস আছে!

রাধারাণী বললে, আরও একটা মজার কাণ্ড দেখিছি একদিন।

রাধারাণী টিপে টিপে হাসতে লাগল।

—কি কাণ্ড আবার দেখলে?

রাধারাণী বলতে লাগল: ওল-সেদ্ধ করে ভাবলাম, একটা কাঁচা লঙ্কা যদি ঠাকরুণের কাছে পাওয়া যায়। গিয়ে দেখি দরজা ভেজান। কিন্তু ফাঁক দিয়ে আলা বাজছে। কথার আওয়াজও পাওয়া যায়। চুপি চুপি উঠে উঁকি দিয়ে দেখি,

প্রেমদাসের চোখ যেন আগ্রহে বেরিয়ে আসছে। রাধারাণীকে থামতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, কি দেখলা?

—দেখি, একপাতে বসে দু'জনে খেছে আর গল্প করছে!

হাসির চোটে রাধারাণী যেন লুটিয়ে পড়ল।

প্রেমদাস অবাক।

বললে, একটা কথা তোমাকে বলি নাই।

—কি কথা?

—ঠাকরুণ একদিন আমাকে ডাকলেন। গেলাম। দুটি টাকা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে ভাই।

কি কাজ?

পুষ্পরাজ তেল একশিশি এনে দিতে হবে।

আমি তো অবাক। চুলে পাক ধরেছে, তাও বাস-তেল চাই!

লজ্জায় ঠাকরুণ কি রকম করতে লাগলেন। বললেন, গন্ধ তেল নইলে মাথায় দিতে পারি না। মাথা কি রকম ঝিম ঝিম করে।

প্রেমদাস হাসতে লাগল। বললে, আর একটি কথা বলি। ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে কথা-টথা বেশি বোলো না।

লজ্জিত হাস্যে রাধারাণী বললে, তুমি কি করে জানলা ?

—একদিন ঠাকরুণ এই লিয়ে ঠাকুর মশায়ইকে খুব ঝুরছিলেন যে! শুনিছি কিনা।

রাধারাণী বললে, হ্যাঁ। ঠাকরুণ আমাকেও ডেকে একদিন চুপি চুপি বলেছেন।

—কি বললেন ?

—বললেন, ও বিট্‌লে কম ড্যাঁকরা নাকি! তুমি তো জাননা। আমি ওর সব জানি।

রাধারাণী হাসতে লাগল। তিনকুড়ি, সাড়ে তিন কুড়ি বছরের বুড়োর আবার সব জানবার কি আছে কে জানে!

প্রেমদাস বললে, বুড়ো মানুষদের রকম আলাদা। ছোট মোড়ল আর বড় গিন্নিকে মনে নাই ? ভালো কথা, কাল মহাদেবকে দেখলাম যেন।

—কোথা গো ?

—লতুন বাজারে। মনে হল মহাদেব। আমাকে দেখেছে কি না বোঝা গেল না। কিন্তু কাছে যাবার আগেই একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। অন্ধকারে ঠিক চেনা গেল না।

—এখানে কি করতে এল ?

—কি করে জানব ? পাগল তো! দেশে দেশে ঘোরে। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে আর কি!

রাধারাণী আবার জিজ্ঞাসা করলে, তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ তো ?

—তা বলতে পারি না।—প্রেমদাস বললে,—মনে হল সে-ই। এতটা কি ভুল দেখব ?

কে জানে কি করতে এসেছে। রাধারাণীর সেই কথাটা মনে পড়ল: অনেক ব্যামো ঢুকেছে ভেতরে। সে আর সারবার লয়।

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, হা গো, ও সব ব্যামো কি সারে না ?

প্রেমদাসের সে বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। একটুখানি হিসাব

করে বিজ্ঞের মতো বললে, ব্যামো আবার সারবে না ক্যানে? তবে ডাক্তার আছে কি করতে? ভালো করে চিকিচ্ছে করালেই সারবে।

মিনতির সঙ্গে রাধারাণী বললে, তা হলে একটু খবর লাও না মহাদেবের। একটু ভালো করে চিকিচ্ছে করাও না ওর। এলোকেশীর জন্যে বড় কষ্ট হয়।

প্রেমদাস হেসে ফেললে: এ কি কেনারামপুর পেয়েছ? খুঁজব কোথা? শহর কি একটুখানি? তবে যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়।

কথাটা রাধারাণী যেন লুফে নিলে। বললে, সেই কথাই বলছি। একটু তক্কে তক্কে থেক। হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যায় ধরে লিয়ে আসবা।

—তা কি আর বলতে!—প্রেমদাস উঠতে উঠতে বললে—তেলের জায়গাটা দাও দিকি। তেলটা এনে দিই।

রবিবার কাছারী বন্ধ থাকে। ওপাড়া দিয়ে সেদিন লোক-যাতায়াতও কম থাকে। সুতরাং বিশেষ ভিক্ষা পাওয়া যায় না। সেজন্যে রবিবার ওরা আর বেরোয় না। দুপুরবেলা প্রেমদাস তক্তাপোষে শুয়ে ঘুমোতে লাগল। আর রাধারাণী বিমলাদের বাড়ি যাচ্ছে বলে বেরুল। ফিরে এসে দেখে প্রেমদাস উঠে বসে তামাক খাচ্ছে।

—একটু চা খাবা?—রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে।

—কোথা পাব?

—আছে। খাও যদি করি।

কি জবাব দেবে ঠিক করতে না পেরে প্রেমদাস নিরুত্তর রইল।

রাধারাণী বলতে লাগল: বিমলাদের বাড়ির পাশেই একটা দোতলা বাড়ি আছে না? ওই বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। ইস্কুলে পড়ে। বেশ গান গায়।

—তারপরে?

রাধারাণী হাসতে হাসতে বললে, বিমলিদের বাড়িতে আমাকে দেখে

জোর করে ধরে নিয়ে গেল তাদের বাড়ি। বেশ মেয়ে! দেমাক অংখার কিছু নাই। দু'খানা গান শুনলে। চা খাওয়ালে।

প্রেমদাস নিঃশব্দে তার কথা শুনে যায়। কৌতুকে তার চোখ দুটো হাসছে। রাধারাণী কিছুতে তার চোখের দিকে চাইতে পারে না। চোখ নামিয়ে বলতে লাগল: আমি কিছুতে খাব না। বললাম, আমরা পাড়া-গাঁয়ের লোক, চা খাই না। কি বললে জান?

—কি?

—বললে, গাইয়েদের চা খাওয়া ভালো। গান গাওয়ার পরে একটু গরম চা খেলে গলা ভালো থাকে।

প্রেমদাস হেসে ফেললে। বললে, তাই বুঝি আমার গলা ভালো করবার জন্যে বাজার থেকে চা কিনে আনলা?

ঠোঁট উল্‌টে রাধারাণী বললে, হ্যাঁ কিনে! তাহলে কবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতা। একটু দিলে তাই নিয়ে এলাম। করে দোব একটু?

—দাও। কখনো তো খাই নাই। জীবনটা সার্থক করে লিই।

চা তৈরির কোনো সরঞ্জামই নেই। কিন্তু আটকালো না। কতকগুলো শুকনো কাঠমুঠ সংগ্রহ করে উনান ধরান হল। জল গরম হল একটা মাটির ভাঁড়ে। প্রেমদাসকে উঠতে হল একটু দুধ আর চিনি কিনে আনতে। এনামেলের কলাই করা গেলাসে করে চা খাওয়া হল।

গেলাসটা নামিয়ে রেখে প্রেমদাস বললে, ছাই! এই আবার পয়সা খরচ করে খায়! তার চেয়ে গুড়ের সরবৎ ঢের ভালো!

রাধারাণী বললে, তুমি একটা আস্ত চাষা! তোমার কি চা ভালো লাগে? তোমার জন্য নিত্যি গুড়ের সরবৎ করে দোব খেও।

প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে, আর তুমি?

—আমি শহুরে লোক। চা খাব।

চোখ বেঁকিয়ে রাধারাণী ওর দিকে চেয়েই গেলাস দুটো ধুতে গেল। ফিরে এসে বললে, তোমার পয়সায় খাব না গো, ভয় নাই।

—তবে?

—সকালে-সন্ধ্যে অঞ্জলিদের বাড়ি থেকে খেয়ে আসব।

প্রেমদাস বললে, দেখ আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। জাত-বোষ্টম পেটের দায়ে এসেছি শহরে। মা লক্ষ্মী যদি আবার মুখ তুলে চান, ফিরে যাব সেই কেনারামপুরের আখড়ায়। যাবার সময় যদি শহুরে অভ্যেসগুলো সঙ্গে নিয়ে যাই, গাঁয়ের লোকে গায়ে ধুলো দেবে।

রাধারাণী হঠাৎ বললে, আর আমরা সেখানে যাব না। কি আছে আমাদের সেখানে? একটা ভাঙা কুঁড়ে? তার জন্যে যেতে লারি।

প্রেমদাস অবাক হয়ে গেল। বললে, বল কি গো! খালি কুঁড়ে আছে একখানা? আর কিছু নাই?

—আর কি আছে বল? দু'বিঘে জমি আছে? না একটা পুকুর আছে?

প্রেমদাস অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।

সেই বিস্মিত দৃষ্টি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রাধারাণী বলতে লাগল: এক বেলা আমতলায় বসে গান গাই, এক টাকা, দেড় টাকা, দু'টাকা পর্যন্ত ভিক্ষে পড়ে। পড়বে কেনারামপুরে? কি সুখ আছে সেখানে?

প্রেমদাস তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারলে না।

একটু পরে বললে, কিন্তু সেখানে এই প্রেমদাস যেখানে যাবে বসবার জন্যে একখানা চাটাই পাবে। পথে বেরুলেই হাজার লোকে সুধোবে, বাবাজি, যাও কোথা? এখানে সুধোবে কেউ?

—ক্যানে সুধোবে না? এই তো অঞ্জলিদের বাড়ি গেলাম, চা খাওয়ালে, কত কথা সুধোলে! আমরা তো আর আক্কোট চাষা লই। গান যখন একটু গাইতে পারি, ক্যানে সুধোবে না?

—তোমার সোন্দর মুখ, তাই সুধোয়। আমার তো তা লয়।

রাধারাণী হেসে ফেললে বললে, তোমার মুখও তো ফ্যাল্না লয়। কাল নাপিত ডেকে দাড়ি কামিয়ে দোব, দেখবে কত সোন্দর লাগবে। একখানা ভালো ধুতি কেন না গো, তোমার জন্যে?

—ক্যানে, বহির্বাস কি দোষ করলে? ভালো ধুতি পরিছি কখনও?

তারপর হাসতে হাসতে বললে, ধুতিতে তো পয়সা আনবে না, পয়সা আনছে বহির্বাসে।

—তা ক্যানে? বহির্বাস তো ছাড়তে বলছি না। ভিক্ষেয় বেরুবে বহির্বাস পরে। তারপরে ফিরে এসে, সাবান মেখে চানটি করে, একখানা ফর্সা ধুতি আর কামিজ পরে বেরুলে লাগবে কেমন?

—ছাই লাগবে! যার যা সাজ!

—ওই তো তোমার দোষ! কথা শোন না।

—কথা আবার শুনব কি? বড়লোকের মেয়েদের সঙ্গে মিশে তোমার লজর খারাপ হয়েছে। আমি বড় লোকের সঙ্গে মিশিও না, তার কথাও না।

প্রসঙ্গটা এইখানেই শেষ হত। কিন্তু রাধারাণী ছাড়লে না। গজগজ করে বললে, শহরে থাকতে গেলে শহরের মতই থাকতে হয়।

—তুমি থাক গা যাও। আমার অত শখ নাই।

রাধারাণী পট্ করে বললে, আমিই বা থাকব কি করে? আমাকেই কি কাপড় জামা কিনে দিয়েছ? নিজেও শখ করবা না, আমাকেও করতে দেবা না।

শেষের দিকে রাধারাণীর কণ্ঠে ক্রোধের সুরই ফুটে উঠল।

প্রেমদাস হেসে ফেললে, তুমি কর ক্যানে। আমি কি মানা করিছি? সাবান মাখ, পাউডার মাখ, রঙিন শাড়ি কেন,—যা খুশি কর।

—করব তো তাই।

রাধারাণী রেগে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

সংসারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরই জয় হয়। প্রেমদাসের ছোট সংসারেও সেই সত্যটা আর একবার প্রমাণিত হল।

দু'দিন ধরে প্রেমদাস রাধারাণীর মেজাজের দিশে পেলে না। দু'দিন তার সঙ্গে রাধারাণী ভিক্ষাতেও বেরুল না। প্রেমদাস হার মানলে। হাসতে হাসতে বললে, অত রাগটা কিসের?

—রাগ আবার কিসের? আমি দাসী-বাঁদী। রাঁধব, বাসন মাজব, জল তুলব, কাপড় কাচব,—আমার আবার রাগ কি?

প্রেমদাস একটু চুপ করে থেকে বললে, শরীরটা কি রকম ম্যাচ ম্যাচ করছে। চা আছে?

—না।

—তাহলে জল চড়াও। আমি কিনে লিয়ে আসছি।

—না। আমি চা করতে পারব না।

—চা করতেও পারবা না?

—না। তোমার ধম্ম লষ্ট হবে।

—আচ্ছা, জল তো চড়াও। ধম্ম কি লষ্ট হয় দেখছি।

বলে প্রেমদাস বেরিয়ে চলে গেল।

রাধারাণী মনে মনে হেসে চায়ের জল চড়ালে। প্রেমদাস ফিরে এলে এক গেলাস চা তৈরি করে প্রেমদাসকে দিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল।

বিস্মিতভাবে প্রেমদাস বললে, তুমি খাবা না?

—না।

—ক্যানে? রাগে?

—না। ধম্ম লষ্ট হবে।

প্রেমদাস হাসতে হাসতে বললে, সে ভয় তোমার নাই। অঞ্জলিদের বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছ নিচ্চয়।

—তবে তাই।

রাধারাণীর হাসি আসছে। কিন্তু প্রাণপণে সম্বরণ করে রয়েছে।

প্রেমদাস আর একটা গেলাসে নিজের থেকে খানিকটা চা ঢেলে ওর সামনে এগিয়ে দিলে। বললে, গোটা দুই কাপ কিনতে হবে। এতে খেয়ে সুখ হয় না।

এবারে রাধারাণী হেসে ফেললে। বললে, মুরোদ কত?

প্রেমদাস বললে, কিন্তু শাড়ি ধুতি কিনতে পাওয়া যায় না। কণ্ট্রোল আছে যে। টিকিট চাই, তার অনেক বখেরা।

—লোক তবে কিনছে কি করে ?

—কি জানি।

—তুমি হলে চাষা লোক, এই শহরে তুমি তাল করতে পারলে আর ভাবনা ছিল কি! ইচ্ছে থাকলে, আমাকে টাকা দিও। আমি কিনে দোব।

—তুমি তো আমার চেয়ে পণ্ডিত! তুমি কি করে কিনবা ?

মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে রাধারাণী বললে, সে খবরে তোমার কি কাজ! আমার লোক আছে কেনবার।

মুচকি হেসে প্রেমদাস বললে, লোকও জুটে গিয়েছে এর মধ্যে ?

রাধারাণীও মুখ ঝামটা দিয়ে বললে, তা জুটবে না? তোমার মতো একটা আক্কোট দিয়েই আমার সব কাজ চলবে? দাও, টাকা দাও, আমি এখুনি কাপড় আনতে দোব।

—টাকা কোথা থাকে তুমি জান না? লিলেই তো পার।

—তা লোব ক্যানে? তাহলে তো কবে আনা করাতাম!

প্রেমদাস টাকা বের করে দিলে। রাধারাণী তখনই ছুটল অঞ্জলিদের বাড়ি। ফিরে এসে বললে, কাল পাবা কাপড়। তোমার জন্যে একখানা ভালো ধুতি আর আমার জন্যে বনবালা শাড়ি।

—সে আবার কি রকম?

—এলে দেখবা।

প্রেমদাস আপনমনেই বললে. লে বাবাঃ! বনবালা শাড়ি!

রাধারাণী ঝঙ্কার দিয়ে বললে, বনবালা কে জান?

—কারও নাম নাকি ?

—হ্যাঁ। তাও জান না? সিনেমায় নেমেছে। খুব নাম-ডাক। তাই তার নামে শাড়ি বেরিয়েছে

—তার নামে শাড়ি!

—হ্যাঁ।

রাধারাণী হঠাৎ প্রেমদাসের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। বললে, কাল যদি কাপড় দিয়ে যায়, পরশু-তরশু দু'জনে সিনেমায় যাব। বেশ?
প্রেমদাস ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে শুধু বললে, বেশ।

সাত

সন্ধ্যার পরেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। নিতান্ত মন্দ বৃষ্টি হয়নি। অনেক দিনের পর বৃষ্টি, মানুষ যেন বাঁচল! ঠাণ্ডা হাওয়ায় গুমোট অনেকটা কমেছে।

সিনেমা হল থেকে প্রেমদাস আর রাধারাণী যখন বেরিয়ে এল, রাস্তায় এখানে-ওখানে তখন অল্প-অল্প জল জমে রয়েছে। গাছের পাতা থেকে তখনও থেকে-থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে। আর গ্যাসের আলোগুলোর কাচে বিন্দু বিন্দু জল জমে থাকায় যেন একটা ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয়েছে।

রাধারাণী যেন কী রকম হয়ে গেছে। ছবির পর ছবি, দৃশ্যের পর দৃশ্য, কথা, গান, সুর-বিচিত্রা, সমস্ত মিলে তার বাহ্যজ্ঞান যেন লোপ করে দিয়েছে। হলের বাইরে এসে যখন দাঁড়াল, রাধারাণী তখন বুঝতেই পারছে না, সে কোথায় গিয়েছিল এবং কোথায়ই বা রয়েছে। বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে সে সিনেমা-ভাঙার বিচিত্র ভিড় দেখতে লাগল। কোনদিকে তাকে যেতে হবে কিছুই ঠাওর করতে পারছে না। এমনি অবস্থা!

প্রেমদাস রাস্তায় একটা পা দিয়েই বলে উঠল: ইস্! বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় জল জমেছে দেখছ!

হলের মধ্যে বসে বৃষ্টি সে টের পায় নি। কিন্তু সম্প্রতি যে চিন্তা, সেটা রাস্তার জলের জন্যে নয়, নতুন স্যাণ্ডালটার জন্যে। আজ দুপুরেই তার জন্যে একটা শার্ট আর স্যাণ্ডাল এবং রাধারাণীর জন্যে চমৎকার

একটা ব্লাউজ আর স্যাণ্ডাল কেনা হয়েছে। কাদা-জলে সেই স্যাণ্ডালটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এই চিন্তাতেই সে কাতর হয়ে পড়ল। তারপরে দ্বিধামাত্র না করে স্যাণ্ডাল-জোড়া খুলে বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে রাধারাণীকে আকর্ষণ করে বলল, চল। দাঁড়িয়ে ক্যানে ?

রাধারাণী নিঃশব্দে ওর পাশে-পাশে চলতে লাগল।

একটু দূর গিয়ে প্রেমদাস উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ। গান গাইতে শিখেছিল বটে ওই মেয়েটা। কি নাম বললে, বনবালা না কি ?

রাধারাণী সাড়া দিলে না। কথা-হাসি-গানে তার মন কানায়-কানায় ভরে রয়েছে। অন্য কথা ওর কানে পৌঁছুচ্ছে না। পৌঁছুলেও সাড়া দেবার সামর্থ্য নেই ওর।

শুধু নিঃশব্দে ওর পাশে পাশে চলে।

হঠাৎ প্রেমদাস একটা চিৎকার করে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে কাকে যেন জড়িয়ে ধরলে।

—কি ব্যাপার ! এখানে যে ! কবে এ'লা।

তার চিৎকারে এবং লাফ দেওয়ায় শুধু রাধারাণী নয়, কয়েকজন পথচারীও চমকে উঠেছিল। তারপর যখন দেখলে ধৃত লোকটি চোরও নয়, পকেটমারও নয়,—মহাদেব, তখন রাধারাণী ধীরে ধীরে প্রেমদাসের পাশে এসে দাঁড়াল।

আকস্মিক আক্রমণে মহাদেব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। কি বলবে ভেবে না পেয়ে শুধু বললে, এই যে ! কি খপর ?

—আমাদের আর খপর কি ! সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। তোমার খপর বল। এ'লা কবে ? আছ কোথায় ?—প্রেমদাস চিৎকার করে কথা বলে।

মহাদেব মিন মিন করে কি যেন বললে। কিংবা হয়তো কিছুই বললে না। বলার কিছু ছিল না। একটা অব্যক্ত শব্দ করলে মাত্র। এবং সুসজ্জিতা রাধারাণীর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

বললে, তোমার বোষ্টুমী, লয় ?
প্রেমদাস হেসে বললে, ক্যানে, চিনতে পারছ না ?
—না পারারই কথা। রং খানিবটা চিকন হয়েছে। তার ওপর রাধারাণীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে মহাদেব হাসলে। অনেকটা সহজ হাসি। আক্রমণের হতচকিত ভাবটা কেটেছে।
বেশ বাস এবং মূর্তি দেখে প্রেমদাস বুঝলে, মহাদেবের অবস্থা পূর্ববৎ। কোথাও এসে ওঠেনি, ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে।
বললে, তোমাকে আর একদিনও যেন দেখেছিলাম। ধরতে পারি নাই।
—কবে ? কোথায় ?
—দিন দশেক হল। লতুন বাজারের কাছে।
মহাদেবের মনে নেই। বলল, তা হবে।
স্বভাবত প্রেমদাস কথা কম বলে এবং যা ও বলে তা মৃদুকণ্ঠেই বলে। কিন্তু বহুকাল পরে দেশের একজন লোক পেয়ে তার চিত্তের স্থৈর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির জন্যেই হোক, আর একটুখানি রাত্রির জন্যেই হোক, পথে লোক চলাচল কম। কিন্তু প্রেমদাস কথা বলতে এত চিৎকার করছে যে, তারাও চমকে পিছু ফিরে দেখছে, কে চেঁচায়।
রাধারাণী অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।
বললে, রাস্তায় অত চেঁচিও না। চল, চলতে চলতে কথা হবে।
আনন্দের আতিশয্যে এই কথাটাই প্রেমদাসের খেয়াল হচ্ছিল না।
বললে, ঠিক বলেছ ! চল।
বলে মহাদেবকে টানতে লাগল।
বিব্রত মহাদেব বললে, কোথা যাব ?
—আমাদের ওখানে। চল।
—তোমরা কোথা আছ বটে ?
প্রেমদাস জায়গাটা কোথায় বুঝিয়ে দিলে। বললে, দূরে লয়, কাছেই।

মহাদেব ইতস্তত করতে লাগল। হয়তো অন্য কোথাও তার প্রয়োজন ছিল। কিংবা প্রেমদাসের বাসায় যেতে আপত্তি ছিল। কিন্তু প্রেমদাস যে-রকম দৃঢ় মুঠিতে ওর একখানা হাত ধরে ছিল, সে মুঠি আলগা করার শক্তি ওর নেই।

সকাতরে বললে, কাল গেলে হবে না? কাল সকালে?

প্রেমদাস মুঠি আলগা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু রাধারাণী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, না। এখুনি চলুন। রাতটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানর চেয়ে ঘরের ভেতর তক্তাপোষে শুয়ে থাকা ভালো।

— তাই চল।—বলেই মহাদেব তখুনি বললে,—চার পয়সার বিড়ি কেন ক্যানে। আমার তো রেতে ঘুম হয় না। সারা রাত বিড়ি খেতে হয়।

—তা হছে, তার জন্যে ভাবনা কি! চল তো। সব হবে।

বলে একটা বিড়ি ওকে দিয়ে, একটা বিড়ি নিজে ধরিয়ে ওকে টানতে টানতে নিয়ে চলল,—কাঁচ পোকা যেমন করে আরশুলাকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি করে।

প্রেমদাসের এত স্ফূর্তি শহরে আসার পরে রাধারাণী একদিনও দেখেনি। মহাদেবকে দেখে যেন তার পিঠে দুটো পাখা গজিয়েছে! কি বলবে, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। আর হাঁটছে, যেন পা মাটিতে ঠেকছে না।

বাড়ি ফিরে প্রেমদাস বললে, এই কুঁড়েয় আমরা থাকি। বসে, আগে জিরোও। তারপর কাছেই ডোবা, হাত মুখ ধুয়ে এসে···মহাদেব, একটু চা খাবে?

—চা?—এতক্ষণ পরে মহাদেব এই কথা বললে।

—হ্যাঁ। আমাদের তো আজকাল চা লইলে একটি বেলা চলে না। ভাত মুড়ির বাড়া। শহরে এই একটি মজা। এক হাতে তোমাকে পয়সা দেবে, আর এক হাতে শুষে লেবে! মনের আনন্দে দু'পয়সা যে জমাবা, তার যো'টি নাই। একটু চা চড়াও গো মহাদেবের জন্যে।

রাধারাণী বাইরে থেকে ইসারা করে প্রেমদাসকে ডাকলে।
ধমক দিয়ে বললে, হাঁক-ডাক না করে মানুষটা কি খাবে সুধোও। হয় তো সারা দিন বেচারার খাওয়াই হয় নাই। আমাদের হেঁসেলে খাবে কি? না খেলে দোকান থেকে খাবার আনতে হবে।

মনে হল সত্যই মহাদেবের সারাদিন খাওয়া হয়নি। ভাতের নামে সে একেবারে লাফিয়ে উঠল। বুভুক্ষিত হেঁসেল বাছে না।

রাধারাণী দু'জনকে ভাত বেড়ে দিলে। মহাদেব ভাত দেওয়া মাত্র গোগ্রাসে খেতে লাগল। দু'জনের ভাত রান্না হয়েছিল। দেড় জনের ভাত খেয়ে মহাদেব একটা পরিতৃপ্তির উদ্গার তুললে।

প্রেমদাস ব্যাপার দেখে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। সে বুঝেছিল, হাঁড়িতে যা আছে, যা থাকবার কথা, তাতে দু'জনের উদরপূর্তি অসম্ভব। এবং একজনকে অর্ধাশনে যখন থাকতেই হবে, তখন অতিথির চেয়ে তারই অর্ধাশনে থাকা বাঞ্ছনীয়। রাধারাণীর কথা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

মহাদেবের উদ্গারের শব্দে পুলকিত কণ্ঠে প্রেমদাস বললে, জিতা রহো! আর দুটি ভাত দিক। একখানা ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে 'হরে কৃষ্ণ' বলে হয়ে যাক!

—না। আর চলবে না।

—ঠিক তো!

—হ্যাঁ।

দু'জনে ঘাট থেকে আঁচিয়ে এল। মহাদেব ঘরে গিয়ে বসতেই প্রেমদাস চুপি চুপি রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করলে, কি আনব, মুড়ি না চিঁড়ে?

রাধারাণী হেসে ফেললে, তোমার জন্যে?

প্রেমদাস হেসে বললে, আমার তো একরকম হয়েছে গো! রাতটা চলে যাবে। তোমার জন্যেই বলছি।

—আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

—তার মানে ?

—তার মানে, যা আছে তাতেই হয়ে যাবে। যাও, মহাদেব চেঁচাচ্ছে বিড়ির জন্যে।

প্রেমদাস এসে বললে, বিড়ি খাবা, না তামাক ? তোমার আবার ছোট তামাক চলে। তা কিন্তু নাই।

ছোট তামাকের নামে মহাদেব যেন লজ্জাই পেলে, বললে, যা হয় দাও।

তামাক সেজে কলকেটা ওর হাতে তুলে দিয়ে প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে, এর মধ্যে গাঁয়ে গিয়েছিলা নাকি ?

—গিয়েছিলাম।

—গাঁয়ের খবর ভালো ?

—ভালো আর কি, ধান তো নাই। লোকের খুবই কষ্ট। তোমরা তো বেশ আছ দেখছি।

—তা কৃষ্ণের ইচ্ছেয় নিতান্ত মন্দ লয়।

—মন্দ লয় কি, ভালোই বল। তোমার বোষ্টুমীর তো চেহারা ফিরে গিয়েছে। ভাবটা অনেকখানি শহুরে মেয়ের মতো হয়েছে।

—তা বলতে পার।

বাইরে থেকে ধমক এল ঃ পরের বউয়ের কেচ্ছা না করে নিজের বউ-এর খপর বলুন। এলোকেশী কেমন আছে ?

খানিকটা আমতা আমতা করে মহাদেব বললে, আছে এক রকম।

—ঘর সংসার করার ইচ্ছে নাই ?

বিরক্ত ভাবে মহাদেব বললে, আবার ওসব কথা তুলছ ক্যানে ?

—ক্যানে, এসব কি খারাপ কথা ?

—হ্যাঁ।

—আর নিজের পরিবারকে সন্দ করাটা ভালো কথা ?

—সন্দ করার জড় মেরে দিয়ে এসেছি।

—কি করে ?

মহাদেব জবাব না দিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। ওরা একটু অবাক হয়ে গেল। মানেটা ঠিক বুঝতে পারলে না। হাসিটাও কি রকম ভালো ঠেকল না।

প্রেমদাস বললে, কাল সকালে তোমাকে লিয়ে যাব হাসপাতালে।

—হাসপাতালে!—মহাদেব চমকে উঠল,—ক্যানে বল তো?

প্রেমদাস হো হো করে হাসলেঃ দেখ দিকি! হাসপাতালে আবার কিসের জন্যে লিয়ে যায়! চিকিচ্ছের জন্যে!

—কিসের চিকিচ্ছে?

—কিসের! তোমাদের দেহে ব্যামোর কি শেষ আছে হে! বড় ডাক্তারের হাতে পড়লে একে একে সব কিছুর চিকিচ্ছে হবে।

মহাদেব কিছুক্ষণ ধরে নিঃশব্দে শোঁ শোঁ করে তামাক টেনে যেতে লাগল। তারপর খুব বড় করে একটা শোঁ-টান দিয়ে কলকেটা নামিয়ে দিলে। তারপর খুব ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রুদ্ধ-শ্বাসে বললে, লাভ হবে না হে!

প্রেমদাস নিরীহ ভাবে বললে, আগে তো ডাক্তোর দেখান হোক। লাভ-লোকসানের কথা পরে বোঝা যাবে।

মাথা নেড়ে মহাদেব বললে, তা লয় হে! আমার কথাটা তুমি ধরতে পারলা না।

প্রেমদাস অবাক হয়ে জিজ্ঞসা করলে, কি ধরতে পারলাম না?

—কথাটার মানে।

কলকেতে আর তামাকের চিহ্ন মাত্র ছিল না। মহাদেব নিঃশেষ করে দিয়েছিল। একটা টান দিয়েই প্রেমদাস কলকেটা নামিয়ে রাখলে। অন্য সময় হলে এখনি সে আর এক কলকে তামাক সাজতে বসত। কিন্তু মহাদেবের কথায় ঘরের ভিতরে সে এবং বাইরে রাধারাণী উভয়েই কি রকম বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তামাক সাজা এবং খাওয়ার কথা প্রেমদাসের মনেই রইল না।

জিজ্ঞাসা করলে, কি মানে?

—ওই যে বললাম, লাভ হবে না। এখন দেখাতে গেলে দুজনকেই দেখাতে হবে।
নেকড়ে বাঘের মতো দাঁত বের করে মহাদেব হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল। এবং প্রেমদাস আর রাধারাণী দুজনেই চিৎকার করে উঠল : করেছ কি!

সকালে কিন্তু যথারীতি মহাদেবকে আর পাওয়া গেল না।
রাত্রে অনেক আলোচনা হল। মহাদেব অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝল বলেও মনে হল। হাসপাতালে যেতেও সম্মত হল। এবং ওরা যখন মহাদেবের আন্তরিকতা সম্বন্ধে একপ্রকার সুনিশ্চিত হল, তখন মহাদেব প্রস্তাব করলে, আমি কিন্তু বাইরে শোব।
—ক্যানে? তোফা ঘর রয়েছে, বাইরে শোবা কি দুঃখে?—প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে।
হাত জোড় করে মহাদেব বললে, না ভাই। রেতে আমার ঘুম হয় না। সারারাত কাশব আর বিড়ি টানব। এই পিঁড়েতে একখানা সপ্ আর বালিস দাও, বাস!
—মশায় খেয়ে ফেলবে।
—আমার গায়ে মশা বসে না—মহাদেব হাসতে হাসতে বললে।
—সে কি হে!
—হ্যাঁ।
কিন্তু মাদুর ওদের ছিল না। একখানা শতরঞ্চি ছিল বিছানার নিচে পাতা। প্রেমদাস বললে, সপ্ তো নাই ভাই। একখানা শতরঞ্চি দিই, কি বল?
—হ্যাঁ হ্যাঁ। তাতেই হবে।—মহাদেব খুব খুশি।
রাধারাণী চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, পালাবে না তো?
—না বোধ হয়।—তারপর বললে,—আর পালালে ঘর থেকেও পালাবে,

বাইরে থেকেও পালাবে। আমরা তো আর সারারাত পাহারা দিতে পারব না? তা ছাড়া তুমি শোবা কোথা?

তা বটে। রাধারাণী মনে মনে প্রেমদাসের যুক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করে চুপ করে রইল। সত্যি, গরু বাছুর তো আর নয় যে, দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দোব?

রাত্রে একবার উঠে দেখেওছে মহাদেব আছে। জেগেই আছে। কাশছে আর বিড়ি টানছে। তারপরে ওদের ঘুম এসেছে, মহাদেবও কখন সরে পড়েছে। শতরঞ্চি আছে, বালিশ আছে, আর আছে একটি রাশ বিড়ির টুকরো আর পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি।

সকালেই ঠাকুরমশাই এসে জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রে তোমার বাড়িতে কেউ এসেছিল?

—হ্যাঁ, আজ্ঞে। আমাদের দেশের একটি লোক।

বিরক্ত কণ্ঠে ঠাকুরমশাই বললে, না বাপু। তোমরা আছ, তোমরাই থাকবে। ওসব বাইরের লোক-টোক চলবে না। অনেকবার ঠকেছি।

প্রেমদাস সবিনয়ে বললে, আজ্ঞে বাইরের লোক হবে ক্যানে? আমাদের দেশের লোক। চেনা লোক। নইলে জায়গা দোব ক্যানে?

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঠাকুরমশাই বললেন, তোমাদেরই দেশের লোক, আমার তো আর নয়। কিন্তু বাড়িটা আমার। ওসব চলবে না, সাফ বলে দিলাম।

এর উপর আর কথা নেই। প্রেমদাস চুপ করেই রইল।

ঠাকুরমশাই আবার বললেন, সারা রাত কেশেছে। কোনো খারাপ রোগটোগ নেই তো। তা হলে সমস্ত বাড়ি ধুতে হবে।

অর্থাৎ প্রেমদাস এবং রাধারাণীকেই এই সহজ কার্যটি করতে হবে!

প্রেমদাস অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বললে: খারাপ রোগ কোথা পাবেন আজ্ঞে। জলে ভিজে কাশি হয়ে থাকবে বোধ হয়।

—বোধ হয় মানে?—ঠাকুর মশাই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন,—তোমরা শুনতে পাওনি?

—আজ্ঞে পেয়েছি বই কি! কানের কাছে শুনতে পাব না?

—তবে 'বোধ হয়' বলছ যে!

প্রেমদাস হাত যোড় করে বললে, আজ্ঞে ঠাকুরমশাই, ওটা কথার আখর। কেত্তনে আখর দেয় না? তাই।

ঠাকুর মশায়ের বিরক্ত ওষ্ঠাধরে একটু হাসির রেখা দেখা গেল। যেতে যেতে বলে গেলেন, ও সব ভালো কথা নয় বাপু। এ রকম যেন আর না হয়।

প্রেমদাস স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপরে রাধারাণীর দিকে চেয়ে বললে, এর নাম পর-ঘরী। এর নাম শহরে বাস। আমাদের কেনারামপুরে এমন করে কেউ এসে বলতে পারত?

রাধারাণী জবাব দিতে পারলে না।

প্রেমদাস বললে, তা সে যাই হোক, ঠাকুরমশাই একটা সত্যি কথা বলে গিয়েছেন। রোগ তো ওর আছেই,—কত কী রোগ। বালিশটার অড় খুলে রোদে দিও আর শতরঞ্চিটাও কেচে মেলে দিও।

—তা দোব।

বলে রাধারাণী চলে গেল।

একটু পরেই ঠাকরুণ এলেন। আবার নতুন এক প্রস্থ প্রশ্নবাণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে প্রেমদাস সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

ঠাকরুণ একটু কাঁচুমাচু করে জিজ্ঞাসা করলেন, মিন্‌ষে কী বলছিল ভাই, তোমাকে?

প্রসঙ্গটা সংক্ষেপ করবার জন্যে প্রেমদাস বললে, আজ্ঞে, ওই কাল রেতের বেলা আমাদের দেশের একটি লোক এসেছিল, তাই বলছিলেন।

ঠাকরুণ লজ্জিত হাস্যে বললেন, ওই! এমনিতে ও লোক খারাপ নয়। কিন্তু ওই একটা রোগ,—সন্দেহ। বাসা থাকলে পাঁচজন আত্মীয়-স্বজন, দেশের লোক আসবে না? কিন্তু ওর ওই রোগ! বাড়িতে একটা মদ্দা মাছি ঢোকবার উপায় নেই!

প্রেমদাস অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ঠাকরুণ বলে চললেন, আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। আমাকে সন্দেহ! এক এক সময় মনে হয়, আত্মহত্যে করি! কিন্তু কি করব? ও একটা রোগ। তুমি কিছু মনে কোর না ভাই। ও অমনি লোক!

ঠাকরুণ শেষ বাক্যটি পুনরুক্তি করতে করতে চলে গেলেন।

বাঁ হাতে ভিজে শতরঞ্চিটি নিয়ে রাধারাণী ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়াল।

—ঠাকরুণ আবার কি বলেন?

—ঠাকুরের কথা।

—কি কথা?

—ঠাকুর অমনি লোক। সন্দ বাতিক আছে। বাড়িতে মদ্দা মাছি ঢোকবার উপায় নাই।

—যাও!

রাধারাণী ভ্রূভঙ্গি করলে।

প্রেমদাস বললে, মহাদেবের সন্দ বাতিক। তাই জন্যে সে তো একটা খুব সাংঘাতিক কাজই করে বসল। ঠাকুরমাশাই বুড়ো হয়েছেন, ঠাকরুণও তাই। তবু তাঁরও সেই সন্দ বাতিক। তখন থেকে সেই কথাই ভাবছি, বাতিকটা হয় ক্যানে।

—ভগমান জনেন!

রাধারাণী শতরঞ্চিটা নিংড়ে সেই জলে পা-তুটো ধুয়ে ফেললে।

প্রেমদাস বললে, ঠাকরুণ বলছেন, ও একটা রোগ। কিন্তু রোগেরও তো একটা কারণ থাকে।

—কে জানে বাপু!

প্রেমদাস বললে, এও সোজা রোগ লয়। এর যন্ত্রণাতেও মানুষ পাগল হয়ে যায়।

—যায়ই তো!—রাধারাণী সায় দিলে।

একটু পরে প্রেমদাস হেসে ফেললে।

—হাসছ যে ?—রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে।

—একটা মজা দেখলাম।

—কি মজা ?

প্রেমদাস তখনই সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, মহাদেবের যে সন্দ বাতিক আছে, এলোকেশী জানে ?

রাধারাণী জ্র-কুঁচকে একটু চিন্তা করলেঃ না বোধ হয়।

—তাই হবে। মহাদেব তো চোখের সামনে থাকে না। যা আছে, তার মনে-মনেই আছে। আচ্ছা, তোমাকে যদি আমি দিনরাত সন্দ করি, তোমার কষ্ট হবে না ?

রাধারাণী শিউরে উঠলঃ রক্ষে কর ! আমি তাহলে গঙ্গার জলে ডুবে মরব তখুনি।

—কিন্তু পেথম-পেথম তাই হয়তো মনে হয়। পরে সয়ে যায়। তখন হয়তো আর মরে না।

—কিন্তু কষ্ট তো হয়। লজ্জা তো হয়।

—তা যদি হবে তাহলে,

বলতে গিয়ে প্রেমদাস থেমে গেল।

—তাহলে কি ?

প্রেমদাস হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, থাক। হয়তো ভুল বুঝিছি।

রাধারাণী ভিজে হাতখানা দিয়েই ওর একখানা হাত খপ করে ধরে ফেললে। বললে, না বলতে হবে। তাহলে কি, বল।

প্রেমদাস বাধ্য হয়ে আবার বসল। একটু ইতস্তত করে বললে, আমার কি মনে হয় জান ?

—কি সম্বন্ধে ?

—ঠাকুরুণ সম্বন্ধে।

—কি মনে হয় ?

—মনে হয়, ঠাকুর যে এই বয়সেও ওঁকে সন্দ করেন,—মুখে বললেন বটে, লজ্জায় আপ্তহত্যে করতে ইচ্ছে হয়,—কিন্তু,

—কিন্তু ?

—কিন্তু আসলে উনি এর জন্যে মনে মনে গরব করেন। আমার তো তাই মনে হয়।

—যাঃ!

—হ্যাঁ। হাসিটা দেখে আমার তাই মনে হয়। ও হাসি গরবের হাসি, লজ্জার নয়।

প্রেমদাস হুঁকো তুলে নিয়ে নিঃশব্দে টানতে লাগল। আর রাধারাণী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আট

সম্প্রতি অঞ্জলির সঙ্গেই রাধারাণীর ভাব বেশি। তাদের বাড়ি যাওয়া-আসাও খুব বেড়েছে। এখন রাধারাণী আর কাছারী-সংলগ্ন আমতলায় বসে গান গেয়ে ভিক্ষা করে না। তুপয়সা আসছে। অবস্থা একটু স্বচ্ছল হয়েছে। প্রেমদাস রাধারাণীর ভিক্ষা করা পছন্দ করে না। রাধারাণীর চেয়ে সে ভালো গায় নিঃসন্দেহে। বলতে গেলে রাধারাণী বাপের কাছ থেকে গান কতটুকুই বা শিখেছে! তার আসল শিক্ষাই প্রেমদাসের কাছে।

তবু রাধারাণী থাকলে টাকাটা আধুলিটা পড়ে: আর প্রেমদাস একা থাকলে সিকির উপর ওঠে না। তা প্রেমদাসও বোঝে, রাধারাণীও বোঝে। এবং সেইটেই প্রেমদাসের লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইজন্যেই পয়সা কম পড়লেও প্রেমদাস আর রাধারাণীকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষা করতে বসা পছন্দ করে না।

সুতরাং রাধারাণীর হাতে সময় এখন অঢেল। দশটার মধ্যে প্রেমদাসকে তুটি খাইয়ে দিয়েই ছ'টা পর্যন্ত তার ছুটি।

কিন্তু অঞ্জলিদের বাড়ি যাওয়া-আসা যে রাধারাণীর বেড়েছে, সেটা নিছক খোশ-গল্পের জন্যে নয়। অঞ্জলির সেই দাদাটি কদিন হল এসেছে, অনুপম। কিন্তু অঞ্জলি তাকে নতুনদা বলে, রাধারাণীও।

ছোকরা গুণী। চমৎকার গায়। সেতারেও হাত আছে। ছবি তোলে চমৎকার। কি একটা সিনেমা কোম্পানীতে কাজ করে। অঞ্জলি বলে, 'ঘুমন্ত রাজকন্যা' বইটা নাকি আসলে নতুনদারই তোলা। নাম হয়েছে অন্য লোকের।

শুনে তার উপর রাধারাণীর শ্রদ্ধা খুবই বেড়ে গেছে।

প্রত্যহ দুপুরে অঞ্জলিদের বাড়িতেই ওদের বৈঠক বসে। অনুপমের কাছে নতুন নতুন সিনেমার গান শেখে। আর সেতারটা নিয়েও একটু নাড়াচাড়া করে। সিনেমা-জগতের কত অদ্ভুত গল্প শোনে। একেবারে ভিতরের গল্প, তা বাইরের জগতের কেউ জানে না।

বলে, বনবালা এক জোড়া জুতো কিনলে আড়াই শো টাকায়। আমি সঙ্গে ছিলাম তাই, নইলে আমিই বিশ্বাস করতে পারতাম না।

রাধারাণী বিস্ময়ে গালে হাত দিলে।

অঞ্জলি বললে, বাবাঃ!

অনুপম উৎসাহে বললে, এর আর বাবা কি! ওর নিজের পেছনে কত খরচ হয় জানিস?

—কত?

—দৈনিক পাঁচশো টাকা! আর তার স্নো, ক্রিম, পাউডার, এসেন্স, রুজ, লিপ-স্টিক,—সেকি এক রকমের, না একটা! সমস্ত আসে ফ্রান্স থেকে। একটা মস্ত বড় ঘরই আছে এই জন্যে, কত রকম করে আয়না ফিট্ করা। একটা নার্স ই আছে। রোজ রাত্রে শোবার আগে সর্বাঙ্গ মাসাজ করে,—মালিস করে,—সর্বাঙ্গে ক্রিম-পাউডার মাখিয়ে দিয়ে যায়।

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, ক্যানে?

অনুপম হেসে ফেললে, ক্যানে কি? ক্যানো বলতে পারেন না? ভাষাটা ঠিক করুন।

রাধারাণী লজ্জা পেলে। চেষ্টা করতে লাগল ভাষাটা ঠিক করবার জন্যে।

কিন্তু খুব ভালো লাগল, বলতে গেলে অদ্ভুত লাগল, অনুপমের মুখের 'আপনি' সম্বোধন। তাকে পরিচিত-অপরিচিত, ছোট-বড় কেউ কোনদিন 'আপনি' বলেনি। গ্রামে বড়রা 'তুই' বলত, ছোটরা বড় জোর তুমি। গ্রামের বাইরেও, এখানেও, সবাই তাকে 'তুমি' বলেছে। ভিখারিণীকে কে 'আপনি' বলবে!

অনুপমের দেওয়া এই অপ্রত্যাশিত সম্মানে সে যেন নারী-লোকের অন্য এক স্তরে উঠে গেল, যেখানে মহিলারা বিরাজ করেন। একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে তার মনের মণিকোঠা মুহূর্তে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল।

অনুপম উত্তর দিলে, মাসাজ করে দেহটার জন্যে। সিনেমাতে দেহ-সৌষ্ঠবই হল আসল জিনিস। দেহের গড়ণটা ঠিক রাখতে হয়। আর মুখ। যেমন অঞ্জলির মুখ,—একেবারে সিনেমা-মুখ। আপনারও।

অঞ্জলি যেন কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইল। জিজ্ঞাসা করলে, এত টাকা খরচ করে কি করে?

—কি করে?—অনুপম হাসতে লাগল,—তোমাদের ধারণা নেই, সিনেমায় একটি মেয়ে কত রোজকার করে। বনবালা ইন্‌কাম ট্যাক্সই দেয় প্রায় লাখ টাকা!

—সেটা কি?—অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করলে।

বিস্ময়ে ওদের দুজনেরই চোখের পলক পড়ছিল না।

অনুপম ইন্‌কাম ট্যাক্সের ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝিয়ে দিলে। বললে, এদেশে তবু কিই বা হয়! অ্যামেরিকায় একটি সিনেমার মেয়ে বেড়াতে গিয়েছিল একটা লেকের ধারে। সেদিকটা পুলিশ দিয়ে ঘিরে রাখতে হয়েছিল! আর ওপারের লেকের ধার বরাবর সমস্ত জায়গাটা ইজারা নিয়ে একটা লোক লক্ষ টাকা রোজকার করেছিল।

—কি করে?—অঞ্জলি আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলে।

—সেইখানে সার সার চেয়ার পেতে রেখেছিল। সেই সব চেয়ার মোটা মোটা টাকায় ভাড়া হত।

—ক্যানো?

রাধারাণী আর ক্যানে বললে না।

অনুপম ইঙ্গিতপূর্ণ হাসির সঙ্গে বললে, মেয়েটি সকালে-সন্ধ্যায় এপারে সাঁতার দিত। ওরা বাইনাকুলার দিয়ে ওপার থেকে দেখত।

—মাগো, কী লজ্জা!

অঞ্জলি লজ্জায় রাধারাণীর গায়ে ঢলে পড়ল।

অনুপম বললে, সেই লেকের জল শিশি করে বিক্রি হয়েছে। আর শুনবেন?

বলে রাধারাণীর দিকে চাইলে। রাধারাণী চোখ নামিয়ে নিলে।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। পাঁচটায় কাছারী ভাঙে। সেই সময়টা প্রেমদাসের গানের তুন চলে। যে-সব মক্কেল মামলা জিতেছে, যে-সব উকিল মোটা ফি পেয়েছে, ফেরার পথে সবাই কিছু কিছু খুশি হয়ে দিয়ে যায়। তারপরে রাস্তা ধীরে ধীরে লোকবিরল হয়ে আসে। প্রেমদাসও তার আসন গুটিয়ে উঠে পড়ে। পথেই বাজার সেরে প্রেমদাসের ফিরতে সাড়ে-পাঁচটা, ছ'টা।

রাধারাণীকে এবার উঠতে হয়েছে। কিন্তু উঠতে পারছে না। তার সমস্ত দেহ কেমন অবশ হয়ে গেছে।

ও বাড়িতে রাধারাণীর এই খাতিরে বিমলার হিংসা হয়। বলতে গেলে বিমলার মারফৎই অঞ্জলির সঙ্গে রাধারাণার পরিচয়। নইলে রাধারাণীকে চিনত কে? থাকে তো ভট্চায বাড়ির পেছনে একখানা গোলপাতার ঘরে! খায় তো ভিক্ষে করে! কেউ কি ওকে ডাকত, না বসতে বলত! সেই রাধারাণী ওর বাড়ির পাশ দিয়ে যায়, অথচ ওর বাড়ি আসে না। বনবালা-শাড়ি পরে বোষ্টুমীটার অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না!

আর অঞ্জলিই বা এমন কি! বাবা তো চিরজীবন পোস্ট অফিসের পিওনী করে এতদিনে পোস্টমাস্টার হয়েছে। বাড়িখানা নামেই দোতলা। এদিকে চুনবালি খসে পড়ছে, নোনা-ধরা ঘর। আর নিজে

তো তিন বছর ধরে ক্লাস এইটে রয়েছে, নাইনে আর উঠতে পারছে না। এতই বা তার গরব কিসের!

বিমলার হিংসা হয়। অঞ্জলির উপর, রাধারাণীর উপরও। কেন হিংসা হয় তাও স্পষ্ট করে বলতে পারে না।

অঞ্জলিদের দোতলা বাড়ির পাশেই ওদের একতলা বাড়ি। অঞ্জলি দোতলার জানলায় এসে দাঁড়ালে উঠান থেকে তার সঙ্গে কথা বলা যায়। ছাদে উঠলে আরও ভালো কথা বলা যায়।

কাল বিকেলে একবার ছাদে উঠেও ছিল। জানালার নিচের দুটো পাল্লা বন্ধ থাকায় দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু ওদের হাসি-গল্প শোনা যাচ্ছিল। সিনেমার গল্প! হাসিটা কিসের কে জানে।

বিমলা আর দাঁড়ায়নি। নেমে এসেছিল।

কিন্তু পরের দিন বিকেলে রাধারাণী যখন নেমে আসছিল তখন ওকে ধরে ফেললে। বললে, কি গো, চিনতেই পারছ না বুঝি?

রাধারাণী লজ্জিত হয়ে পড়ল। বললে, না ভাই, রোজ ভাবি ফেরবার সময় তোমার এখানে একটু বসে যাব। কিন্তু তখনই ওঁর আসবার সময় হয়ে যায়, আর বসতে পারি না।

—ওখানে কি হয় তোমাদের?

—অঞ্জলির নতুনদা এসেছেন। তাঁর কাছে একটু গান শিখি। পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে। গানের সখ আছে, কিন্তু শেখবার সুযোগ তো পাই না। আর লজ্জাই বা কি ভাই। অঞ্জলির যখন দাদা,

চোখ মট্‌কে বিমলা বাধা দিলেঃ দাদা না হাতী! দিনরাত হাসির শব্দ শুনি। দাদার সঙ্গে অত হাসির কি থাকে, জানি না ভাই। দাদা তো আমাদেরও আছে। আমরা তো দাদাকে দেখে ভয়েই অস্থির।

রাধারাণী একটু থমকে গেল। হাবভাবটা তার নিজেরও যেন কেমন কেমন লেগেছে। কিন্তু তখনই ভেবেছে, শহরের কাণ্ড! হবেও বা। বললে, কিন্তু ওর বাপ-মা তো বাধা দেন না।

মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বিমলা বললে, বাধা আবার দেবে কি! তুমিও যেমন। ছেলেটা ফাজিল-ফক্কড় হতে পারে। কিন্তু চাল-চলন দেখে মনে হয়, রোজগার করে। সুতরাং বিনা পয়সায় মেয়েটা যদি পার হয়ে যায় তো যাক না!

বিচিত্র নয়। ভদ্রঘরে মেয়ের বিয়ে একটা মস্ত সমস্যা। মেয়ের বাপ-মা করবে কি! চোখ বুঁজে থাকে।

রাধারাণী বললে, যা রটে তার কিছু বটে ভাই। আমার ছুটো গান শেখা নিয়ে কথা। তার ওপর

—তার ওপর ?

একটু ইতস্তত করে রাধারাণী বললে, তার ওপর অঞ্জলি একটা বিপদে ফেলেছে।

—কি আবার বিপদ !—কৌতূহলে বিমলার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

—ওদের ইস্কুলে কি একটা ফাংশন হবে, (রাধারাণী অনেক নতুন কথা শিখেছে!) তাতে অঞ্জলিও গাইবে, আমাকেও ধরেছে গাইতে হবে।

বিমলার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল: তাই না কি!

—আর বোলো না ভাই। নতুনদা তার স্থুর দিয়েছেন। এমন কঠিন স্থুর ভাই, কিছুতেই আসছে না। কী যে করি!

—কবে ? কবে হবে ?

—তেরোই। আর মোটে পাঁচ দিন আছে। আমরা ভাই, বাউল গাই, কেত্তন গাই। এ সব সিনেমা ঢং-এর গান আমাদের গলায় সহজে আসতে চায় না। কিন্তু নতুনদাও ছাড়বেন না। কী মুস্কিলে পড়েছি দেখ দেখি!

বলে একটা নবনীত ভঙ্গিতে রাধারাণী হাসলে। এ হাসিটা ওর অঞ্জলির কাছে শেখা। সিনেমাতেও এমন হাসি দেখেছে।

শহরের আর পাঁচজন মেয়ের মতো বিমলারও সিনেমা দেখার সখ যথেষ্ট। নতুন বই প্রায়ই বাদ যায় না। এ হাসি সে চেনে। এর অর্থও সে

জানে। রাধারাণী গানটা তো আয়ত্ত করেছেই, ফাংশনের দিনে গানটা গেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে এমন ভরসাও মনে মনে করে।

বললে, আহা! অত আর বিনয় দেখাতে হবে না! তুমি সেদিন কেমন গাইবে, সে আমি না শুনেই বলে দিতে পারি।

—না ভাই। আমার তো খুব ভয় করছে।

এমন সময় অনুপমের সঙ্গে অঞ্জলি নেমে এল। তুজনেরই সাজে-পোশাকে বাইরে যাবার চাকচিক্য।

অনুপম সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তো বাড়ি-ফেরার জন্যে অত তাড়া দিচ্ছিলেন, এখন এখানে দাঁড়িয়ে যে!

—বিমলার সঙ্গে একটু গল্প করছি।

অঞ্জলি হয়তো বিমলাকে লক্ষ্য না করেই সোজা চলে যেত। কিন্তু সবাই যখন দাঁড়িয়ে পড়ল, তখন বিমলার সঙ্গে কথা না বললে ভালো দেখায় না।

বেশ চালের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলে, কি রে বিমলি, কেমন আছিস?

বিমলাও কম যায় না। উত্তর দিলে, আমাদের আর থাকাথাকি কি ভাই! আছিস তো তোরা!

—কি রকম?—অঞ্জলি অপ্রস্তুত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

—না তো কি! গান শিখছিস, সিনেমা দেখছিস, দিব্যি আছিস!

—তাই নাকি?

ওরা চলে গেল।

বিমলা হাসলে। বললে, এই বেরুল, ফিরতে রাত দশটা।

—সিনেমা যায় বোধ হয়?—রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে।

—কি জানি ভাই, রাত দশটা অবধি কোন সিনেমা চলে!

বলে মুচকি হেসে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

এ কদিনের মধ্যে রাধারাণী কথাটা আর প্রেমদাসকে বলেনি। কাল অনুষ্ঠান, আজ কথাটা পাড়লে:

—একটা তো ভারি মুস্কিলে পড়েছি।

—কি মুস্কিল ?—প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে।

—এক জায়গায় গান গাইতে হবে।

—কোথা ?

—অঞ্জলিদের ইস্কুলে।

প্রেমদাসের ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিচ্ছিল। স্কুলের নামে আবার তা মিলিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, সেখানে কি বটে ?

—একটা ফাংশন আছে।

—কি আছে ? – বুঝতে না পেরে প্রেমদাস উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

—ফাংশন। মুখ্যু, ফাংশন কাকে বলে জান না ? এই সব গান বাজনা আর কি !—রাধারাণী হাসতে হাসতে মাথাটা নেড়ে দিলে।

প্রেমদাসের মনটা খুব খুশি হল। বললে, সেইখানে তুমিও একখানা গাইবা ?

রাধারাণী ধমক দিলে গাইবা নয়, গাইবে। এতদিন রইলে ভাষাটা এখনও ঠিক হল না ?

—ক্যানে ? বেঠিকটা কি ?

—আবার ক্যানে ! ক্যানো বলতে পার না ? ক্যানে কি ?

থতমত খেয়ে প্রেমদাস বললে, আচ্ছা বাবা ! ক্যানো। গাইবা বলব না, গাইবে। সেখানে তুমি গান গাইবে ? এইবার হয়েছে, লয় ?

রাধারাণী আবার ধমক দিলে : ফের লয় বলে ! নয়।

এইবার প্রেমদাস হাল ছেড়ে দিলে। বললে, দেখ বাপু, ওসব নাকি সুরে ন্যাকা কথা আমার আসবে না। আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোকের নাকের গড়নই আলাদা। নাকি সুর আসে না।

—না, আসে না !

—হ্যাঁ, আসে না। আলবৎ আসেনা। তোমার আসে তুমি বোলো। আমার আসবে না, আমি বলব না। ব্যাস।

ঝাঁজের সঙ্গে রাধারাণী বললে, বোলো না। মুখ্যু চাষা হয়েই থাক।

প্রেমদাস বললে, কিন্তু তুমিও এতকাল এই ভাষাই বলে এসেছ রাধু। অনেকদিন পরে আবার সেই নাম ধরে ডাকা!

রাধারাণী চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, সে যখন বলেছি, তখন বলেছি। এখন তার চেয়ে ভালো ভাষার খোঁজ পেয়েছি। এতকাল বলে এসেছি বলে চিরকাল সেই ভাষাই বলতে হবে? ভালো ভাষা বলব না?

প্রেমদাস বললে, বল। কাজিয়ে করে লাভ কি?

রাধারাণী হেসে বললে, কাজিয়া নয়, ঝগড়া। না, ঝগড়া করে লাভ নেই।

প্রেমদাস বললে, হ্যাঁ। এই দেখ, এলোকেশী একখানা চিঠি দিয়েছে।

মহাদেব পালিয়ে যাবার পর রাধারাণীর জবানীতে প্রেমদাস এলোকশীকে একখানা চিঠি দিয়েছিল। এ তারই জবাব।

রাধারাণী বললে, কি লিখেছে, পড় শুনি।

প্রেমদাস হেসে বললে, হুঁ, হুঁ। আমি তো মুখ্যু চাষা। কিন্তু শুধু বনবালা-শাড়ি পরে শহুরে কথা বললেই শহুরে মেয়ে হয় না। লেখাপড়াটাও জানা চাই।

রাধারাণী ওর পাশেই থপ করে বসে পড়ল। ওর কাঁধে একখানা হাত দিয়ে বললে, শেখাবে আমকে? সন্ধ্যেবেলা বসে তোমার কাছে পড়ব। কেমন? দেখো আমি খুব শীঘ্রি লেখাপড়া শিখব।

প্রেমদাসের এতে খুব সম্মতি আছে। হেসে বললে, আমিই তো এক পণ্ডিত! তার ছাত্রী তুমি! তা বেশ, কাল একখানা পেথমভাগ কিনে আনব। কাল গুরুবার। দেখা যাক, বিদ্যে কতখানি হয়!

—হবে গো, হবে। দেখো তুমি। আমার কিছু শিখে নিতে দেরি হবেনা। শহুরে কথা কেমন শিখিছি দেখছ না?

—তা দেখছি বটে।

প্রেমদাস এলোকেশীর চিঠিখানা শোনাতে লাগল। এও অন্য লোকের লেখা। এলোকেশী লিখতে জানে না। সুতরাং কথা কিছু এলোকেশীর, কিছু লেখিকার। মোটা-মুটি তাতে এই কথা বলা হয়েছে যে, মহাদেবের পিছনে ছুটে আর লাভ নেই। সে একেবারেই মনুষ্যত্বের বাইরে চলে গেছে। তার আশা এলোকেশী ছেড়ে দিয়েছে। ছোটমোড়ল এবং বড় গিন্নিও ছেড়ে দিয়েছে। রাধারাণীরাও যেন ছেড়ে দেয়। সে যদি বেঁচে থাকে, ভালো। না বেঁচে থাকলেও ক্ষতি নেই। এলোকেশীর অদৃষ্টে যা ছিল, হয়েছে। কিন্তু সে যেন আর না ফেরে। নিজের শরীরের প্রসঙ্গে চিঠিতে এলোকেশী একটা কথাও লেখেনি। অনাবশ্যক বিবেচনাতেই লেখেনি সম্ভবত। এক্ষেত্রেও সনাতন অদৃষ্টবাদই তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

রাধারাণী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

মেয়েমানুষ কত বড় বিতৃষ্ণায় কামনা করে, স্বামী বাঁচুক, মরুক, কিন্তু যেন আর না ফেরে, সেই কথা ভাবতে রাধারাণীর মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল।

শুধু বলে উঠল ঃ উঃ!

প্রেমদাস বললে, শরীরের কথা কিছুই লেখে নাই।

—না। কি হবে লিখে? মেয়ে মানুষের শরীরের দাম কি বল? গেলেই বা কি, থাকলেই বা কি?

প্রেমদাস এর জবাব দিতে পারলে না। বললে, ওকে আনিয়ে চিকিচ্ছে করালে হয় না? এখনও রোগ তেমন পাকা হয় নাই। অল্প চিকিচ্ছেতেই সেরে যেতে পারে।

—লিখতে পার। কিন্তু সে আসবে না। তার বাড়ির লোকেই পাঠাবে না।

—ক্যানে?

—কারোই গরজ নেই।

—তার নিজেরও নাই?

—না।

দু'জনেই নিঃশব্দে বসে রইল।

তারপর রাধারাণী বললে, তারপর এনে রাখবেই বা কোথায়? যা তোমার ঠাকুর মশাই!

—ও হো, তা বুঝি জান না?—প্রেমদাস বলে উঠল,—মেয়েছেলে এলে ঠাকুর মশাই কিছু বলবেন না।

—তাই নাকি?—রাধারাণী সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলে।

—হ্যাঁ। তবে তখন আবার ঠাকরুণ বাধা দেবেন।

—তাই বুঝি?

দুজনে হাসতে লাগল।

প্রেমদাস বললে, পরশু, কি তার আগের দিন, ঠাকুর মশাই তোমার এখানে চা খেয়ে গিয়েছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ। এসে বললেন নাৎবৌ, একটু চা দিতে পার বাছা? ওঁর সেই বাতের ব্যথাটা আজ আবার উঠেছে। চায়ের কথা বললেই কুরুক্ষেত্তর বাধাবে। তা দিলাম একটু চা করে। খেয়ে খুব খুসি হলেন। বসে বসে অনেকক্ষণ গল্পও করলেন।

—হুঁ। তারপরে সেই কুরুক্ষেত্তরই বেধেছিল।

—কখন গো?

তারপরে তুমি তো বেরিয়ে গেলে ঝুলন দেখতে। আর আমি ফিরে এসে দেখি বেধে গিয়েছে। 'ক্যানে ওখানে গেলে চা খেতে? এতই যদি ইচ্ছে হয়েছিল দোকান ছিল না? নাৎবৌয়ের হাতের চা বড় মিষ্টি, লয়! তোমার ঠ্যাং আমি ভেঙে দোব। বিটলে বামুন, রস আর মরছে না!' সে এক কাণ্ড!

—তাই নাকি! মাগো কি লজ্জা! দুজনেই হাসতে লাগল।

নয়

একটা অনুষ্ঠানেই রাধারাণীর নাম সারা শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম দিকে শহরের অত বড় হলে, অত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সামনে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিতান্ত পর্দানশীন তো নয়। অনেক অপরিচিত লোকের সামনে সে দিনের পর দিন আমতলায় বসে গেয়েছে। সুতরাং নিজেকে সামলে নিতে বিলম্ব হল না।

যেমন ধারালো তার গলা, গায়কীও তেমনি উচ্চাঙ্গের। সুরগুলো যেন ঘরের দেওয়ালগুলো ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। সুরের অতি সূক্ষ্ম কাজ, অত্যন্ত ছোট ছোট মোচড়গুলো কত অনায়াসে বেরিয়ে আসছে! অসংখ্য লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই সঙ্গীতসুধা পান করে ধন্য হচ্ছে। তাদের চোখে মোহের অঞ্জন, মুখে অপার্থিব আনন্দের জ্যোতি।

রাধারাণী তন্ময় হয়ে গেয়ে গেছে। রাধারাণী-বৈষ্ণবী নয়। তার রং-করা মুখ, আঁকা ভুরু, রক্তিম অধর, পরনে একখানি জমকালো শাড়ি। সবই নতুনদার শখ, নতুনদারই সংগৃহীত। কিন্তু নিজের কথা তার মনেই ছিল না। জমকালো শাড়ি, গোল পাতার বাড়ি, প্রেমদাসের দাড়ি, নতুনদার চমক-লাগান ঢং, এমন কি এই আলো-ঝলমল প্রেক্ষাগৃহের কথাও না। সে যেন এক সুরলোকের দূতী। সামনের অসংখ্য মুগ্ধ ভক্তের কাছে এক অভিনব লোকের বাণী নিয়ে এসেছে।

অপূর্ব সে গান! শ্রোতারা 'এনকোর' দিতেও ভুলে গেল।

গান শেষে রাধারাণী যখন পর্দার আড়ালে এল, অনুপম তাকে জড়িয়ে ধরলে, আঃ! কী গানটাই না গাইলেন! জীবনে এমন গান বেশি শুনেছি বলে মনে হয় না।

রাধারাণী ওর আলিঙ্গনের মধ্যে এলিয়ে পড়ল। তার চোখে তখনও সুরলোকের স্বপ্ন, তার মন, বুদ্ধি এবং দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে।

প্রেমদাস নিজেও গিয়েছিল অনুষ্ঠানে। বেশভূষা এবং নানা রঙের আলোকসজ্জার মধ্যে রাধারাণীকে প্রথমে সে চিনতেই পারেনি। গলা খুলতেই চিনতে পারলে। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে। সুরের কারুকার্যের মধ্যে তখনই আবার সে হারিয়ে গেল।

রাধারাণীকে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং প্রেমদাস আর অপেক্ষা না করে একাই হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এল। তার কানের কাছে অবিশ্রান্ত গুঞ্জন করে চলেছে সেই একটি মাত্র কলি: বাদল-রাত্রির সেই রিমঝিমঝিম। কখনও সহস্র তারে ঝঙ্কারে উত্তাল হয়ে উঠছে, আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে, দূর দিগন্তের কোলে, যেখানে শব্দ মহাসমুদ্র স্তিমিত হয়ে আছে, তারই মধ্যে।

ভরা ভাদ্রের মেঘ থেকে ঝম ঝম অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। তার মধ্যে ছাতাটি মাথায় দিয়ে চলেছে প্রেমদাস, আত্মনিমগ্ন, শহরের প্রান্তে নির্জন রাস্তা দিয়ে। কানের মধ্যে সেই সুর।

সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

তার গোলপাতার ছোট ঘরখানির দরজা খুলে ভিতরে এল। জানালা দুটো খুলে দিলে। আলো জ্বালতে ইচ্ছা করল না।

তক্তাপোষে বসে একতারাটি পেড়ে টুং টুং করে দুটো মৃদু ঝঙ্কার দিলে। অত্যন্ত মৃদু। তারের কাছে কান লাগিয়ে শুনতে হয়। হয়তো জলসাঘরের যে ঝঙ্কার তার কানের মধ্যে বাজছে, তাকেই স্পষ্টতর করার প্রয়াস।

এমন সময় রাধারাণী এল। সঙ্গে অনুদা, অঞ্জলি, আরও কত লোক। দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে ওরা যেমন কলরব করতে করতে এসেছিল, তেমনি কলরব করতে করতেই চলে গেল।

সদর দরজা বন্ধ করে রাধারাণী ভিতরে এল।

অন্ধকার ঘর। কিন্তু ভিতরে টুং টুং একতারার ঝঙ্কার শোনা যাচ্ছে।

রাধারাণী যেন ক্লান্ত। দরজার চৌকাঠ ধরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল

কিছুক্ষণ। বুঝলে, প্রেমদাসের চৈতন্য নেই। তাকে বলা মিথ্যা। ঘরের কোথায় হারিকেন, কোথায় কি, কিছুই সে জানেনা, খবরও রাখে না।

--দেশালাইটা দাও তো।

অন্যমনস্কভাবে প্রেমদাস দেশালাইটা ফেলে দিয়ে আবার তেমনি মৃদু, অতি মৃদু ঝঙ্কার তুলতে লাগল। রাধারাণী হারিকেন জ্বালতেই চমকে উঠল।

সেই রাধারাণী ঃ রং-করা মুখ, আঁকা ভুরু, রক্তিম অধর!

সেই রাধারাণী ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল। তার যেন কি বলবার আছে, কিন্তু কথাটি খুঁজে পাচ্ছেনা। নিঃশব্দে হাঁটু গেড়ে বসে প্রেমদাসের পায়ে মাথাটি ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ রাখলে। হাত বাড়িয়ে পায়ের ধূলা নিয়ে মাথায় দিলে। তারপর উঠে দাঁড়াল।

প্রেমদাস তখন গান ধরেছে ঃ

চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণনা।

প্রেমদাস আখর দিলে ঃ গণনা করি নাই, কাউকে মানুষ বলে গণনা করি নাই। আর তার ফলে আজ ঃ

সো পিয়া বিনা মোহে
কে কি না কহলা॥

তাই হয়। বিধাতা যখন পরিহাস করেন, এমনি করেই করেন। যার সঙ্গে মিলনে পাছে এতটুকু বাধা হয় বলে আমি বক্ষে বস্ত্র, অঙ্গে চন্দনের অনুলেপ দিইনি, গলায় হার পরিনি, আজ সে নদী ও পর্বতের ব্যবধানে চলে গেল। সুতরাং

পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে।

গান শেষ করে প্রেমদাস নিস্পন্দ বসে রইল। তার নিমীলিত চোখের কোণে দুফোঁটা অশ্রু হারিকেনের আলোয় চিক চিক করে উঠল।

রাধারাণী উঠে দাঁড়াল। ওর সেই জমকালো শাড়ির আঁচল দিয়ে প্রেমদাসের চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, আমার মন আজ থৈ থৈ করছে। কিন্তু তুমি কাঁদ কেন? তুমি খুশি হওনি?

—হয়েছি।

—তবে কাঁদ কেন?

প্রেমদাস জবাব দিতে পারছে না। সে খুশি হয়েছে। খুবই খুশি হয়েছে। তবু কাঁদছে। কেন জানে না। তার কেবলই মনে হচ্ছে, রাধারাণী অনেক দূরে চলে গেল। দুজনের মধ্যে নদী-পর্বতের ব্যবধান এসে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ চলে যাওয়ার পরে তাঁর সঙ্গে শ্রীমতীর যেমন সত্যিকার নদী-পর্বতের ব্যবধান এসেছিল, তেমন যদিও নয়,—তবু সত্যি, তেমনি সত্যি। এবং এই বিচ্ছেদ সে সইবে কি করে?

কিন্তু এ কথা বোঝাবার ভাষা তার জানা নেই। কেমন ছায়া-ছায়া, অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করছে মাত্র।

মনকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, সেও কি এক রকম করে, যে বিচ্ছেদটা কোথায়? এই তো রাধারাণী। তার কাছে দাঁড়িয়ে, তারই কাঁধে হাত রেখে, তার একান্ত সন্নিকটে। কিন্তু মন বলছে, না। ব্যবধান ঘটেছে। মধ্যের পাঁচিলটা চোখে দেখা যাচ্ছেনা, কিন্তু আছে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ভাবেই আছে।

কিন্তু এও বুঝছে বিনা ভাষায়। ভাষার সাহায্যে নয়।

অনুভব যেখানে ভাষার সাহায্য পায় না, সেখানে কী বেদনাকর! যেন স্বপ্ন-দেখা। স্বপ্নের ঘটনা অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘটে চলেছে। ভাষা তার পিছু পিছু ছুটেও নাগাল পাচ্ছে না। খোঁড়াচ্ছে, হাঁফিয়ে উঠেছে! তেমনি।

রাধারাণী পরম স্নেহভরে ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগল। সেই হাত যেন নিঃশব্দে বলছে, তুমি গুরু, তুমি স্বামী। তুমি খুশি হও। তুমি খুশি না হলে আমার সকল আনন্দ মিথ্যা হয়ে যাবে।

কিন্তু প্রেমদাস নিঃসাড়। অবুঝ শিশুর মতো শক্ত হয়ে, কঠিন হয়ে,—কিন্তু শান্ত হয়ে,—সে বসে রইল।

আশ্চর্য একটা অবস্থা !

কী যে হয়েছে তা কেউ জানে না। কার দোষ, কোথায় ত্রুটি, কিসের অন্যায় তাও কেউ বলতে পারে না। শুধু অনুভব করতে পারে, কি যেন অন্যায় ঘটতে চলছে। সেটা ভালো নয়। তার মধ্যে কল্যাণ নেই।

শুধু অনুভব করতে পারে। তাও একা প্রেমদাসই অনুভব করতে পারে। কি করে জানি না, কিন্তু একা প্রেমদাসই। তারই ছায়া পড়েছে রাধারাণীর মনে। যেমন করে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে গ্রহণ লাগায়, তেমনি করে।

রাধারাণীর মনে যেন গ্রহণই লেগেছে।

সারারাত্রি নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে দুজনে নিঃশব্দে কাটাল। আর সেই নিঃশব্দের মধ্যে কাল রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ঢেলে গেল : ঝম ঝম ঝম ঝম। সকালে দুজনে উঠেই নিঃশব্দে নিজের নিজের কাজে লেগে গেল। প্রেমদাস খেয়েদেয়ে ভিক্ষায় বেরুল। তার পাতে বসে দুটি খেয়ে নিয়ে, বাসন মেজে, রান্নাঘর ধুয়ে মুছে রাধারাণী ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সাধারণত দুটোর মধ্যেই সে অঞ্জলিদের বাড়ি যায়। কিন্তু আজ আর ভালো লাগল না। কাল সারা রাত ঘুম হয়নি। রাধারাণী বিছানায় শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু ঘুম আসে না।

চারটে নাগাদ কে যেন ওর ঘরের শেকল নাড়লে। জোরে নয়, আস্তে। সাড়া দিতে গিয়ে রাধারাণী ঠোঁট টিপে ধরলে : অনুপম নয় তো। তার বুকের ভিতরে ঢিপ ঢিপ করে উঠল।

—রাধুদি !

না। অনুপম নয়। এ গলা অঞ্জলির। কিন্তু তারই পিছনে অনুপম দাঁড়িয়ে নেই তো !

—রাধুদি ! ওঠ, ওঠ না। দরজা খুলে দাও।

—দিই।—রাধারাণী দরজা খুলে দিয়ে দেখে, সামনে হাস্যমুখী অঞ্জলি দাঁড়িয়ে। আর কেউ নেই তো? দরজার দুপাশে সভয়ে উঁকি দিলে।

—কি দেখছ?—সবিস্ময়ে অঞ্জলি জিজ্ঞসা করলে।

—কিছু নয়। এস।

হাসিমুখে রাধারাণী ওকে অভ্যর্থনা করলে। কিন্তু তখনও তার মুখের বিবর্ণতা একেবারে কাটেনি।

—একখানা গান কাল গাইলে বটে! সারা শহর তোলপাড়! খবর রাখ?—অঞ্জলির প্রথম অভিনন্দন।

—না। কি করে খবর রাখি! পড়ে আছি শহরের এক কোণে। রাধারাণী হাসতে হাসতে জবাব দিলে।

—চল। নতুনদা ডাকছেন। তাঁর মাথায় আরও কি না কি মতলব এসেছে।

—আবার কি মতলব?

—তা আমি কি করে জানব? তুমি গেলে তোমাকে বলবেন।

রাধারাণী হাত জোড় করে বললে, আজকে নয় ভাই। তাঁকে বোলো আজকের দিনটা মাপ করতে। শরীরটা খারাপ।

তাই বটে। মুখখানা বিবর্ণ। গলার স্বর কাঁপছে। শরীর যে ভালো নয়, সে বিষয়ে অঞ্জলির সন্দেহ রইল না।

বললে, দেখো রাধুদি। এই সময় শরীর খারাপ কোরো না। নতুনদার মাথায় আরও অনেক নতুন নতুন প্ল্যান এসেছে।

—সে আবার কি!

—বুঝতে পারবে কয়েকটি দিন পরে। কিন্তু তুমি একবারটি আধ ঘণ্টার জন্যেও যেতে পারবে না? তোমার জন্যে বড্ড ব্যস্ত হয়েছেন তিনি!

—আজকে নয় ভাই। আজ কোনোমতেই নয়। দাঁড়াও, তোমার জন্যে একটু চা করে আনি।

রাধারাণী ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দুহাতে দুপেয়ালা চা নিয়ে ফিরল। একটি পেয়ালা অঞ্জলিকে দিয়ে অন্যটিতে নিজে চুমুক দিলে।

হেসে বললে, নতুনদাকে বোলো, আর যেন কোন মতলব তিনি না করেন। করলেও আমাকে নিয়ে নয়।

—সে আবার কি ?

—মনে হচ্ছে এই ধাক্কাই কাটতে সময় নেবে।

অঞ্জলির তখনও বিশ্বাস, এ সমস্তই প্রথম খ্যাতি লাভের বিনয়।

বললে, আ হা !

রাধারাণী তখনই কিছু বললে না। চায়ের পেয়ালায় আপন মনেই পুনঃ পুনঃ কয়েকটা চুমুক দিলে।

তারপর বললে, সত্যি অঞ্জলি। আমার কথা তুমি বুঝবে না। পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে। বোষ্টুমী। শহর কখনও দেখিনি, দুর্ভিক্ষের তাড়ায় চলে এসেছি। গান গাই। কিন্তু সে ভগবানের নাম। ভিক্ষের জন্যে গাই। জলসা আমার জন্যে নয়।

—কেন ?

—আমি গানের জানি কি ! নতুনদা একখানা গান শিখিয়ে দিয়েছেন। সভায় সেইখানা গাইলাম। কেমন গাইলাম, ভগবান জানেন। তোমরা বলছ ভালো হয়েছে। কিন্তু সেই একটা ভালোর ধাক্কা এখনও সামলাতে পারিনি। আমার মেরুদণ্ড যেন ভেঙে গিয়েছে। নড়তে পারছি না।

রাধারাণীর কণ্ঠস্বরে কি যেন একটা ছিল। অঞ্জলি তার কথা অবিশ্বাস করতে পারলে না। অবাক হয়ে ওর ক্লান্ত করুণ মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাধারাণী আবার বললে এসব আমাদের জন্যে নয় ভাই।

অঞ্জলি ব্যস্তভাবে বললে, তাহলেও তুমি পাঁচ মিনিটের জন্যে একবার বরং চল ভাই। তোমার কথা তুমি নিজের মুখেই তাঁকে বলবে। নইলে হয়তো তিনি অপদস্থ হবেন।

—কেন ? অপদস্থ হবেন কেন ?

—আমি ঠিক জানি না, বোধহয় রাজবাড়িতে একটা জলসার আয়োজন হচ্ছে। তুমি যদি না যাও,—এই দেখ, নতুনদা নিজেই এসে উপস্থিত !

অনুপম তখন একেবারে ঘরের মাঝখানে।

রাধারাণী উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে।

অঞ্জলির পাশে তক্তাপোষের উপর বসতে বসতে অনুপম বললে, করি কি বল। তোমার দেরি দেখে ভাবলাম, কিছু একটা ঘটেছে ! সুতরাং গরজ যখন আমার, তখন পর্বতকেই মহম্মদের কাছে আসতে হল।

অনুপম সিনেমার ঢঙে হাসতে লাগল।

রাধারাণী মেঝের উপর বসে বললে, ভাগ্যি যাইনি, তাই আমার কুঁড়েয় আপনার পায়ের ধুলো পড়ল !

—আমি তো সামান্য ব্যক্তি। যা গান কাল আপনি গাইলেন, তাতে রাজা-মহারাজার পায়ের ধুলো পড়তেও দেরি হবে না মনে হচ্ছে।

বলে অঞ্জলির দিকে চেয়ে বললে, গান শেষ হওয়ার পরে স্বয়ং মহারাজকুমার এসে উপস্থিত। বললেন, এ মেয়েটিকে কোথায় সংগ্রহ করলেন অনুপম বাবু ? আমার ওখানেও তো একটা দিন জলসার আয়োজন করতে হয় !

রাধারাণী আর বুঝি পারে না। ওদের দৃষ্টির আড়াল হবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললে, একটু চা খেতে হবে নতুনদা। শুধু এক পেয়ালা চা। আমার ফিরতে দেরি হবে না।

রাধারাণী চলে যেতেই অঞ্জলি বললে, পাড়াগেঁয়ে বোষ্টমের মেয়ে। খুব ভড়কে গেছে।

—কি রকম ?

—এতক্ষণ সেই কথাই হচ্ছিল।

অঞ্জলি ওদের মধ্যে যে কথা হচ্ছিল, বিস্তৃতভাবে বললে। শুনে কিন্তু অনুপম কিছুমাত্র চিন্তিত হল বলে মনে হল না।

সিগারেটের ধোঁয়া আকাশের দিকে ছুঁড়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, ও কিছু নয়। এসব দুদিনে সেরে যাবে। আর একটা ফাংশন হতে দেরি। তারপর ওকে আর সাধতে হবে না। ওই আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে!

অঞ্জলির মনটা কিন্তু কাল থেকেই খুব প্রসন্ন নয়। বললে, কি দরকার নতুনদা! বোষ্টমের মেয়ে, দুর্ভিক্ষের তাড়ায় দুদিনের জন্যে শহরে ভিক্ষে করতে এসেছে। স্বামী আছে।

—থাম, থাম। দেখিছি সে লোকটাকে।

—দেখেছ?

—হ্যাঁ। কাছারীর আমতলায় একতারা বাজিয়ে ভিক্ষে করে, সেই লোকটা তো?

অঞ্জলি অস্ফুটস্বরে বললে, হ্যাঁ।

ঠোঁট বেকিয়ে অনুপম বললে, তাকে আর স্বামী বলে না। ভল্লুকের মতো চেহারা। দুদিন পরে দেখবে, রাধারাণীও ওকে স্বামী বলতে লজ্জা পাবে। কত মেয়ে দেখলুম!

অনুপম অবজ্ঞায় একটা ফুৎকার দিলে।

অঞ্জলি বললে, বাবাঃ! দরদ খুব বেশি দেখছি! আমার তো ভয় করছে।

—কেন?

—কাল তোমার বুকে রাধারাণীর এলিয়ে পড়া দেখিছি আমি।

অঞ্জলি চোখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

—যাঃ! ও কিছু নয়।

বলে অনুপম অঞ্জলির গাল দুটো টিপে দিলে।

ঠিক সেই সময় রাধারাণী দুহাতে দুপ্লেট খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। নতুনদার কাণ্ড দেখে এক পা পিছিয়ে গিয়েই আবার ভিতরে ঢুকল।

—না। না। এ আবার কি! এ ভারি অন্যায়। হ্যাঁ।

দুজনেই এক সঙ্গে বলে উঠল।

দুজনের পাশে প্লেট দুটো রেখে রাধারাণী অনুপমের দিকে মুখ করে করজোড়ে দাঁড়াল।

—না খেলে খুবই কষ্ট পাব। চা'টা নিয়ে আসি দাঁড়ান।

রাধারাণী চলে যেতেই প্লেটটা তুলে নিয়ে অনুপম সগর্বে বললে, বুঝতে পারছ ধীরে ধীরে মনটা কোন দিকে ঝুঁকছে? আমি জানি কি না। কত মেয়ে চরালুম, আমি মেয়ে চিনি না?

আত্মগৌরবে অনুপম পা দোলাতে লাগল।

ওদিকে চা তৈরি করতে করতে রাধারাণীও যেন অনেকটা আশ্বস্ত হল। বিমলারি কাছে ওদের দুজনের সম্পর্কের একটা আভাস ইতিপূর্বেই রাধারাণী পেয়েছিল। তারপরেও যেটুকু সন্দেহ ছিল, স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখার পর সেটুকুও আর রইল না। আশ্বস্ত হল এই ভেবে যে, অনুপমের কাছ থেকে তার ভয় করবার কিছুই নেই। ওর নৌকা নিরাপদ্ ঘাটে বাঁধা।

রাধারাণী চা নিয়ে আসতেই অনুপম বললে, আমি মহারাজকুমারকে কি বললাম জানেন?

সেকথা শোনবার কোনো আগ্রহ না দেখিয়েই রাধারাণী নিঃশব্দে দুজনের হাতে দুপেয়ালা চা তুলে দিল।

—আমি আর চা খাব না রাধুদি। এই মাত্র তো খেলাম।

অঞ্জলি আপত্তি জানিয়ে বললে।

—তা হোক। দুজনে পাশাপাশি বসে আর এক পেয়ালা করে খাও।

রাধারাণী হাসতে হাসতে বললে।

অঞ্জলি, মনে হল যেন, একটু লজ্জা পেলে।

কিন্তু অনুপম সহজ ভাবেই তার আগের কথার জের টেনে বলতে লাগল: বললাম, হবে। আপনার নাচমহলে গান গাইতে পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। তবে দিন পোনের সময় নোব। কেন না, আমি জানি খান পাঁচেক গান শিখতে আপনার তার বেশি সময় লাগবে না।

সভয়ে রাধারাণী চিৎকার করে উঠল : করেছেন কি।

—ঠিকই করেছি।—অনুপম সগর্বে বললে,— এ নিয়ে আমি যে কোনো লোকের সঙ্গে বাজি রাখতে পারি।

জয় রাধেকৃষ্ণ! জয় রাধারাণী!

ঘরের মধ্যে অনুপম এবং অঞ্জলি উভয়েই চমকে উঠল।

—কে রে বাবা!

—আজ্ঞে আমি।

প্রেমদাস ঘরের মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। কাল থেকে তার মন ভালো নেই। আজ আর বেশিক্ষণ আমতলায় বসে থাকতে তার ভালো লাগল না। তাই একটু সকাল-সকাল চলে এসেছে।

—বাবুমশাই, কতক্ষণ এসেছেন?

বাবুমশায়ের তখনও বিস্ময় কাটেনি। কাটিয়ে দিলে রাধারাণী। বললে, ইনি নতুনদা, এটি অঞ্জলি।

—বিলক্ষণ! আমি ওঁদের দুজনকেই চিনি। একটু চা দেবা না?

অনুপম এবং অঞ্জলি দুজনেই সকৌতুকে ওর ভাষা শুনছিল। লক্ষ্য করে রাধারাণী লজ্জা পেলে।

বললে, দেবা। কিন্তু হাত পা ধুয়ে আসবে তো।

—নিচ্চয় নিচ্চয়। কিন্তু আপনারা যে উঠলেন বাবু মশাই!—কৌতুকে প্রেমদাসের চোখ চকচক করছিল।

সে দৃষ্টি অনুপম ও অঞ্জলি সহ্য করতে পারছিল না। কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। ওরা গজ গজ করে কি একটা উত্তর দিতে দিতে উঠে গেল।

রাধারাণী চা করে এনে দিলে। প্রেমদাস তখনও মুচকি মুচকি হাসছিল। বোধকরি ওদের চলে যাওয়ার দৃশ্যটা ভুলতে পারছিল না। কেমন করে গেল ওরা! একজনের পিছু আর একজন, ঘেঁষাঘেঁষি করে!

রাধারাণী ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করলে, হাসছ যে!

—হাসি নাই!

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রেমদাস আবার বললে, একটা ভালো খপর আছে। তাই হাসছি।

—কি খবর?

—দেশে বৃষ্টিটা খুব হয়েছে।

—তাই নাকি! কার কাছে খবর পেলে?

—সে এক বিত্তান্ত!—প্রেমদাস সোজা হয়ে বসল,—আসছি, দুজন লোক আমার অ্যাগে অ্যাগে কথা বলতে বলতে যেছে। আনন্দে মনটা কি রকম যে করে উঠল, কি আর বলব.?

চোখভরা আনন্দ নিয়ে প্রেমদাস ওর দিকে চাইলে।

—তারপরে?

—সুধোলাম, মশাইদের বাড়ি কোথায় বটে?

লোক দুজন কেমন সন্দ করে আমার দিকে চাইলে। বললে, চিনবা না গো। অনেক দূর।

বললাম, বল ক্যানে? চিনতে পারি।

ওরা বললে, গীতগাঁ-গয়সাবাদ চেন?

—চিনি বই কি! আমাদের কেনারামপুরের খাড়া দখিনে। লয়?

বললে, তোমার আখড়া বুঝি কেনারামপুরে? তাই চেনা-চেনা মনে হছে বটে!

দুটো বিড়ি দিলাম। বুঝলা? সুধোলাম, দেশের খবর কি বল দেখি?

বললে, ভালো। দিন পোনেরো আগের বিষ্টিটায় কাজ হয়েছে। কারাণ হয়েছে। বীজ-ব'লিগুলো বাঁচল। নাম্‌লা হলেও মা-লক্ষী দুটি হবেন মনে হছে। মাঠে আবার গান শোনা যেছে।

প্রেমদাস রাধারাণীর দিকে চাইলে, কিন্তু উৎসাহের চিহ্ন দেখতে পেলে না কিছুমাত্র।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, ধান হবে তা তোমার কি ? তোমার কি জমি-জায়গা আছে ?

উৎসাহে আবার প্রেমদাস সোজা হয়ে বসল। উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, নাই ? মাঠে গিয়ে দাঁড়ালে দুচোখে যত জমি দেখা যায়, সবই তো আমাদের। আমরা গিয়ে দাঁড়ালেই মুঠো-মুঠো দেয়। দেয় না ?

ঠোঁট উলটে রাধারাণী জবাব দিলে, দেবেনা কেন ? ভিক্ষে দেয়।

—ভিক্ষে ! একে তুমি ভিক্ষে বল ?—তখুনি গলার স্বর নামিয়ে প্রেমদাস হেসে বললে,—ভিক্ষে করছি এখানেই। গান গেয়ে ভিক্ষে করি। লজ্জা করে। ওখানে ভিক্ষে লয়। বোষ্টমের ধান গেরস্তর গোলায় বাঁধা থাকে। আমরা মুঠ আদায় করি। ভাব তো,

—তুমি ভাব বসে বসে। আমার কাজ আছে।—বলে রাধারাণী চায়ের বাটিটা তুলে নিয়ে ঠমকের সঙ্গে চলে গেল।

ওর যাওয়ার দিকে চেয়ে প্রেমদাস মনে মনে হাসলে। এক কলকে তামাক সেজে সে নিঃশব্দে টানতে লাগল, আর বোধ করি ঢেউ-খেলান সবুজ মাঠের স্বপ্ন দেখতে লাগল।

একটু পরেই রাধারাণী আবার ফিরে এল। কাছে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল। তখনও বোধহয় প্রেমদাসের স্বপ্ন দেখা শেষ হয়নি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, নতুনদা কি জন্যে এসেছিলেন জানতে চাইলে না তো ?

স্বপ্নভঙ্গে প্রেমদাস চমকে উঠল ঃ কে এসেছিলেন ?

—নতুনদা ?

—হ্যাঁ। দেখলাম তো।

—তা তো দেখলে। কেন এসেছিলেন জানতে চাইলে না তো ?

—জানতে চাইব ক্যানে ? তিনি তো তোমার কাছে এসেছিলেন।

—তবু তো জানতে ইচ্ছে হয়।

—আমার হয় না রাধু। তোমার কাছে কে ক্যানে আসে, আমার জানতে ইচ্ছে হয় না।

—আমারও বলতে ইচ্ছে হয় না।

উদ্‌গত অশ্রু চাপতে চাপতে রাধারাণী যেন ছিটকে চলে গেল।

দশ

অনুপম কথা খুব বেশি বলে। তড়বড় করে নাকে-মুখে-চোখে কথা বলে। এবং 'সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।' কিন্তু তার এই আস্ফালনটা সত্য। পাঁচখানা গান শিখতে. রাধারাণীর দশটা দিনও লাগল না।

আশ্বিনের এই সময়টা বাংলা দেশের সব ছোট শহরেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ে। ওদের শহরেও তাই হল। এবং আমতলায় ভিজে ঘাসের উপর অতক্ষণ ধরে বসে ভিক্ষা করার জন্যেই হোক, অথবা যে কারণেই হোক, প্রেমদাসও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। অনুপমের ভয় হয়েছিল, এই নিয়ে আবার না রাজবাড়ির জলসাটা ভেস্তে যায়। কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে তা আর হল না। জলসার দিন দুই আগে প্রেমদাস পথ্য করলে।

জলসার দিন বিকেলে প্রেমদাস বাইরে একটা শতরঞ্চির উপর বসে ছিল। রাধারাণী এসে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, আমি আসছি।

প্রেমদাস নিঃশব্দে ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলে।

রাধারাণী বললে, তুমি তো যেতে পারলে না।

—না।

—কিন্তু আমার ফিরতে হয়তো দেরি হবে। তুমি যেন ঠাণ্ডা লাগিও না। সন্ধ্যে হলেই ঘরে গিয়ে শোবে।

প্রেমদাস নিঃশব্দে সায় দিলে।

—ঘরের ভেতর তোমার মুড়ি বাটিতে ঢাকা দেওয়া রইল। দুধটা

ঠাকরুণকে দিয়ে এসেছি। সন্ধ্যে হলে উনি গরম করে দিয়ে যাবেন। খেও।

প্রেমদাস আবারও নিঃশব্দে সায় দিলে।

আরও কিছু বলবার আছে কি না, কোনো বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া আবশ্যক কি না, রাধারাণী এক মুহূর্ত ভাবলে।

তারপর বললে, আসছি।

বলে দুপা গিয়েই আবার পিছিয়ে এল।

—আর জ্বরটা আসেনি তো?

প্রেমদাসের ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করে আশ্বস্ত কণ্ঠে বললে, না। গা ভালোই আছে। আসছি।

বলে হেসে এবং প্রেমদাসের কাছ থেকেও একটা ফিরতি-হাসি প্রত্যাশা করে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু প্রেমদাস তেমনি নিঃশব্দে বসে রইল দেখে চলে গেল।

অঞ্জলিদের বাড়িতে ঢুকতেই অনুপমের হাঁক-ডাক শোনা গেল। গোটা বারান্দায় সে ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছিল, কিসের জন্যে কেউ জানে না। রাধারাণীকে দেখেই চিৎকার করে উঠল: এই দেখ! ক'টা বাজে খবর রাখ?

ঘনিষ্ঠতার ফলে রাধারাণীকে আজকাল সে নাম ধরেই ডাকে। তুমি বলে।

রাধারাণী হেসে বললে, কি করে জানব? ঘড়ি তো নেই।

—যে রকম নাম-ডাক হচ্ছে, এইবারে তোমার একটা রিস্টওয়াচ দরকার।

অঞ্জলি কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বললে, তার আগে ঘড়ি দেখতে শেখাও।

কথাটা দুজনেরই খুব বিশ্রী লাগল। কিন্তু কথাটা নাকি এমনি সত্যি যে, কেউ একটা জবাব দিতে পারলে না। এই কয় সপ্তাহে রাধারাণী নিজের নামটা লিখতে শিখেছে। বাঁকা বাঁকা অক্ষরে। খুব জড়ানো-লেখা না হলে চিঠিপত্র পড়তেও পারে। কিন্তু ঘড়ি দেখতে শেখেনি।

অনুপম ওর একটা হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। বললে, তোমার জন্যে কি এনেছি দেখ।

বলে একটা টয়লেটের কাস্কেট খুলে গর্বিত ভাবে দেখালে।

রাধারাণী আড়-চোখে চেয়ে দেখলে, অঞ্জলির মুখখানা শ্রাবণের মেঘের মতো অন্ধকার। মনে পড়ল, প্রেমদাসের সেই কথাটা ঃ সন্দ। ও একটা ব্যামো। নতুনদা আর অঞ্জলির নিগূঢ় সম্পর্কের কথা ভেবে ব্যাপারটাকে ও মনে মনে উপভোগ করতে লাগল।

—কেমন জিনিস ?—ওকে চমকে দিয়ে অনুপম উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে।

রাধারাণী হাসিমুখে বললে, ভালো।

—ভালো! শুধু ভালো! এই শহরের সমস্ত দোকান খুঁজে তুমি এই জিনিস আনতে পারবে? অঞ্জলি জানে। এখানকার ক'টা লোক এর নাম জানে? খাস ফ্রান্সের জিনিস। তোমার জন্যে কলকাতা থেকে আনিয়েছি।

তারপর অঞ্জলির দিকে চেয়ে বললে, অঞ্জলি, তুমি ভাই রাধুর চুলটা বেঁধে দাও, চামেলী বোসের মতো করে। ডান দিক দিয়ে এমনি করে সাপের মতো বেঁকিয়ে·· ···তুমি তো জান।

মুখ টিপে হেসে অঞ্জলি বললে, হ্যাঁ জানি।

—হ্যাঁ। পেণ্টটা আমি করে দোব। সে আমার মাথায়ই আছে। একেবারে জেন টেলারের মতো করে। ভুরুটা,

ভুরুটা কি রকম আল্‌তোভাবে হবে কল্পনা করতে গিয়েই কথার খেই হারিয়ে ফেলে সে গুণ গুণ করে একটা পল্‌কা-নাচের সুর ভাঁজতে লাগল।

চামেলী বোসের মতো খোঁপা করতে দেরি হয়। কিন্তু তথাপি অনুপম বার বার তাগাদা দিতে লাগল ঃ তাড়াতাড়ি কর। এখুনি রাজবাড়ির গাড়ি এসে পড়বে।

একবার উঁকি দিয়েও এল। কত দেরি বুঝতে পারলে না, কিন্তু

বডিসের পাৎলা আবরণ ভেদ করে রাধারাণীর প্রশস্ত পিঠের যে রং ও রেখা ফুটে উঠেছিল, তাই দেখেই সে মুগ্ধ হয়ে গেল।

অবশেষে চুল-বাঁধা শেষ হল। এবং আরও কিছুক্ষণ পরে সুসজ্জিতা রাধারাণী সলজ্জভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

—বাঃ!

বলে বেজিতে যেমন সাপ নিয়ে খেলা করে, তেমনিভাবে অনুপম ক্ষিপ্রপদে রাধারাণীর পিছনে এসে দাঁড়াল। তখুনি পাশে, তখুনি সামনে।

বললে, বাঃ! অঞ্জলির রুচিই আলাদা! এ শহরে এমন করে সাজাবার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। চমৎকার! মার্ভেলাস!

সলজ্জ গৌরবে অঞ্জলি মুখ নামালে। রাধারাণী আড়চোখে চেয়ে দেখলে, এতক্ষণে তার মুখ প্রসন্ন হল।

প্রসাধনের পেটিকা খুলে অনুপম এবারে রাধারাণীকে ডাকলে, এস রাধু। এইখানে, এই আয়নার সামনে বস।

আরম্ভ হল রূপসজ্জা। কখনও রাধারাণীর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে, কখনও পিছন থেকে আলতো-ভাবে রাধারাণীর মাথাটা বিভিন্ন ভঙ্গিতে আয়নার দিকে ঘুরিয়ে, আরম্ভ হল সে এক পর্ব!

অঞ্জলি হেসে বললে, বেশ তো হয়েছে নতুনদা। তোমার যত বাড়াবাড়ি!

অনুপম একমনে প্রসাধন করছিল আর গুণ গুণ করে সুর ভাঁজছিল। বোধ করি পল্‌কা-নাচের সেই বিলিতি সুরটাই।

অন্যমনস্কভাবে সেই সুরটারই রেশ টেনে গুঞ্জন করলে, বাড়াবাড়ি নয়, বাড়াবাড়ি নয়। তোমাদের এই হতভাগা শহরটার মাথা আজ ঘুরিয়ে দিতে হবে যে।

—কেন? আমাদের হতভাগা শহরটা কি অপরাধ করলে?—অঞ্জলি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলে।

—করেছে।—অন্যমনস্কভাবে অনুপম উত্তর দিলে।

তারপর মাথাটা একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে হেলিয়ে তৃপ্তির একটা চুমকুড়ি কেটে বললে, নাইস্! ব্যস। যাও!

আসন থেকে দাঁড়িয়ে উঠে একটা হাঁফ ছেড়ে রাধারাণী বললে, বাবাঃ! টয়লেট তো নয়, একটা শাস্তি! ঘাড়টা ব্যথা করে গিয়েছে।

—শাস্তি! শাস্তির এখন হয়েছে কি! আসল শাস্তিই এখনও তোলা রইল। তা জান?—অনুপমের চোখটা ধারাল ছোরার মতো চকচক করে উঠল।

নিচে মোটরের হর্ণ বেজে উঠতেই অনুপম ব্যস্তভাবে বললে, দেখ তো অঞ্জলি, রাজবাড়ির গাড়ি কি না। আসবার সময় হয়েছে।

অঞ্জলি জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে বললে, মস্ত বড় গাড়ি। সেই রকমই মনে হচ্ছে যেন।

—তাহলে আর দেরি নয়। চল।—আদ্দির গিলা-করা পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়াতে চড়াতে অনুপম ওদের তাড়া দিলে।

প্রেমদাসের গোলপাতার ঘর অন্ধকার।

ছিপ ছিপ করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল এখনই। কলাগাছের পাতাগুলো থেকে টপ্ টপ্ বিন্দু পড়ছে এখনও। একটা করে দমকা হাওয়া দিচ্ছে, আর ডালিম গাছটার পাতা থেকে ঝর ঝর করে জল ঝরছে। একঘেয়ে ডেকে চলেছে ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর ডোবার ধারে ক'টা ব্যাঙ। স্ফুর্তি বেড়ে গেছে জোনাকীদের। তারা এগাছ থেকে অন্য গাছে ওড়া-উড়ি করছে আর গাছে-গাছে, ঝোপে-ঝোপে লক্ষ লক্ষ ফুলঝুরি জ্বালিয়েছে।

অনেকক্ষণ অবধি বাইরের-শতরঞ্চেই শুয়েছিল প্রেমদাস। বৃষ্টি নামতে কেমন শীত-শীত করে উঠল। তখন ঘরে গেল শতরঞ্চটা হাতে নিয়ে। দেহ অবসাদগ্রস্ত। মন যেন বরফের মতো জমাট বেঁধে গেছে। কোনোটাই নড়াচড়া সইতে পারছে না। ক'টা দিনের জ্বরের উত্তাপ যেন দেহমনের সমস্ত রস ফুটিয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

শুধু নিমীলিত ক্লান্ত দুটি চোখের উপর দিয়ে শিথিল ধারায় বয়ে চলেছে স্বপ্নের পর স্বপ্ন, অজস্র স্বপ্ন।

এই বৃষ্টিতে নতুন পুকুরের জল নিশ্চয়ই ছাপিয়ে বয়ে চলেছে। পালেদের আড়ায় ছোট ছোট মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে। আড়ার মাছ-চুরিটা কেনারামপুরে বড্ড বেশি। যুধিষ্ঠির পাল টোকা মাথায় দিয়ে সারারাত পাহারা দেয়।...

পাহারাও দেয়, পাউসের মাছও ধরে। সে কি একা? গাঁয়ের সমস্ত লোক হারিকেন হাতে মাঠময় ছড়িয়ে পড়ে। মাঠময় যেন আলোর মালা। ভাদ্র-আশ্বিনের বর্ষণমুখর রাত্রে মাঠ যেন হাসে। সেবারে প্রেমদাস পাউযে কি কম মাছটা ধরেছিল! তিন দিন ধরে খেয়েছিল। তার স্বাদ কি! সে স্বাদ শহরের মাছে কোথায় পাবে?..

চাষীদের কণ্ঠে আবার বোধ হয় গান এসেছে। মাঠে মাঠে ভিজে ভিজে কাজ করছে, তামাক খাচ্ছে, আর গান গাইছে। তান-লয়ের গান নয়, খেয়াল-খুশির গান। এই সময় এক ক্রোশ পথ যেতে তার দেড় ঘণ্টা লাগত।

চেনা নেই, জানা নেই ঃ বাবাজি, ও বাবাজি! একটু তামাক খেয়ে যাও।

প্রেমদাস যেন সেই সরল, সাধারণ মুখগুলি দেখতে পেলে। তাদের ডাক যেন শুনতে পেলে। আপন মনেই সে হাসতে লাগল। গাঁয়ে আত্মীয়তার বান বয়। চেনা জানার দরকার করে না।...

এখন মাঠময় সবুজ। শুধু সবুজ, ঢেউ খেলান সবুজের স্রোত বইছে যেন। চোখ জুড়িয়ে যায়। নালার ধারে ধারে কাশের ফুল যেন অবিশ্রান্ত নাচছে। আর শিউলির ফুল ভোর বেলায় গাছে-গাছে হীরের কুচি ছড়িয়ে রাখে। এত দিনে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভোর বেলায় শিউলির ফুল কুড়োবার ধুম পড়ে গেছে। উঃ, সে কি কাণ্ড!...

একবার, তখন প্রেমদাস খুবই ছোট, ভোরবেলায় ফুল কুড়োতে গিয়ে

কী বিপদেই না পড়েছিল! ওদের শিউলি গাছের নিচেই একটা রাজসাপ কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়েছিল। অন্ধকারে ব্যস্ত হয়ে ছুটতে গিয়ে তাকে মাড়িয়েই ও চলে যায়নি? আশ্চর্য! সাপটা কিন্তু কিছু বলেনি। শুধু সুড় সুড় করে একটা গর্তের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল। বাঁড়ুয্যে মশাই বলতেন, রাজসাপে সহজে নাকি কামড়ায় না। নিতান্ত বিরক্ত না করলে নয়। ওদের তো দুটো মুখ। যখন কেউ খুব বিরক্ত করে তখন একটা মুখ সূর্যের দিকে বলে, আমার দোষ নেই, এইবার আমি কামড়াচ্ছি। বলেই অন্য মুখ দিয়ে ছোবল দেয়। তখন ধন্বন্তরীর বাবা এলেও আর তাকে বাঁচাতে পারে না। রাজসাপে কামড়ালে আর রক্ষা নেই।

প্রেমদাস ছেলেবেলার সেই রাজসাপটাকে যেন দেখতে পেলে: কালো-সাদা বরফি-কাটা সাপটা মন্থর গতিতে এঁকে-বেঁকে গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

কোঁয়াগাছ আছে না? পুকুরের পাড়ের নিচে সারি সারি কোঁয়ার বন? পাতার ডগায়-ডগায় লাল লাল কাঁটা। কাঁটায় বিষ কী! গায়ে একবার বিঁধলে সাত দিন যন্ত্রণা থাকে। সেই কোঁয়ার বনই হল রাজসাপের বাসা। আর এক জোড়া রাজসাপ থাকত যগ্গাবতীর শিরিষ গাছের শিকড়ের ফাঁকে। প্রায়ই দেখা যেত।··

এসব কেনারামপুরের কথা নয়। ওদের গাঁয়ের, ওদের নিজেদের গাঁয়ের। যেখানে প্রেমদাস মানুষ হয়েছে, সেখানকার। কত কাল সেখানে যায়নি সে!

আর কেউটে? মাঠে মাঠে আল-কেউটে। মিশমিশে কালো, তীরের মতো ছোটে। সেবারে এই আল-কেউটে নিয়ে কেনারামপুরে কী কাণ্ড! সন্ধ্যে হলে আর কেউ উত্তর মাঠে যেত না।

তখন বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। ঠিক সূর্য ডোববার সময় হত, আর প্রত্যহ বড়-নোনার ধারে কিসের গর্জন উঠত। সে কী ভয়ানক গর্জন! কেউ ঠিক করতে পারত না কিসের গর্জন। কাছে

যেতেও সাহস করত না। শেষে দিন দশেক লক্ষ্য করে তিন্নু খাঁ ঠিক করলে, গর্জনটা আর কিছুরই নয়, সাপের। আল-কেউটে সাপের। ওইখানে ওর বাসা আছে। ডিম পেড়েছে। সন্ধ্যার মুখে লাল টকটকে সূর্য দেখে ভাবত, কী বুঝি জন্তু ওটা। ওর ডিমের ক্ষতি করতে পারে। সেই রাগে অমনি গর্জন করত। কিন্তু আল-কেউটে ধরা অসম্ভব। তিন্নু খাঁও ধরতে পারলে না। বল্লম দিয়ে মেরে ফেললে শেষ পর্যন্ত।

ওঃ! সাপের কি ওঝাই না তিন্নু খাঁ ছিল! সাপে-কাটা কম লোকের বিষ নামিয়েছে! না, ওর পূব-দুয়ারী ঘরে ঝাঁপিতে ঝাঁপিতে কম সাপটাই ছিল! কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজে সে সাপে কেটেই মারা গেল।

উঃ! কম লোকই কি প্রেমদাস এই বয়সে দেখলে! পাহাড়ের মতো মানুষ এক একটা। কোথায় যে চলে গেল!...

—প্রেমদাস কি ঘুমুলে নাকি?

ঠাকরুণের কণ্ঠস্বর। দুধ গরম করে এনেছেন বোধ হয়। কিন্তু প্রেমদাসের ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই যেন ছিল না। ঠাকরুণের ডাকে সে বিরক্তই হল।

—ঘর অন্ধকার! ঘুমিয়ে গেলে না কি ভাই?

—আজ্ঞে না। এই যে উঠিছি। আলাটা জ্বালি দাঁড়ান।

আলোটা জ্বেলে বাইরে আসতে ঠাকরুণ বললেন, তোমার দুধটা গরম করে নিয়ে এলাম ভাই। ভাবলাম, রোগী মানুষ। সকাল-সকাল দুটি খেয়ে শুয়ে পড়াই ভালো।

প্রেমদাস দেখলে, পরিপাটি করে ঠাকরুণের চুল বাঁধা। স্নো-পাউডারে মুখখানি মাজা। পরণে একখানি চওড়া কালাপেড়ে ফর্সা শাড়ি। সন্ধ্যার পরে ঠাকরুণের সাজ একখানা দেখবার মতন!

ঠাকরুণ বললে, নাৎবৌএর তো আসতে রাত হবে।

—তাই তো বলে গেল।

—হ্যাঁ। বললে কি না, খুব দামী শাড়ি পরে বিবি সেজে রাজবাড়ির মটরে করে গেল।

অন্যের মুখে রাধারাণীর প্রসঙ্গ শুনতে প্রেমদাসের আজকাল ভয় করে। কে জানে কে কি বলে বসে!

সে চুপ করে রইল।

ঠাকরুণ হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, আমি বলি কি, এই আরম্ভ, বৌকে এখন থেকেই শাসন কর।

—কার বৌকে?

—কার আবার বৌকে!—ঠাকরুণ হেসে উঠলেন,—তোমার নিজেরই বৌকে!

—আমার ও তো বৌ লয় কত্তাঠাকরুণ. বোষ্টমী।

—শোন কথা! বোষ্টমী কি বৌ নয়?—ঠাকরুণ হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

—আজ্ঞে না। আপনারা শালগেরাম রেখে, আগুণ সাক্ষী করে বিয়ে করেন। আপনারা হলেন বৌ। আর আমাদের মহাপ্রভুর নাম করে একহাত খোল বাজিয়ে মালাবদল হয়। তার নাম বোষ্টুমী। তা আজ্ঞে, মালার জোর আর কত হবে বলুন। তার জোরে তো আর শাসন করা যায় না!

ঠাকরুণ চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, তাই ছুঁড়ির এত বাড়, নয়!

—আজ্ঞে, তাছাড়া আর কি!—প্রেমদাস সহজভাবেই উত্তর দিলে।

—তাই বুঝি! তাহলে আর কি করবে বল।

ঠাকরুণ উঠলেন। বললেন, আমি এইবার উঠি ভাই। তোমার ঠাকুর-মশাইকে তো জানোই। ঘড়ি ধরে গুণছেন, ক'মিনিট হল। পড়তো তোমার বোষ্টমী এমনি একটি লোকের পাল্লায়, তাহলে দুদিনে টিট্ হত।

স্বামী-গৌরবে গর্বিত পদক্ষেপে ঠাকরুণ চলে গেলেন।

আজকের জলসাও আশ্চর্য রকম সফল হল।

আলো-ঝলমল জনসমাবেশে ওর যেন কী হয়! শহরে ঢোকবার আগে ওপার থেকে রাস্তার আলোগুলো দেখেই একদিন সে চমকে গিয়েছিল। ভেবেছিল ওখানে যাত্রা হচ্ছে বোধ হয়। সেই মেয়ে আর একদিন নিজেই প্রচুর আলোকসজ্জার মধ্যে যাত্রা করতে বসল।

যাত্রাই বটে! কিন্তু কোথায়, কে জানে!

আসল কথা, একটা বিচিত্র উজ্জ্বল পরিবেশে রাধারাণী নিজেকে হারিয়ে ফেলে। নিশ্চিহ্ন করেই হারিয়ে ফেলে। ওর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্ত। ওর চোখে কোন অজ্ঞাত লোকের স্বপ্ন নামে। যেমন করে কাচের শার্সী দিয়ে অঝোরে বৃষ্টির ধারা নামে, তেমনি করে।

তারপরে ও যে কি গায়, ও নিজেই জানে না। এমন কি শ্রোতারা যে মন্ত্র-মুগ্ধের মতো বসে শুনছে, তাও বুঝি ভালো করে ওর চোখে পড়ে না। পাখির কি পড়ে? পাখির মতো নিজের মনের আনন্দে রাধারাণীও গেয়ে যায়।

ঝিলিমিলির আড়াল থেকে রাণীমা ডেকে পাঠিয়ে নিজের হাতে তুগাছি সোনার বালা পরিয়ে দিলেন ওর হাতে। রাধারাণী প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে।

এ সব কী হচ্ছে?

কোথায় অখ্যাত কেনারামপুর গ্রাম, যার নামও কেউ শোনেনি, সেইখানকার একজন দরিদ্র বৈষ্ণবের অনাথা কন্যা সে। বুড়িদের মুখে রাজা-রাণীর গল্প শুনেছে। ভেবে এসেছে, তারা বোধ হয় সোনার থালে হীরের ভাত খান। যাত্রায় দেখেছে, রাজাদের গায়ে জরিদার মখমলের পোশাক, মাথায় হীরে-মুক্তো বসান মুকুট। কোমরে তলোয়ার। সকল সময় যুদ্ধ করেন।

সত্যিকার রাজা চোখে দেখার কল্পনাও করেনি কোনোদিন। এমনি

একটা রাজবাড়িতে রাজাদের মস্ত বড় মোটর গাড়িতে একদিন সে আসতে পারবে, অপূর্ব বেশে গান গাইবে এবং রাজার রাণী নিজের হাতে পরিয়ে দেবেন স্বর্ণবলয়, এ সে কোনোদিন স্বপ্নও দেখেনি।

বনের হরিণী কোনোদিন নগরের স্বপ্ন দেখে? বনের স্বপ্নেই তার চোখ ভরে থাকে। কিন্তু দৈবাৎ কোনো হরিণীর চোখে নগরের ঐশ্বর্য যদি আলোর কাজল পরিয়ে দেয়, কি হয় তার? কী হয় তার?

রাধারাণী কিন্তু আলোর মদে মাতাল হয়ে উঠেছে। টলছে তার পা, জ্বলছে তার চোখ। বুক? বুকও জ্বলছে কি এক রকম মধুর জ্বালায়।

এমনি অবস্থায় ফেরবার পথে সে মোটরে উঠল।

পাশে অনুপম।

গাড়ি চলতে সে ওর কাঁধের উপর একখানা হাত রাখলে। মনে হল ওর দেহটা যেন একবার কেঁপে উঠল। একটু চাপ দিতেই মনে হল ওর দেহের গ্রন্থিগুলো যেন শিথিল হয়ে গেছে। আর একটু চাপ দিতেই ওর মাথাটা অনুপমের কাঁধের উপর যেন এলিয়ে পড়ল।

সমস্ত পথ এমনি করেই চলল ওরা।

যখন রাধারাণীর বাড়ির দরজায় মোটর থামল, অনুপম ধরে ধরে ওকে নামাল। তখন ওর চোখ যেন কী রকম! সে চোখে যেন দৃষ্টি নেই। চাইছে, কিন্তু যেন দেখছে না কিছু। আচ্ছন্নের মতো, ভূতাবিষ্টের মতো।

তেমনি করে অনুপমের পিছু পিছু রাধারাণী বাড়ির ভিতর ঢুকল। স্বপ্নে যারা হাঁটে তাদের মতো।

গাড়ি চলে গেল।

অন্ধকার!

অনুপম ওর একান্ত সন্নিকটে এসে দাঁড়াল।

রাধারাণী একবার যেন কেঁপে উঠল। তখনি তার চোখ বন্ধ হয়ে এল। এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুপমের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে এলিয়ে পড়ল।

প্রেমদাসের যখন ঘুম ভাঙল, অন্ধকার তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি।

হাত বাড়িয়ে দেখলে, বিছানা খালি। রাধারাণী নেই। ভোর হয়ে আসে, সে কি ফেরেনি এখনও? কিংবা এত ভোরে, অন্ধকার থাকতেই কাজ আরম্ভ করেছে?

উদ্বিগ্নভাবে প্রেমদাস উঠে বসল।

রাধারাণীর জন্যেই দরজা সে বন্ধ করে শোয়নি। ভেজিয়ে রেখেছিল মাত্র। সে দরজা খোলা। বোধ হয় হাওয়াতেই দরজা খুলে গিয়ে থাকবে।

প্রেমদাস বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাইরে বারান্দায় একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাধারাণী সম্ভবত ঘুমিয়েই পড়েছে। তার পরিধানে একখানা মূল্যবান শাড়ি, হাতে সোনার বালা এবং মুখের পেণ্ট মলিন হলেও বোঝা যাচ্ছে।

প্রেমদাস ধীরে ধীরে ওর কাছে গিয়ে মাথাটা নেড়ে দিলে। রাধারাণী চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে প্রেমদাসকে দেখে যেন অবাক হয়ে গেল। তার স্বপ্ন কি তখনও ভাঙেনি?

স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রেমদাস বললে, দরজা তো খোলাই ছিল। ভেতরে এসে শুলেই তো পারতা।

রাধারাণী বিড়বিড় করে কি জবাব দিলে বোঝা গেল না। ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বাইরে থেকেই প্রেমদাস ওর শাড়ির খসখস শব্দ পেলে। বুঝলে, রাধারাণী জলসার পোষাক বদলাচ্ছে।

সে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তার ফিরতে দেরি দেখে মুখ ধুতে ডোবার দিকে চলে গেল।

ফিরে আসতেই রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, মুড়ি খাওনি তো?

—না।

—ঠাকরুণ দুধ গরম করে দিয়ে গিয়েছিলেন?

—হঁ্যা। খেয়েছি সেটুকু।

—তাতে কি পেট ভরে? ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। তোমার জন্যে একটু চা আর হালুয়া করে দি।

প্রেমদাস হাসলে।

—হাসছ যে!—রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে।

—তুমি কি ওখান থেকে খেয়ে এসেছিলা?

—দিয়েছিল। খাইনি।—রাধারাণী ম্লানভাবে হাসলে।

—তাহলে? খে'লা কি? ঘরে তো ঢোক নাই।

—হুঁ্যা। আমার খাওয়ার জন্যেই তো যত ভাবনা!

রাধারাণী দ্রুতপদে রান্নাঘরে চলে গেল।

গেল তো গেলই! ফেরার নাম-গন্ধ নেই। প্রেমদাসের ক্ষুধা পেয়েছিল খুবই। ওইটুকু দুধে একটা শিশুরও পেট ভরে না। মুড়ি ক'টা রাত্রে তার প্রয়োজনই ছিল। কিন্তু কেমন একটা আলস্য এসেছিল। ওগুলো বসে বসে চর্বণ করার ধৈর্য আর সে সংগ্রহ করতে পারেনি।

সুতরাং ঠুক ঠুক করে রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত হল।

গিয়ে দেখে একটা চায়ের প্লেটে খানিকটা হালুয়া আছে বটে কিন্তু চায়ের সরঞ্জাম সামনে নিয়ে রাধারাণী শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে স্তব্ধভাবে বসে।

—আবার ঘুমিয়ে গে'লা নাকি?—বাহিরে থেকেই প্রেমদাস হাঁকলে।

—অঁ্যা?—রাধারাণী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল,—চা ফুরিয়েছে।

—ফুরিয়েছে, তা বল নাই ক্যানে?

—তাই ভাবছিলাম।—করুণ কণ্ঠে রাধারাণী বললে।

—ভাবছিলা?—প্রেমদাস হো হো করে হেসে উঠল,—ভাবলেই চা এসে যাবে? আমাকে বলতে হবে না?

—তোমার তো শরীর খারাপ। ভাবছিলাম, বিমলির ভাইটা যদি আসে, তাকে দিয়ে আনিয়ে নোব।

—ভাবনার বাহাদুরি আছে !

প্রেমদাস শোবার ঘরে ঢুকে, পয়সা নিয়ে খড়ম খটাখট করতে করতে চা আনতে গেল।

কিন্তু তখনই রান্নাঘরে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, চিনি আছে তো ?

রাধারাণী এসে দোর গোড়ায় দাঁড়াল। হাসতে হাসতে বলল, আছে।

—দুধ ?

—দুধ নেই বোধ হয়। দেখি দাঁড়াও।

দেখে ফিরে এসে নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে, নাই ?

রাধারাণী ঘাড় নাড়লে।

—এ্যাই দেখ ! ভাগ্যে সুধোলাম ! নইলে আবার ছুটতে হত সেই বিন্দার দোকানে। ভালো লোক যা হোক !

প্রেমদাস গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এসে বললে, আর যেন ভাবতে বসো না। আমার ক্ষিদে পেয়েছে খুব। চোখে আঁধার লাগছে তা বলে রাখছি।

রাধারাণী ব্যস্তভাবে জিনিসগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই চা আর হালুয়া এনে প্রেমদাসের সামনে রাখলে। কাল বিলম্ব না করে প্রেমদাস অর্ধেক হালুয়া একেবারেই মুখে পুরে দিয়ে চায়ে চুমুক দিলে !

ওর খাওয়া দেখে রাধারাণী বুঝলে, খুবই ক্ষুধা পেয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে, আর একটু হালুয়া দি ?

—তোমারটা তো ? না।

—না। আমারটা নয়—আমার আছে।

—উঁহু।

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, এখন গরম জিলিপি ভাজছে না ?

—ভাজছে বই কি! ভালো কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছ। কিছু পয়সা দাও তো। তাই লিয়ে আসি। ক্ষিদে যা পেয়েছে, বুঝেছ, মনে হচ্ছে বেহ্মাণ্ড খেয়ে লি।

জিলিপি এল। প্রেমদাসের জঠর একটু শান্ত হলে রাধারাণী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, চোখে নতুন কিছু ঠেকছে না?

—লতুন আর কি আছে সংসারে! সবই পুরোণো,—থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়।

রাধারাণী হাত দুটি ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, রাণীমা দিয়েছেন কাল। গান শুনে খুশি হয়ে।

—তাই নাকি? দেখি দেখি।

প্রেমদাস খুব খুশি হয়ে উঠল। সোনার গহনা এত কাছে থেকে কখনও সে দেখেনি। হাতে করে নেড়ে-চেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু তখনই হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে বিরস বদনে বসে রইল।

—ভালো জিনিস নয়? রাণীমার নিজের হাতের বালা।

—ভালো আর হবে না ক্যানে? রাজবাড়ির জিনিস! তবে

—তবে?

—এ আমাদের কি কাজে লাগবে?

—কেন, সবারই যে-কাজে লাগে, আমাদেরও সেই কাজে লাগবে।

প্রেমদাস বললে, সবাই আর আমরা এক লই।

—কেন?

—আমরা বোষ্টম।

রাধারাণী ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, বোষ্টমরা কি মানুষ নয়, তাদের কি সাধ-আহ্লাদ নেই?

—থাকবে না ক্যানে। কিন্তু আমাদের সাধ-আহ্লাদ আলাদা।

—কী সেটা? গাঁয়ে-গাঁয়ে, দেশে-দেশে ভিক্ষে করে বেড়ান, আর বিকেল বেলায় দুটো সেদ্ধ-পক্ক খাওয়া?

—হ্যাঁ। এই দেহটাকে রাখবার জন্যে যেটুকু খাওয়া দরকার, সেইটুকু

খেয়ে বাকি সময় ভগবানের নাম করা, এই আমাদের ধম্ম। লোকে চাষ-বাস ব্যবসা-বাণিজ্য কুলিগিরি-মজুরগিরি কত কী করে। আমরা করি না। ক্যানে জান ?

রাধারাণী রেগে বললে, না।

ওর রাগ দেখে প্রেমদাস হাসলে। বললে, গোঁসাই বলতেন, ওরা বাড়ি গড়ে, আমরা ভিৎ গড়ি। ওরা তাই আমাদের বসিয়ে খাওয়ায়। ভিৎ মাটির নিচে থাকে। লোকের চোখে পড়ে না। কিন্তু বাড়িটাকে ভিৎই ধরে থাকে। আমরা সমাজের বাইরে লই। আমরাও সমাজের কাজই করি।

কথাটা রাধারাণী ভাববার চেষ্টা করলে ! এ রকম কথা জীবনে সে এই প্রথম শুনছে না। নানা মহোৎসবে নানা গোঁসাই-এর মুখে এবং ওদের নিজেদের আখড়াতেও বড় বড় বৈষ্ণবের মুখে এ রকম অনেক কথাই শুনেছে। বুঝেছে যে তখনও খুব বেশি, তা হয় তো নয়। কিন্তু ভক্তিনম্র চিত্তে কথাগুলো ভাববার চেষ্টা করেছে। এবং যতটুকুই বুঝেছে, সেটুকু বিনা প্রশ্নে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজে লাগাবার চেষ্টাও করেছে।

কিন্তু শহরে এসে সেই মন ও হারিয়ে ফেলেছে। মনে তার প্রশ্ন জেগেছে। দ্বন্দ্ব এসেছে।

বললে, দুগাছা সোনার বালা পরলেই আর সেই কাজ করা হয় না ?

—না। তাতে আসক্তি আসে যে !

আসক্তি শব্দটা, অশিক্ষিত হলেও, ওদের কাছে শক্ত কিছু নয়। আসক্তি আর নিরাসক্তি ওদের ধর্ম-আলোচনার দুটো প্রধান বস্তু। ছেলেবেলা থেকেই শুনে শুনে শব্দ দুটো ওদের আয়ত্ত হয়ে থাকে।

রাধারাণী বললে, কেন আসক্তি কি আমাদের কোথাও নেই ?

—থাকবে না ক্যানে। কিন্তু থাকতে নাই।

তারপর বললে, আর কী আসক্তি বা আছে ? আমাদের আছেই বা কি ! কেনারামপুরের আখড়া ? ছেড়ে তো এসেছি। যাদের জমি-

জায়গা, ঘর-বাড়ি আছে, তারা পারে নাই। সেইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে, তবু গাঁ ছাড়ে নাই। আমরা ছেড়েছি। আবার এখানকার এই গোলপাতার কুঁড়ে, কাজ ফুরোলে এও ছাড়ব। বিষয় থাকলেই আসক্তি থাকে।

প্রেমদাস দাড়ির ফাঁকে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

রাধারাণী অন্যমনে কি যেন ভাবছিল। সেটা সোনার বালার কথা, না এই গোল পাতার কুঁড়ে ছাড়ার কথা কে জানে। হয়তো দুটোই। কেন না এই মুহূর্তে ও দুটোই আলোচনার পাকে পাকে জড়িয়ে গেছে। এই আলোচনায় সবই যেন পাক খাচ্ছে। অন্যমনে নিজের শাড়ির প্রান্তটাও রাধারাণী তার আঙুলে পাকে পাকে জড়াচ্ছে।

প্রেমদাস বললে, গোঁসাই বলতেন : যা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবা না, তা সঞ্চয় কোর না। রাধু, সোনার বালা কি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবা ?

রাধারাণী চুপ করে রইল।

প্রেমদাস আবার বললে, পরকালের কথা ছেড়ে দাও, আমাদের কেনারামপুরেই কি ও বালা নিয়ে যেতে পারবা ?

—পারব না কেন ?

—পারবা না। বোষ্টুমীর হাতে সোনার বালা দেখে লোকে হাসবে। হয়তো সন্দ করবে।

—সন্দ করবে কেন ?—রাধারাণীর ললাটে ভ্রূকুটি দেখা গেল।

প্রেমদাস হো হো করে হেসে উঠল : সন্দ করবে ক্যানে! সন্দ কি কারণে করে ? স্বভাবে করে।

রাধারাণীর বুকের ভিতরে একটা স্ফুলিঙ্গ অনেকক্ষণ থেকেই টিপ টিপ করছিল। সেইটে দপ্ করে জ্বলে উঠল :

—ও! তাই বল! সন্দ! এতক্ষণে মনের কথা বেরুল! বালা দেখে তুমিও বুঝি আমাকে সন্দ কর ?

—না।

—ক্যানে মিছে কথা বলছ ?

অনেক দিন পরে রাধারাণীর কথায় দেশের টান এসেছে। লক্ষ্য করে প্রেমদাস হাসলে।

বললে, আমি তো কখনই মিছে কথা বলি না। তুমি তো জান।

—না, বল না! তুমি বড় সাধু! ঠাকুরের কিরে করতে পার ?

প্রেমদাস হেসে বললে, তুমি রেগে গিয়েছ রাধু। রাগের মাথায় কেনারামপুরের ভাষা বেরুছে। শোন, সন্দ আমি খালি নিজেকে করি। রেতের বেলা শুয়ে শুয়ে খালি নিজের মনের অলি-গলি হাংরে বেড়াই। কোথাও সোনার বালা, কি ছাইয়ের গাদা কিছু জমছে কি না। আর কাকেও সন্দ করি না। তোকেও না।

এবারে রাধারাণীও হেসে ফেললে, বললে, আমি না হয় রেগেই গিয়েছি। অনেক দিন পরে মুখ থেকে কেনারামপুরের ভাষা বেরুল। কিন্তু তুমি যে অনেক দিন পরে তুই-তোকারি করলা, সেটা খেয়াল আছে ? সেটা কিসের মাথায় ? রাগের মাথায় লয় ?

প্রেমদাস কি রকম একটা আশ্চর্য ভঙ্গিতে হাসল। সে হাসিতে রাধারাণীর সমস্ত শরীর যেন শিরশির করে উঠল।

ওর মাথাটা আস্তে করে নেড়ে দিয়ে প্রেমদাস বললে; না রে! অনুরাগের মাথায়।

বলে গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল :

ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নাহি পারি,
অনুরাগে জলে ডুবেছিনু।
আমি অনুরাগে জলে ডুবেছিনু ॥

এগারো

শরীরের জন্যে প্রেমদাস এখনও ভিক্ষায় বেরুতে পারে না। দুপুর বেলা ঘরেই থাকে। রাধারাণী তার কাছে লেখে, পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়াও করে, ভাবও করে। এমনি করে দিনটা যে তার মন্দ কাটে, তা নয়।

তবু অঞ্জলিদের বাড়ি যাবার জন্যে মাঝে মাঝে মনটা উসখুস করে। ক্রমাগত অনেকদিন ধরে গানের বৈঠক চলেছিল ওদের বাড়ি। সেই বৈঠকের নেশা সহজে কাটবার নয়। কাটেওনি এখনও। পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়া ভুল হয়ে যায়। লিখতে লিখতে কলম থেমে যায়। ঝগড়া করতে করতে ঝগড়ার খেই হারিয়ে ফেলে। সব সময় ওর মনে মন থাকে না।

অনুপমের পায়ের শব্দের জন্যে কদিন থেকেই ও উৎকর্ণ হয়ে ছিল। পাঁচটা বেজে যায় যখন, যখন বোঝে আর ও আসবে না, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘরের কাজে মন দেয়। প্রেমদাস বাড়িতে রয়েছে। এই সময় অনুপম যে আসেনি, এতে ও বেঁচে যায়।

কিন্তু অনুপম আসে না-ই বা কেন? রাজবাড়ির অত বড় সাফল্যের পরের দিনই তো ওর হৈ হৈ করে আসার কথা। সে কি খবর নিয়েছে যে, প্রেমদাস দুপুরে আজকাল বাড়িতেই থাকে? সেই জন্যেই আসে না? কিন্তু তাহলে অঞ্জলি একাও তো আসতে পারত। সেও তো আসে না কই!

অবশ্য অনুপমের যাওয়া-আসার পথের নক্সা দেবতারাও জানেন না। এতই অস্থির, এতই চঞ্চল এবং এতই খামখেয়ালী সে।

আশ্চর্য! সেই দিনের পর থেকে বিমলাও এ-বাড়ি আসা ছেড়ে দিয়েছে। রেগে গেছে। কিন্তু শুধু রাগ নয়, রাধারাণী বুঝতে পারে,

এর মধ্যে হিংসাও আছে। কিন্তু কার উপর হিংসা করে? অঞ্জলির উপর? কেন? কাউকেই ওর হিংসা করার কি আছে?

সে আসে না অনেকদিন থেকেই। কিন্তু তার ভাইটা আসত, গোপাল। একটু স্নেহ, একটু আদর, কি দু'এক পয়সার তেলেভাজার বিনিময়ে ফাই-ফরমাসটাও খাটত। কদিন থেকে সেও আসছে না। কেন আসছে না, কে জানে। অসুখ-বিসুখ হতে পারে। শহরে অসুখটা হচ্ছেও খুব। কিন্তু ওর বিশ্বাস, বিমলাই ওকে আসতে দিচ্ছে না;—এবং হিংসাতেই।

নানা চিন্তায় রাধারাণীর মনটা ছটফট করতে লাগল।

ওদের পাতকুঁয়াটা প্রায় রাস্তার ধারে, বাঘভেরেণ্ডার বেড়ার কোলে। বিকেলে জল তুলতে গিয়ে ও যেন গোপালের গলা পেল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলে, গোপালচন্দ্রই বটে। খালি গায়ে, খালি পায়ে একটা ছেঁড়া কালো রঙের হাফ-প্যাণ্ট পরে ওর সমবয়সী একটি বন্ধুর সঙ্গে কলহ করছে। বেড়ার ধারে গিয়ে রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, কার সঙ্গে ঝগড়া করছিস রে?

গোপাল গ্রাহ্যই করলে না। সেই ছেলেটার উদ্দেশে বীরদর্পে ঘুঁসি উঁচিয়ে ভেংচি কাটলে।

রাধারাণী আবার জিজ্ঞাসা করলে, কে রে ছোঁড়াটা?

অপস্রিয়মান ছেলেটার দিকে একটা অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি হেনে বললে, কে জানে!

রাধারাণী হেসে বললে, জানিস না তবু ঝগড়া করছিস! হ্যাঁরে, আমাদের বাড়ি আর আসিস না কেন রে?

মাটিতে প্যাচ্ করে খানিকটা থুতু ফেলে গোপাল শুধু বললে, না।

—কেন রে! কাউকে দিয়ে যে দুটো তেলেভাজা আনব, এমন ছেলে পাই না। সেদিন ওদের বাড়ির ছেলেটাকে দিয়ে আনালাম, তা সে মুখে দেওয়া যায় না। বিচ্ছিরি!

রাধারাণী নাক সেঁটকালে।

রাস্তার ওপার থেকেই গোপাল বললে, ও বিষ্টুর দোকান থেকে নেয়।

—তাই হবে।

রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে গোপাল আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলে। এবং সেটা লুফতে লুফতে বললে, কেষ্টর দোকানে মশলা বেশি দেয়।

মুখভার করে রাধারাণী বললে, শুনে আর কি হবে বল্? তুই তো এনে দিবি না। তোর দিদি তো তোকে আমাদের বাড়ি আসতে মানা করেছে!

দিদির নামে গোপাল কি রকম চনমন করে উঠল। এদিক-ওদিক সতর্কভাবে একবার চেয়ে নিয়েই সুড়ুৎ করে ওদের বাড়ি ঢুকে পড়ল।

রাধারাণীর কাছে এসে হাত পেতে বললে, কই দাও পয়সা। এনে দিই।

—আয় আমার সঙ্গে।

বলে রাধারাণী কলসী কাঁখে নিয়ে ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল।

পিছু পিছু আসতে আসতে গোপাল বললে, তুমি ভুল বুঝেছ রাধুদি। দিদি আমাকে মানা তো করে নি।

—তবে আসিস না কেন?

—তুমি কি কিছুই শোন নি?

উদ্বেগে রাধারাণী থমকে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ফিরল। জিজ্ঞাসা করলে, না। কি হয়েছে রে?

গোপাল আপন মনেই বলল, কেউ জানে না। সেইজন্যে মা আমাকে কারও বাড়ি যেতে মানা করেছে।

অধৈর্যের সঙ্গে রাধারাণী বললে, কি হয়েছে আগে তাই আমাকে বল্।

কাঁচুমাচু করে গোপাল বললে, দিদি তো এখানে নেই।

—কোথায় গেছে ?

গোপাল একটুখানি দ্বিধা করলে। তারপর বললে, কাউকে বোলো না যেন রাধুদি। বলবে না তো ?

—না। বলব না, তুই বল।

অঞ্জলিদের বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে গোপাল বললে, ওদের বাড়ির সেই নতুনদা আছে না, তারই সঙ্গে কোথায় চলে গেছে।

রাধারাণীর সমস্ত দেহটা ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। কাঁখের কলসীটা তাড়াতাড়ি মাটিতে নামিয়ে রেখে পাংশুমুখে বললে, সে কি রে!

—হ্যাঁ।

—কি করে জানলি নতুনদার সঙ্গে গিয়েছে ?

—চিঠি লিখে রেখে গেছে যে!

—চিঠি লিখে রেখে গেছে!

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি আনতে দেবে, শিগগির দাও রাধুদি। মা হয়তো এক্ষুনি আবার খুঁজবে আমাকে।

রাধারাণী টলতে টলতে ঘরে এসে একটা দুয়ানি এনে ওকে দিলে।

দুয়ানিটা উলটে পালটে দেখে নিয়ে গোপাল গম্ভীরভাবে বললে, দুয়ানি আজকাল খুব জাল হচ্ছে। দেখে নেওয়া ভালো। বল, কি আনতে হবে।

ভিজে কাপড়েই রাধারাণী রান্নাঘরের মেঝের উপর বসে পড়ল। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না।

বললে, যা হয় আনিস।

—তাহলেও তুমি বলবে তো ?

শুষ্ক কণ্ঠে রাধারাণী বললে, ওটা তোকেই দিলাম গোপাল। তোর যা ইচ্ছে হয়, কিনিস।

গোপাল অবাক হয়ে গেল। রাধারাণীর এত বড় বদান্যতার পরিচয়

সে এর আগে কখনও পায়নি। পিছনে তার তাড়া ছিল। পাছে কারও বাড়ি যায়, কোনো সূত্রে এই লজ্জাকর কথাটা প্রকাশ করে ফেলে, সেজন্য তার মা সব সময় তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। গোপাল সেজন্যে সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে আছে।

কিন্তু রাধারাণীর মুখের দিকে চেয়ে কিছুই আর তার মনে রইল না। শান্ত ছেলের মতো সে রাধারাণীর পাশে এসে বসল।

বললে, তুমি দিদিকে বড্ড ভালোবাসতে, না রাধুদি? দিদিও তোমাকে খুব ভালোবাসত। মা সারারাত শুয়ে শুয়ে চুপি চুপি কাঁদে। সারা রাত আমিও ঘুমুতে পারি না। দিদি কেন চলে গেল রাধুদি? মা তো তাকে কিছু বলেনি।

ওকে রাধারাণী বুকে টেনে নিতেই ও ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। বিমলা চলে যাওয়ার পরে এই ওর প্রথম কান্না।

দুদিন রাধারাণী ধৈর্য ধরে রইল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, অঞ্জলি এর মধ্যে অবশ্যই আসবে। দুদিনের পরেও যখন অঞ্জলি এল না, তখন তার মনে দুটো সন্দেহ জাগল। প্রথম, বিমলার অন্তর্ধানের সে হয়তো খবরই রাখে না। কিছুই বিচিত্র নয়। পাশের বাড়ি হলে কি হবে, বিমলার সঙ্গে ইদানিং তার ভাব তো ছিলই না, বরং যেন বেশ রেষারেষিই ছিল। হয়তো অনুপমকে নিয়েই রেষারেষি।

"দাদা না হাতী! দিনরাত হাসির শব্দ শুনি। দাদার সঙ্গে অত হাসির কথা কি থাকে, জানি না ভাই। আমাদেরও তো দাদা আছে।"

বিমলার দাদা যদিচ সত্য সত্য নেই। আছে শুধু বিধবা মা আর ছোট ভাই গোপাল। একতলা বাড়িখানা নিজেদের। তার এক-খানা ঘরে ওরা থাকে। বাকি দুখানা ভাড়া দিয়েছে। সেই টাকায় অতি কষ্টেই ওদের দিন চলে। মেয়েটা পড়াশুনায় নিতান্ত খারাপ ছিল না। কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফি-এর টাকা যোগাড় করতে না পারায় আর পরীক্ষা দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু সে যাই হোক, ওর সেদিনের হিংসায় কুটিল মুখভঙ্গি রাধারাণীর মনে পড়ছে। সেই থেকে ও ওদের ছায়া মাড়াত না। অথচ অঞ্জলির সঙ্গে বরাবর ওর খুবই বন্ধুত্ব ছিল। ইদানিং অঞ্জলিও যেন ওকে এড়িয়েই চলত। সুতরাং হতে পারে, অঞ্জলি ওব পলায়নের খবর রাখে না।

দ্বিতীয়, অঞ্জলি হয়তো খবর রাখে, কিন্তু অনুপম এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলে এ নিয়ে আলোচনা করতে চায় না। অসম্ভব নয়।

কিন্তু রাধারাণী এইটে ভেবে পায় না যে, অঞ্জলি কি অনুপম আর বিমলার সম্পর্কের কথাটা এত কাছে থেকেও ঘুণাক্ষরে জানতে পারেনি? এত বোকা মেয়ে তো অঞ্জলি নয়।

সর্বক্ষণ এই একটা চিন্তা রাধারাণীকে পেয়ে বসেছে। যত ভাবে, কোনো দিকে কূল কিনারা না পেয়ে ততই হাঁপিয়ে ওঠে।

এই অবস্থা বেশি দিন সহ্য করা সকল মেয়ের পক্ষেই অসম্ভব। রাধারাণীর পক্ষে আরও। সে স্থির করে ফেললে, বিকেলের দিকে অঞ্জলির কাছে একবার যেতেই হবে। নিজে থেকে সে কিছুই জিজ্ঞাসা করবে না। অঞ্জলি যদি ইচ্ছা করে বলে, ভালোই। না বললে, শুধু শুধুই ফিরে আসবে।

এই শহরটায় আশ্বিনের সকালটা মন্দ লাগে না। সোনামাখা রোদে পথ-ঘাট, বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা সবই যেন ঝক ঝক করতে থাকে। কিন্তু বিকেলটা কেমন-কেমন: ম্লান রোদে, কেমন একটা হাওয়া ওঠে, সমস্ত শরীর শিরশির করে।

রাধারাণীরও ভালো লাগছিল না। তবু ভাবছিল, শাড়িটা ছেড়ে একবার অঞ্জলিদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসা দরকার।

এমন সময় চুপি চুপি গোপাল এল।

—কিরে গোপাল?

—দিদি যাবার সময় যে চিঠিটা রেখে গেছে, মা সেটা কোথায় রেখেছে জানি। দেখবে সেটা?

রাধারাণী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। সাগ্রহে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ। নিয়ে আয় না! আমি প'ড়েই আবার এক্ষুণি ফেরৎ দোব।

—কিন্তু তুমি কাউকে কিছু বলবে না তো?

—না, না। কাউকে না। তুই নিয়ে আয় না ছুটে।—ছোটবার জন্যে রাধারাণী ওকে একটা ধাক্কা দিলে।

কিন্তু গোপাল ছোটবার কোন লক্ষণই দেখালে না। তার শিশুবুদ্ধিতে এইটুকু সে বুঝেছে যে, রাধুদির কাছে দিদির সব কথা বলা যায়। যদিও সে নিজেই বুঝতে পারছেনা, নতুনদার সঙ্গে দিদি যদি কোথাও গিয়েই থাকে, তার জন্যে কাঁদবার কি আছে, ঢাকবারই বা কি আছে? এমন কি কেউ যায় না? তবু ঢাকাঢাকি যখন চলছেই, তখন সেটা মেনে চলাই ভালো। সুতরাং যদিও তার বিশ্বাস রাধুদিকে চিঠিটা দেখানো চলে, তবু নিঃসংশয় হওয়া ভালো।

বললে, তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর আগে।

রাধারাণী ওর গায়ে হাত দিয়েই দিব্যি করে বললে, হল তো। এইবার যা।

গোপাল তখন তার ছেঁড়া হাফপ্যান্টের পকেট থেকে একখানা চিঠি বার করলে। মস্ত বড় চিঠি। অনেক ভাঁজ-করা, মলিন। বোধ হয় বিমলার মা দিনরাত্রির মধ্যে বহুবার, সুযোগ পেলেই, পড়েন। পড়েন আর কাঁদেন।

রাধারাণী চিঠিখানা ছোঁ মেরে তার হাত থেকে কেড়ে নিলে। এবং তৎক্ষণাৎ পড়তে আরম্ভ করে দিলেঃ

বিকাল ৫টা

শ্রীচরণকমলেষু

মাগো! বিদায়!

এই পত্র যখন পড়িবে, তখন আমি আর তোমার কাছে নাই। সকালে উঠিয়া কোথাও খুঁজিয়া যখন আমাকে পাইবে না, তোমার মনটা

হাহাকার করিয়া উঠিবে,—তোমার কাছ ছাড়া হইয়া আমিও তখন তোমার জন্য হাহাকার করিতেছি।

মা'গো, কখনও তোমার কাছ ছাড়া হইয়া থাকি নাই। কি করিয়া থাকিব, ভাবিতেও বুকের ভিতরটা কি রকম করিয়া উঠিতেছে। মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেছি যে, মেয়েদের একদিন তো বাপ-মা ছাড়িয়া অপরিচিত বিদেশে যাইতেই হয়। সবই সহিয়া যায়। কিন্তু আমার মতো এমন করিয়া কয়জন হতভাগিনীকে চলিয়া যাইতে হয়? আমার কি সহিবে? আবার ভাবিতেছি, না সহিলে মরণের পথ তো কেহ আটকাইয়া রাখে নাই! মরণের পথ সর্বত্রই খোলা।

তাই বলিয়া মনে করিও না, আমি মরিবার জন্যই যাইতেছি। না, বাঁচিবার ইহা ছাড়া আর কোনো পথ পাইলাম না বলিয়াই যাইতেছি। শিশুকালে বাবাকে হারাইয়াছি। আমাদের দুটি ভাই-বোনকে সকল দুঃখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছ। কিন্তু অনাথা বিধবার সামর্থ্য তো বেশি নয়। সুতরাং তোমার চেষ্টার পরেও দুঃখের কোনো অভাব ঘটে নাই। সেই দুঃখে দেহ ও মন বেশ শক্ত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সহজে মরিব না। মরিবার ইচ্ছা লইয়াও যাইতেছি না। তবে যাহার সঙ্গে যাইতেছি, তাহার উপর নির্ভর তো করা যায় না। তাই মরিবার ইচ্ছা না থাকিলেও মরণের কথা বার বার মনে আসিতেছে। অঞ্জলির নতুনদা অনুপম বাবুকে তুমি জান। আশ্চর্য লোক! এমন লোকের সঙ্গে মরিতে যাইতেও ভরসা হয় না।

অথচ এমনই বিধাতার পরিহাস, এই লোকটার সঙ্গেই তিনি আমার জীবন ও মৃত্যু বাঁধিয়া দিলেন! বোকা মেয়েতেও এমন লোকের সঙ্গে পথে বাহির হয় না। আমিও হইতাম না। কিন্তু বিশ্বাস কর, ইহা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। নিরুপায় হইয়াই আমি অন্ধকারে ঝাঁপ দিলাম।

গত দুই মাস ধরিয়া আমি অনেক ভাবিয়াছি, শুধু নিজের কথাই নয়,

তোমার এবং গোপালের কথাও। দেখিয়াছি, তোমাদের কিছুই আমি করিতে পারিতাম না। ফি-এর অভাবে ম্যাট্রিকুলেশন দেওয়া হইল না। দিলে পাশ করিতাম নিশ্চয়ই। ক্লাসে আমার চেয়ে অনেক খারাপ মেয়ে পাশ করিয়া গিয়াছে। পাশ করিলে যদি আর নাও পড়িতাম, মাস্টারি করিয়া দুই-একটা মেয়ে পড়াইয়া তোমাদের সংসারে কিছু সাহায্য করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহাও হইল না। সুতরাং বাড়িতে থাকিলে চিরজীবন তোমাদের গলগ্রহ হইয়া থাকা ছাড়া অর কিছুই করিতে পারিতাম না। তার চেয়ে এ কি ভালো নয়?

তোমার শরীর না-খাইয়া, আধপেট-খাইয়া ক্রমেই জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। চোখে দেখিয়া কোনো মেয়ের পক্ষেই চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব। আমিও পারিলাম না। অনুপমবাবু লোক ভালো নয়। তাহার মাথায় সুবুদ্ধির চেয়ে দুর্বুদ্ধিই বেশি আসে। তাও কখন কি দুর্বুদ্ধি আসে কেউ বলিতে পারে না। কিন্তু এই ধরণের লোক বোকা হয়, একটু উদারও হয়। নইলে এ রকম কাজ কেউ করেনা। উহার সেই বোকামি এবং উদারতার সুযোগ আমি লইয়াছি। কথা দিয়াছেন, কয়েকদিনের মধ্যেই রেজেস্টাবি করিয়া আমাদের বিবাহ হইবে। অবশ্য উহার কথায় বিশ্বাস কিছু নাই, সে আমি জানি। বিবাহ হইতে পারে, না হইতেও পারে। যদি না হয়, কি করিব জানি না। তবে এ কালা-মুখ তোমাকে আর দেখাইব না, তাহা নিশ্চয়। আর যদি হয়ও, নিজের পায়ে দাঁড়াইবার ক্ষমতা না থাকিলে এমন লোকের সঙ্গে নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে ঘর করা যায় না, তাহাও বুঝিয়াছি। মনে মনে স্থির করিয়াছি, এবারেই প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটা দিয়া দিব। দেওয়া আমার পক্ষে তেমন কঠিন কিছু হইবে না। আশা করি পাশ করিয়া যাইব। মনে করিয়াছি, বাঁধন শক্ত থাকিতে থাকিতে যত দূর পড়া যায় পড়িতে হইবে। নহিলে ভবিষ্যতে বিপদে পড়িব।

মাগো, অনেক দুঃখ পাইয়াছি বলিয়াই এত বড় দুঃসাহসী কাজে ঝাঁপ দিতে পারিতেছি। আমি পারিতেছি বলিলেও ভুল হইবে। কে যেন আমার ঘাড়ে ধরিয়া এই কাজ করাইতেছে। এখন পর্যন্ত আমার সাহসের অন্ত নাই। তুমি তো জান, সাহস আমার চিরদিনই বেশি। শুধু তুমি চোখের জল ফেলিও না মা। তুমি অভিশাপ দিও না। নিশ্চয় জানিও, তোমার মুখ আমি হাসাইব না।

তোমার মুখে শুনিয়াছি, বাবা নাকি জুয়া খেলিতেন। জুয়া খেলিয়াই নাকি তিনি সর্বস্বান্ত হন। আমার অদৃষ্টে কি আছে জানি না। কিন্তু রক্তে আমার জুয়ার নেশা আছে, বেশ টের পাইতেছি। এই নেশা হয় আমাকে ফকির করিবে, নয় রাজা করিবে। যাহাই করুক, তাহাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। জুয়াড়ির মনে অফুরন্ত আশা থাকে, প্রবল সাহস থাকে। আমারও আছে। যাহা হইবার হইবে, আমি ভয় পাই না।

সকল কথা তোমাকে বলা যায় না। বলিতে পারিলামও না। যদি কখনও দিন আসে, সাক্ষাতে বলিব। আর যদি জানাইবার মতো কিছু ঘটে, পত্রে তোমাকে জানাইব। পত্র না পাইলে বুঝিবে, জানাইবার কিছু নাই। তাহাতেও ভয় পাইও না। ভয় পাইবার আছেই-বা কি ! নিতান্ত ছোট মেয়ে তো নই।

আমার প্রণাম নাও, মাগো, আমার অসংখ্য প্রণাম নাও। ইতি—

সেবিকা কন্যা

বিমলা

চিঠিখানা গোপালের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে রাধারাণী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার মনে পড়ল বিমলার মুখের সেই কথা : "বাধা আবার দেবে কি! তুমিও যেমন! ছেলেটা ফাজিল-ফক্কর হতে পারে। কিন্তু চাল-চলন দেখে মনে হয়, রোজগার করে। সুতরাং বিনাপয়সায় মেয়েটা যদি পার হয়ে যায় তো যাক না।"

'চাল-চলন দেখে মনে হয়'। ওর নিজেরই মনে হয়। রাধারাণী বুঝলে এ বিমলার নিজেরই মনের কথা। এবং বিনাপয়সায় নিজেকে পার করবার জন্যে এই কাণ্ড নিজেই করে বসল। অঞ্জলির চেয়ে ওর পার হওয়ার প্রয়োজন তো কম নয়।

অনুপম যে উদার, এ বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যে বোকা, বোকা হতে পারে, বোকার মতো কাজ করে ফেলতে পারে, এ সন্দেহ একদিনও ওর মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে অনুপম চালাক, চতুর, আশ্চর্য রকম চটপটে।

বিমলাকেই মনে হয়েছে হাবা গঙ্গারাম! কিছু জানে না, কিছু বোঝে না। ক্যাবলা কান্ত! যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। সে যে অঞ্জলির মতো মেয়েকে ডিঙিয়ে ঘাস খেতে পারে,—শুধু খাওয়া নয়, তার মুখের ঘাস মাথায় করে নিয়ে সরে পড়তে পারে, – এ যেন ধারণার অতীত।

অঞ্জলিকে সে একবার দেখতে যেতে পারে। এ আঘাত কেমন তার বেজেছে, কী সে করছে, কি করতে চায়, – একবার জানা দরকার। বস্তুত অঞ্জলির জন্যে ওর মন সমবেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

আজকেই যেতে হবে। এখনই। গা ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে তৈরি হয়ে নিয়ে রাধারাণী বেরুতে যাবে, এমন সময় অঞ্জলি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল।

—এস, এস। কী ভাগ্যি! মনে মনে তোমার নাম করছিলাম, এমন সময় তুমি এলে! অনেক দিন বাঁচবে।

—যাও। বাজে কথা বোলো না। – অঞ্জলি হাসতে হাসতে বললে।

—সত্যি। এই আমি তোমাদের বাড়িই যাচ্ছিলাম। এতদিন আসনি কেন বলতো? তুমিও না, নতুনদাও না। কি অপরাধ করেছি তোমাদের কাছে?

অঞ্জলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে রইল। বললে, নতুনদা তো এখানে নেই।

—তাই নাকি ? কবে গেলেন ? কোথায় গেলেন ?

—কোথায় গেলেন তা তো জানি না রাধুদি। রাজবাড়ির জলসার পরের দিন, কি তার পরের দিনই, চলে গেছেন।

—আশ্চর্য ! আমার সঙ্গে একবার দেখা করেও গেলেন না ? আচ্ছা !

রাধারাণী চমৎকার অভিনয় করছে !

—বোধ হয় তার সময় পাননি।—অঞ্জলি ঠোঁট টিপে হাসলে।—তুমি কি কিছুই জান না ?

—না !

অঞ্জলি বললে, সেই জন্যেই এতদিন আসিনি। কিন্তু ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। আর জানাজানি হলে দোষ নেই। তাই এলাম।

আর অভিনয়ের প্রয়োজন নেই।

রাধারাণী সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ে হয়ে গেছে ? কি করে খবর পেলে ?

—নতুনদার চিঠি এসেছে। কিন্তু কাদের বিয়ে জান তুমি ?

—জানি। নতুনদা আর বিমলা।

—তবে যে ভাণ করছিলে,

—হ্যাঁ। ভাণই করছিলাম। কবে চিঠি পেলে ?

—একটু আগে। নতুনদা চিঠি দিয়েছেন। ওর মায়ের মুখ দেখে মনে হল তিনিও চিঠি পেয়েছেন। এক জাত তো নয়। রেজেস্টারি করে বিয়ে হয়েছে।

—তাই বুঝি !

দুজনেই নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে রইল।

হঠাৎ রাধারাণী বললে, বিমলার সঙ্গে নতুনদার যে চেনা ছিল, তাই আমার ধারণা ছিল না।

—না। যদিও আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তবু ভাব ওর সঙ্গেই সব চেয়ে আগে।

— তারপরে তোমার সঙ্গে ? — রাধারাণী একটা কটাক্ষ হানলে।

— হ্যাঁ। তারও পরে তোমার সঙ্গে।

অঞ্জলি আরও কি বলতে যাচ্ছিল, রাধারাণী হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরলে : আঃ কী বাজে কথা বল !

তার পরে সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু হঠাৎ নিয়ে পালিয়ে গেলেন কেন ?

— উপায় ছিল কি ! — অঞ্জলি ফিস ফিস করে বললে — বিমলা মা হতে চলেছে যে !

— তাই নাকি।

— হ্যাঁ ! নতুনদা এদিকে তো খুব উদার।.. মনটাও নরম। স্থির করে ফেললে, বিয়ে করবে। বিমলাও রাজি হয়ে গেল। পরদিন দুজনে সরে পড়ল।

আশ্চর্য কাণ্ড !

— তুমি জানতে এ সব ব্যাপার ? — রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে।

— সেইদিনই জানতে পারলাম, পালাবার আগে যখন নতুনদা সব কথা আমাকে বললেন। নতুনদার সে কী কান্না রাধুদি ! পাষাণও গলে যায়।

— তুমি বাধা দাওনি ?

— না। দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু নতুনদার কান্না দেখে দিইনি।

— আমরা ভাবতাম তোমার সঙ্গেই নতুনদার বিয়ে হবে।

অঞ্জলি চুপ করে রইল।

ওর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কষ্ট হচ্ছে না ? সত্যি বল।

অঞ্জলি ধীরে ধীরে বললে, দুদিন কষ্ট হয়েছিল। এখন ভাবি এ ভালোই হয়েছে। মাও তাই বলেন।

— কেন ?

অঞ্জলি হাসলে। বললে, কেন, তুমি জান না?

—না।—রাধারাণীর দুই চোখে আগ্রহ যেন জ্বলছে।

অঞ্জলি বললে, এরা প্রজাপতির জাত। এদের ভালোবাসা যায়, কিন্তু বিয়ে করা যায় না। মাও তাই বলেন।

রাধারাণী অবাক। ভালোবাসার পরিণতিই তো বিবাহ। পল্লী-সমাজের এই সংস্কার যার রক্তের মধ্যে রয়েছে, অবাক হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

বললে, সে আবার কি! যাকে ভালোবাসা যায়, বিয়ে তো তাকেই করে।

—না। সব ক্ষেত্রে নয়। রাধুদি, ওটা তোমাদের পাড়াগেঁয়ে সেকেলে সেন্টিমেণ্ট! (রাধারাণী সেন্টিমেণ্টের মানে জানে না।) আমরা, একালের মেয়েরা (যদিও অঞ্জলি তিন বছর ক্লাস এইট্-এ রয়েছে।) ওটা বিশ্বাস করি না।

ঝড় উঠেছে। ঢেউগুলো উত্তাল হয়ে উঠেছে নদীতে। রাধারাণী যেন সেই নদীর মধ্যে পড়ে গেছে। কূলও পাচ্ছে না, তলও পাচ্ছে না।

জিজ্ঞাসা করলে, ভালোবাসব একজনকে, ঘর করব অন্যের, সেটা কি রকম হবে?

—মন্দ কি হবে?—অঞ্জলি ক্রমেই রেগে যাচ্ছিল বোধ হয়,—যেমন ধর তুমি। তুমি ঘর করছ বাবাজির, কিন্তু ভালোবাসো নতুনদাকে।

—অসুবিধা কি?

রাধারাণী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলে, আমি তো নতুনদাকে ভালোবাসি না। কে বললে তোমাকে?

—বাস না?—অঞ্জলি ভ্রূকুটি করলে,—আমি যেন শুনেছিলাম,

—ভুল শুনেছিলে। মিথ্যে শুনেছিলে। কোনোদিন ভালোবাসিনি। কক্ষনো না।

অঞ্জলি হতচকিত হয়ে গেল। অনুপম এমন কথা কোনো দিন বলেনি অবশ্য। হাবভাবে তার নিজেরই এ সন্দেহ হয়েছিল। সেটা অবশ্য একেবারে গেল না। তবু চুপ করেই রইল।

রাত্রে এই ঘটনা রাধারাণী প্রেমদাসকে বললে।

এতদিন বলেনি। বলা ঠিক হত না। এখন ওদের তো বিয়ে হয়ে গেছে। বললে কোনো ক্ষতি নেই। তাই বললে।

শুনে প্রেমদাস একটু হাসলে। বললে, তাই হয়।

—কেন ?

—গোঁসাই বলতেন, অরণ্যের অভিশাপ।

—সে আবার কি ?

—অরণ্য জান না ?

—জানি। বন। কিন্তু অভিশাপ কিসের ?

—বন কেটে মানুষ লগর বসায়। মরে যাবার আগে সেই বন অভিশাপ দিয়ে যায়। শহর তাই বেশিদিন বাঁচে না। এই গড়ছে, এই ভাঙছে। শহরের মানুষ তাই সুস্থ হতে জানে না। দেখ না খালি ছুটছে। ছুটছে আর হোঁচট খেছে। পা দিয়ে রক্ত ঝরছে, তবু ছুটছে। আচ্চয্যি শহরের মানুষ !

প্রেমদাস হাসতে লাগল।

বললে, ওদের দিকে তাকিও না। ওদের ওই হবে। তুমি একটু চা কর দিকি। শরীরটা এখনও তেমন জুৎ হল না।

বারো

স্টেশন পর্যন্ত বিমলা আশ্চর্য সাহস এবং স্ফূর্তি দেখালে। অনুপম যে অত শক্ত ছেলে, তারও বুক কাঁপছিল। গলা শুকিয়ে আসছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম-ঘর মফঃস্বল-শহরের স্টেশনে খালিই থাকে প্রায়। এদিনও ছিল। সেখানে বিমলাকে বসিয়ে রেখেও অনুপম

যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। টিকিট চাইতে গিয়ে শিয়ালদহ নামটাই যেন তার গলা থেকে বেরুচ্ছিল না। অনেক কষ্টে বলতে পারলে।

ট্রেন আসবার সময় পর্যন্ত তার তর সইছিল না। ট্রেনের সময় যেন আর হয় না। বার বার ঘড়ি দেখে। বারবার কপালের ঘাম মোছে। মুহুর্মুহু সিগারেট ধরায়, আর একটু টেনেই ফেলে দেয়। কোনো নিরীহ যাত্রী, প্রশ্ন করা দূরে থাক, কাছে এসে দাঁড়ালেই, চমকে ওঠে। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে।

ওর এই অবস্থাটা বিমলা টের পেলে কি না বলা যায় না। কিন্তু মাঝে মাঝেই সে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়, ওর দিকে চেয়ে হাসে, কখনও বা হাত-ইসারায় ডেকে টুকিটাকি ফরমাস করে।

অবশেষে ট্রেন এল। একখানি নির্জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ওরা উঠল। দরজা ভিতর থেকে নিরাপদভাবে বন্ধ করে, জানালার শার্শিগুলো তুলে দিয়ে অনুপম শেষবার রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলতেই বাঁশী দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলে।

অকস্মাৎ চাকা ঘুরে গেল।

একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলে অনুপম এতক্ষণে হাসলে। আর ধরা পড়ার ভয় নেই। কিন্তু বিমলার মুখের চেহারাটা যেন সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। সমস্ত মুখে রক্তের চিহ্ন রইল না। চলে গেল? তাদের শহরের স্টেশনটাকে আর দেখা যাবে না? কোনোদিন না?

অথচ এই স্টেশনটাকে জীবনে ক'বারই বা দেখেছে? দু-একবার দেখেছে, সেও তার বাবার জীবিতকালে। একবার তার ছোট মাসীর বিয়েতে যেতে হয়েছিল ট্রেনে চড়ে। তখন তার বয়স তিন কি চার। এ কাহিনী সে শুনেছে মাত্র। তার মনে কিছুই পড়ে না। আর একবার, এইবারকার কথাটাই অল্প অল্প মনে পড়ে, তার বড় মামার বিয়েতে। তখন তার বয়স নয় কি দশ।

তা ছাড়া স্টেশনের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই তার ছিল না। অবশিষ্ট

জীবন কেটেছে শহরের এঁদো গলিটার মধ্যে সেই একতলা জীর্ণ বাড়িতে। শহরের সঙ্গেই তার সম্পর্ক, বলতে গেলে, স্কুলে যাওয়া আর আসা। নয়তো কখনও কখনও সিনেমায় যাওয়া। প্রথমটা নিত্য, দ্বিতীয়টা নৈমিত্তিক।

অথচ এমনি মানুষের মন. গোটা শহরটার সঙ্গেই যেন তার মনের একটা নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। এবং শহর বলতে শুধু অনেকগুলো রাস্তা এবং তার উপর অসংখ্য বাড়ি বুঝত না। তার মনের মধ্যে শহরটা ছিল নাম-রূপে। তাই শহরের বাইরে, শহর থেকে অনেকটা দূরে, এই যে স্টেশন, যেহেতু এরও গায়ে শহরের নামটা লেখা, সেই হেতু এটাও তার আত্মীয়-পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠেছিল; এবং যে মুহূর্তে সেই স্টেশনটা তার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, অমনি তার বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার করে উঠল।

কোথায় চলেছে সে?

শহরের ঐ ছোট্ট গলি, তার মধ্যে ভাঙা একতলা বাড়ি, তার মধ্যে বিধবা মা আর ছোট ভাইটি, এই ছিল পৃথিবী। সেই পৃথিবী ছেড়ে কোথায় চলেছে সে? কোথায় কলকাতা? কে আছে সেখানে? দুঃখের দিনে, বিপদের মুহূর্তে, একফোঁটা সহানুভূতির জন্যে কারও মুখের দিকে চাইতে পারে, এমন কেউ আছে সেখানে? অথচ দুঃখ বিপদ তো আসতেই পারে। অনুপমের সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানে সে? বরং এই অব্যবস্থিত-চিত্ত, তরলমতি লোকটির সম্বন্ধে যতটুকু সে জেনেছে, তাতে দুঃখ এবং বিপদের জন্যে তৈরি থাকাই উচিত। সেদিন ঘরে ফেরার পথও সে নিজের হাতে বন্ধ করে এল!

এত কথা, যদিও এরকম সুশৃঙ্খলে নয়, প্রায় তাল-গোল পাকিয়ে হুড়মুড় করে তার মস্তিষ্কে, তার বুকের মধ্যে ঢুকে যেন একটা ঝড় বাধিয়ে দিলে।

তাই ধাবমান ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর নিরাপদ রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে বসে অনুপম যখন হেসে বললে, বিছানা তো নেই, ওদিকের বেঞ্চটায় শুয়ে

পড় বরং, তখন 'মাগো' বলে বিমলা সেই বেঞ্চটার উপর লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অনুপম অবাক হয়ে গেল।

বরাবর, বিশেষ করে গত কয়েক ঘণ্টায়, বিমলার যে পরিচয় সে পেয়েছে, তাতে তার মনে হয়েছে অসম্ভব শক্ত এই মেয়েটা। সত্যকথা বলতে গেলে, সে বিমলাকে ঘরের বার করেনি, বিমলাই তাকে এই কাজে বাধ্য করেছে। যদিও কোনোদিন এর জন্যে যদি তাকে রাজদ্বারে দাঁড়াতে হয়, কোনো বিচারকই এই নির্জলা সত্য কথাও বিশ্বাস করতে চাইবেন না। তবু এ সত্য। এবং এই ঘটনায়, অথবা দুর্ঘটনায়, এইটেই একমাত্র সত্য।

আশ্চর্য, একটু আগেও স্টেশনের বিশ্রাম কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বিমলা হেসেছে, হাত-ইসারায় ডেকেছে, তাকে সাহস দিয়েছে। ভয় পেয়ে গিয়েছিল অনুপমই। আর চলতি ট্রেনের কক্ষে বসে অনুপম যেই একটু সাহস পেলে, একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল, অমনি সেই বিমলাই ভেঙে পড়ল!

এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে!

অনুপম ধীরে ধীরে ওর শিয়রে এসে বসল। বললে, কাঁদছ কেন?

তার কণ্ঠে যেন একটু বিরক্তিরই আভাস।

বিমলা সাড়া দিল না। বরং স্পর্শ পেয়ে আরও জোরে জোরে কাঁদতে লাগল।

—কাঁদছ কেন? কাঁদবে যদি তো এলে কেন? আমি তো তোমাকে আনিনি।

বিমলা তবুও সাড়া দিলে না।

কারণটা কি হতে পারে একটু ভেবে নিয়ে অনুপম জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে তোমার ভয় করছে বিমলা? আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে অনুপমের মনে জাগল করুণা। কত অসহায়

এই মেয়েটি এ :ন ! তার কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে এল। ওর মাথার চুলে অনুপম হাত বুলোতে লাগল।

বিমলা সাড়া দিলে না। কিন্তু ওর স্পর্শে যেন একটু শান্ত হল।

কিছুক্ষণ দুজনেই নিঃশব্দে নিজের নিজের কথা ভাবতে লাগল।

তারপরে বিমলা উঠে বসল। ওর দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে সকাতরে বার বার বলতে লাগল: তোমাকে বিশ্বাস করে ঘর ছাড়লাম, আমাকে যেন পায়ে ঠেল না গো, আমাকে যেন পায়ে ঠেল না।

তার কাতরতায় অনুপমের চোখ ছল ছল করে উঠল। মনে হল, তাকে যেন একটু একটু ভালোবাসতে পারছে। মনে হল, এই অসহায় মেয়েটিকে ভালোবাসা হয়তো সম্ভব হবে।

গাঢ় কণ্ঠে বললে, বিশ্বাস কর, তোমার সমস্ত দায়িত্ব আমি নিলুম। কলকাতা পৌঁছে যত শিগগির পারি তোমাকে আমি বিবাহ করব।

বিমলার চোখ তখনও জলে টলমল করছে। ওর চোখের দিকে চেয়ে তারও মনে হল, একে বিশ্বাস করা হয়তো অসম্ভব হবে না।

শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে বিমলা হতচকিত হয়ে গেল।

কত লোক ! কত ভিড় ! কত ঠেলাঠেলি, হৈ চৈ !

এবং সর্বপ্রথম যে কথা তার মনে হল, তা এই যে, এই ভিড়ের মধ্যে যদি অনুপম হঠাৎ সরে পড়ে, মাথা খুঁড়লেও আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এবং তৎক্ষণাৎ অনুপমের এক-খানা হাত সে খপ্ করে ধরে ফেললে।

অবিশ্বাসের কথাটা অনুপম ধরতে পারলে না। ভাবলে, ভিড় দেখে ভড়কে গিয়েই ও তার হাত চেপে ধরেছে। মনে মনে একটু সে হাসলেই বোধ করি। কিছু না বলে ওর হাত ধরে একটা ট্যাক্সিতে এনে তুললে।

ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর একখানা ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে অনুপম থাকত। দুখানা ঘরের ফ্ল্যাট। একটা চাকর ছিল, সব কাজ সে করত।

অনুপম কলকাতায় থাকুক, আর না থাকুক, এই ফ্ল্যাট এবং চাকরটি থাকত।

বিমলা দেখে খুশি হল, ঘর তুটি সুসজ্জিত।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে—সুমুখের ঘরটি বসবার ঘর। সোফা দিয়ে সাজান। পরেরটি শয়নকক্ষ। সেখানে চমৎকার খাট, আলমারি এবং টেবিল রয়েছে। সেই ঘরেই একটা টেবিলে ও খায়।

বিমলা অস্বচ্ছল ঘরের মেয়ে। সুসজ্জিত ঘর দেখে তার খুশি হবারই কথা।

ওর খুশিভরা চোখ দেখে অনুপম জিজ্ঞাসা করলে, ঘর পছন্দ হয়েছে তো?

—হ্যাঁ।

—একটু সবুর কর না, বরও পছন্দ হবে।

অনুপমের এখন ফেরবার কথা ছিল না। একে এই আকস্মিক প্রত্যাগমন, তার উপর সঙ্গে একটি তরুণী। অনুপমের কাছে অনেকদিন রইলেও চাকরটা বিস্মিতভাবে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

তার দিকে ফিরে অনুপম বললে, বাথরুমে সাবান আর তোয়ালে দে।

চাকরটা চলে যেতে বিমলাকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ট্রাঙ্কে কাপড়-জামা তো রয়েছে।

কুণ্ঠিতভাবে বিমলা জবাব দিলে, আছে তু-একখানা।

পোশাকী শাড়ি ওর নেই বললেই চলে। তবু ওরই মধ্যে যে তু-একখানা পরে সে বাইরে বেরোয় তা নিয়ে এসেছে।

অনুপম বললে, ঠিক আছে। তুমি স্নান সেরে এস। তারপরে চা খেয়ে একটু গড়িয়ে নাও। সারারাত্রি অনেক ধকল গেছে।

—আর তুমি?

—আমি একটু বেরুব।

—স্নান করবে না? চা খাবে না?

—চা বাইরেই খেয়ে নোব। ফিরে এসে স্নান করব। তুমি কিছু ভয় পেও না। এ বাড়ি আমারই। চাকরও আমার।

বলেই অনুপম ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল।

বিমলা হাসল। অনুপমের বিশেষ কিছু অবশ্য সে জানে না। কিন্তু এই ব্যস্তবাগীশ স্বভাবটা জানে।

চাকরটা এসে বললে, বাথরুমে সাবান তোয়ালে দেওয়া হয়েছে।

শাড়ি-সায়া হাতে নিয়ে বিমলা স্নান করতে চলে গেল।

স্নানান্তে বিমলা অনেকখানি সুস্থ হল।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নাম কি?

—রাঘব।

—তোমার দেশ কোথায়?

—আজ্ঞে, উড়িষ্যা। আপনার চা আনি?

—আন।

রাঘব একটা ট্রে'তে করে টি-পট, কাপ, চিনির পাত্র, দুধের পাত্র নিয়ে এসে টিপয়ের উপর রেখে চলে গেল। অনুপমের চালচলন কেতাদুরস্ত। বিমলাকে একটু ভাবতে হল। সব পাত্রগুলো পরীক্ষা করে ব্যাপারটা বুঝলে এবং এক পেয়ালা চা তৈরি করে রাঘবকে ডাকলে।

জিজ্ঞাসা করলে, রাঘব, তোমার বাজার করা হয়েছে?

—এইবার যাব আজ্ঞে।

—রাঁধ তুমিই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আজ আমিই রাঁধব।

—আপনি রাঁধবেন!

রাঘবের বিস্ময়ের আর শেষ নেই। অনুপমের এই ফ্ল্যাটে অনেক মেয়েকে সে আসতে দেখেছে। কত প্রজাপতি মার্কা মেয়ে। তারা এসেছে, খেয়েছে, কলহাস্যে উচ্চকিত করে তুলেছে। কেউ কেউ কদাচিৎ রাত্রিযাপনও করে গেছে। কিন্তু রাঁধবার আগ্রহ কেউই কখনও প্রকাশ করেনি। বরং তাদের মুহুর্মুহু ফরমাসে রাঘব বিব্রত হয়ে উঠেছে।

এই মেয়েটি কোথা থেকে এসেছে, কেনই বা এসেছে, কিছুই সে জানে না। তার আগে আরও যারা এসেছিল, তাদের সম্বন্ধেও কিছুই সে জানত না। এই রকমের মেয়ে ক্রমাগত আসা-যাওয়ার ফলে এ সম্বন্ধে তার কৌতূহলও জাগত না! কিন্তু এর সম্বন্ধে তার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল।

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বিমলা অত্যন্ত সহজ ভাবেই জবাব দিলে, হ্যাঁ। তুমি সুক্তর তরকারি কিছু এন।

শেষের কথাটা রাঘব যেন শুনতেই পেলে না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বাবু রাগ করবেন না তো?

—না। রাগ করবেন না। তুমি যাও।

ট্রে তুলে নিয়ে রাঘর চিন্তিত মুখেই চলে গেল। কে জানে, বাবু রাগবেন কি না। মেয়ে মানুষ এসে রাঁধতে চায়, এমন কাণ্ড সে কখনও দেখেনি।

বিমলা রান্না করতে বসল। রাঘব তরকারি কোটে, বাটনা বাটে, হাতের কাছে এটা-ওটা এগিয়ে দেয়। আর দুজনে গল্প করে।

একটু একটু করে ছেলেটার কাছ থেকে অনেক সংবাদ সে সংগ্রহ করলে : এ বাড়িতে অনুপম কতদিন রয়েছে, রাঘবই বা কতদিন, আত্মীয়-স্বজন কেউ আসে কি না, তারাই বা কখন আসে, রাঘব তাদের কারও নাম জানে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ বাড়িতে এর আগে যে মেয়েরা এসেছে বিমলা যে তাদের থেকে

স্বতন্ত্র, সেকথা বুঝতে রাঘবের বিলম্ব হল না। তারা হৈ হৈ করে আসে, যতক্ষণ থাকে কলহাস্যে ঘর তরঙ্গিত করে তোলে, তারপর আবার এক সময় হৈ হৈ করতে করতেই চলে যায়। তাদের ব্যবহার উদ্ধত, উন্নাসিক। রাঘবকে তারা মানুষ বলেই মনে করে না। হয়তো তাকে লক্ষ্যই করে না।

কিন্তু বিমলার ব্যবহার একেবারে ঘরোয়া। কৌলিন্যের গন্ধ মাত্র নেই! এ ব্যবহার মনকে স্পর্শ করে।

যে মেয়েরা আসে, তাদের কারও নামও জানে না। শুনে থাকলেও মনে নেই। জানলেও বিমলার কাছে তাদের কথা না বলাই উচিত ছিল। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে ওর মন এমনই বিরূপ হয়ে ছিল যে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্নটার বার দুই পুনরাবৃত্তি করতেই ও শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললে।

বিমলা জানতে চাইলে, অনুপম কি খেতে ভালোবাসে।

এইবারে রাঘব মুস্কিলে পড়ল।

রান্না সম্বন্ধে অনুপমের কোনো পছন্দ আছে কি না, রাঘব আজও পর্যন্ত বুঝতে পারেনি। হয় তার রান্নাই এমন হয় যে, তার মধ্যে পছন্দ করা শক্ত। নয়তো খাওয়া সম্বন্ধে তার রুচি বলে কিছু নেই। পাতের কাছে যা দেওয়া হয় তার কিছু খায়, কিছু ছোঁয়, কিছু বা ফেলে রেখে চলে যায়। অনেকদিন রান্না হলেও বাড়িতে খায়ই না। হয়তো বাইরে থেকে খেয়ে আসে, নয় ক্ষুধা নেই বলে শুয়ে পড়ে। কোনো কোনো দিন সকালে বেরিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন ফেরেই না। অনেক রাত্রে মাতাল হয়ে ফেরে, তখন আর খেতে বসার অবস্থাই থাকে না।

শুনে বিমলার চোখ কপালে উঠল: এই মানুষের সঙ্গে ঘর করবে কি করে? একে স্বাভাবিক অবস্থায়ই বা আনবে কি করে?

এই সব গল্পের মধ্যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দে চমকে উঠে রাঘব বললে, আজ আমাদের ভাগ্য ভালো, বাবু সকাল-সকাল ফিরেছেন!

ব্যস্তভাবে সে দরজা খুলতে গেল।

অনুপম এসে দেখলে, বিমলা কোমরে কাপড় জড়িয়ে রান্নাঘরে। তার মুখ উনানের আঁচে আরক্ত। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞসা করলে, এ আবার কি!

বিমলার রান্না হয়ে গিয়েছিল। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে সহাস্যে বললে, রান্না করছিলাম।

—কি দুঃখে?

বিমলা আবারও হাসলে। বললে, কেন, মেয়েরা কি দুঃখেই রান্না করে বলে তোমার ধারণা? তার বেশি কিছু নেই?

—কি জানি!

তখনও অনুপমের বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, এত দেরি করলে যে!

—দেরি!—হাসতে হাসতে অনুপম শোবার ঘরের দিকে গেল। তার পিছু পিছু বিমলাও।

জামাটা খুলে আলনায় রাখতে রাখতে অনুপম বললে, বিয়ের রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়েছিলাম।

নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিমলা ওর দিকে চাইলে, যার অর্থ, তার পরে?

অনুপম বললে, গোড়ার ব্যবস্থা করে এলাম। বিয়ের নোটিশ দেওয়া হল। কয়েক দিন পরেই বিয়ে হবে।

তিন আইনের বিবাহ সম্বন্ধে বিমলার কোনই ধারণা নেই। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ধপ্ করে ক্লান্তভাবে খাটের উপর বসে পড়ে অনুপম বললে, আজকেই ওখানে না গেলেও চলত। কিন্তু নিজের ওপর আমার বিশ্বাস নেই। আরম্ভের পর্বটা সেরে এসে মনে মনে স্বস্তি বোধ করছি।

অনুপম হাসতে লাগল। কিন্তু সেই হাসির মধ্যে পরিতৃপ্তির চিহ্ন নেই।

বিমলা বললে, রান্না হয়ে গেছে। আর দেরি কোর না। স্নান করে এস। আমি ভাত বাড়ছি। কটা বাজে খেয়াল আছে?

—বেশি বাজেনি। মোটে বারোটা।

—বারোটা কি কম হল?

—না তো কি! রাঘবকে জিগ্যেস করলেই জানতে পারবে. বারোটার মধ্যে কদিন খেয়েছি।

বিমলা হেসে বললে, জিগ্যেস করেছি। কিন্তু এখন থেকে ওসব আর চলবে না বলে দিচ্ছি। ঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া করতে হবে। নইলে শরীর টেঁকে? নাও ওঠ।

—সর্বনাশ! বাঁধা নিয়ম আমার কোনদিন সহ্য হয় না।

—এখন থেকে হবে। দেখ না।—বিমলা অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসলে।

অনুপমকে উঠতে হল।

যথারীতি ওদের বিবাহ হয়ে গেল।

তিন আইনের বিবাহের সুবিধা এই যে, দিন-দেখা, কোষ্ঠী বিচার, নাপিত-পুরোহিত, বরযাত্রী, বাসরের হাঙ্গামা নেই। বিবাহের রেজিস্ট্রার যথারীতি অফিস করেন। গিয়ে দাঁড়ালেই হল। বিবাহে বর-কনে দুজনেরই সম্মতি আছে এইটে জেনেই তিনি দলিল রেজেস্ট্রী করে দেন।

অনুপম এতে কোনো অসুবিধা বোধ করলে না। কিন্তু বিমলার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। মন্ত্রপাঠ নেই, কিছু নেই, এ যেন কেমন-কেমন। অনুপমের ক'টি বন্ধু সঙ্গে গিয়েছিল সাক্ষী হিসাবে। তারাও হাসতে লাগল। কোট-পেন্টুলুন-পরা পুরোহিত!

সমস্ত দিনটা হুল্লোড়েই গেল।

রেজিস্ট্রেশন, তারপরে গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেলে লাঞ্চ, তারপরে সিনেমা।

সন্ধ্যায় যখন ফ্ল্যাটে ফিরল, দুজনেই ক্লান্ত।

স্নান এবং প্রসাধন সেরে একখানি সাদা আটপৌরে শাড়ি পরে বিমলা এসে দাঁড়াল, অনুপম তখন খাটে শুয়ে পড়েছে।

—একটু চা খাবে?—বিমলা জিজ্ঞাসা করলে।

—না।

—কফি?

—দাও।

এতক্ষণে অনুপম চোখ মেলে চাইলে। একটু হাসলেও।

কফির কথা বলে এসে বিমলা খাটের কাছে একখানা চেয়ার টেনে এনে বসল।

অনুপম বললে, বিয়ের পর্ব চুকল। তোমার ওপর অবিচার করার ভয় আর রইল না। সে পথ বন্ধ হল।

বিমলা হেসে বললে, এখন আবার অবিচারের জন্যে অনেক নতুন পথে খুলে গেল, বিয়ে না হলে সে পথ বন্ধ থাকত।

—সে কথাও ভেবেছ?

—ভাবতে হচ্ছে। আমি ছাড়া আমার কথা ভাববার আর তো কেউ নেই এখন?

—আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার না। না?

বিমলা প্রশ্নটার ঘুরিয়ে জবাব দিলেঃ তুমি তো নিজেই নিজেকে বিশ্বাস কর না।

—তা করি না সত্যি।—অনুপম চিন্তিতভাবে বললে।

কফি এল। অনুপম উঠে বসে একটা পেয়ালা তুলে নিলে।

বললে, তবু অবিশ্বাস করেও এক সঙ্গে জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। কী ভয়ানক!

বিমলা এর আর উত্তর দিলে না।

অনুপম জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবে কাটাবে তা কিছু ভেবছে?

—কিছু কিছু ভাবছি।

—কিছু স্থির করেছ ?

—ভাবছি, লেখাপড়া শিখব।

অনুপম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলে। বললে, কি রকম ?

—ভাবছি, এখনও তো সময় আছে। তুমি যদি বই কিনে দাও, তাহলে ম্যাট্রিকুলেশনটা দিই! পড়াশোনায় আমি খারাপ ছিলাম না। একটু খাটলে পাশ করে যেতে পারি।

কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে অনুপম বললে, দোবো। কালকেই সব বই পেয়ে যাবে।

বলেই তখনই হেসে ফেললে। বললে, কিন্তু ও ব্যাপারটা ?

বিমলা ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলে না। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, কোন ব্যাপারটা ?

—প্রসূতি সদনের ?

বিমলার মুখ হঠাৎ কালো হয়ে উঠল। চোখ নামিয়ে এক মুহূর্ত কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল। এই মুহূর্ত যে একদিন আসবে, তা সে জানত। তবু তার জন্যে যেন প্রস্তুত ছিল না। এ প্রশ্ন যখনই তার মনে এসেছে, তখনই এড়িয়ে গেছে। মনকে প্রবোধ দিয়েছে, সে হবে এখন। কিন্তু কি যে হবে, কি যে হতে পারে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতেও ভয় পেয়েছে।

ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। হাত যোড় করে বললে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

অনুপম অবাক : কি ব্যাপার!

– আমি তোমাকে মিথ্যে বলেছি।

বিমলা সন্তানসম্ভবা নয় তাহলে! তাকে মিথ্যা কথা বলেছিল! অথচ এই কাল্পনিক সন্তানের মা হওয়ার লজ্জা থেকে কুমারী মেয়েকে রক্ষা করবার জন্যে সে নিজের সমস্ত জীবন নষ্ট করলে!

অনুপম খুশি হবে, কি রাগ করবে ভেবে পেলে না। জিজ্ঞাসা করলে, কেন এই মিথ্যের আশ্রয় নিলে ?

অনুপম রাগ করলে না দেখে বিমলা একটু সাহস পেলে। জলভরা চোখেই একটা ভ্রূকুটি হেনে বললে, তা ছাড়া তোমাকে পাওয়ার আর কোনো উপায় ছিল ?

সত্যি।

একথা না বললে অনুপম কখনই এত বড় দুঃসাহসিক কাজে হাত দিতে পারত না। হাত দিতে চাইতই না।

জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু তুমি কি ভাব, আমি তোমাকে ভালোবাসি ?

স্পষ্ট কণ্ঠে বিমলা উত্তর দিলে, না।

— আমার বিশ্বাস তুমিও আমাকে ভালোবাস না।

উত্তরটা দিতে বিমলা দ্বিধা করতে লাগল।

অনুপম জেদের সঙ্গে বললে, বল। সব কথা স্পষ্ট করে বল। মিথ্যে বোলো না। আমাকে অবস্থাটা বুঝতে দাও।

বিমলা বললে, ঘর করবার জন্যে মেয়েমানুষের সব সময় ভালোবাসার দরকার হয় না।

— তুমি ঘর করবার জন্যে এসেছ শুধু ?

ক্লান্ত স্বরে বিমলা বললে, আর কি ? গেরস্ত ঘরের কুমারী জীবনে কত জ্বালা তুমি তো জানো না।

অনুপম অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তেরো

পূজা কেটে গেল। ঢাকের বাদ্যে, মাইক্রোফোনের চিৎকারে, লোকজনের কোলাহলে শহর পাগল হয়ে উঠেছিল। পরিপূর্ণ উন্মাদনার পর তার এল পরিপূর্ণ অবসাদ। তারই ছাপ পড়েছে নাগরিকের মুখে চোখে।

প্রেমদাস কোথায় যেন বেরিয়েছে। আজকাল তার একটা আড্ডা হয়েছে অবধূতের দোকানে। ওর মুদিখানার দোকানের একপাশে

একখানা বেঞ্চ আছে। সেইটের উপর বসে ওদের তামাক চলে, আর গল্প চলে।

রাধারাণীর ভালো লাগে না। সে আপত্তি করে। তার মেলামেশা ভদ্র পরিবেশে। কিন্তু প্রেমদাস যেন সেই পরিবেশটাকেই এড়িয়ে চলে। রাধারাণীর কল্যাণে শহরে যে মর্যাদা ওদের হয়েছে তাতে, একখানা মিহি ধুতির উপর একটু ভালো লংক্লথের পাঞ্জাবি চড়িয়ে ও স্বচ্ছন্দে শহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে চলা-ফেরা করতে পারে। কিন্তু রাধারাণী সেকথা বললেই ও ভয়ে চোখ কপালে তুলে বলে উঠবে: ওরে বাবা! আমি মুরুক্ষু মানুষ। বাবু মশায়দের সঙ্গে··· তুমি পাগল হয়েছ!

না। ওর বন্ধু চায়ের দোকানের বলাই, মাথায় করে মনোহারী জিনিস ফেরি করে বেড়ায় রামু আর অবধূত। তাদের সঙ্গে গল্প করেই ও সুখ পায়।

বিকেলের দিকে সেইখানেই গিয়েছিল। আর রাধারাণী পা ঝুলিয়ে দাওয়ায় বসে ছিল।

শেষ শরতের গাছের পাতা থেকে একটা সোঁদা গন্ধ বেরোয়। গন্ধটা ভালো নয়, কিন্তু কেমন একটা নেশা ধরায়। বোধ করি সেই নেশাতেই আচ্ছন্ন হয়ে রাধারাণী নিঃশব্দে বসে ছিল।

এমন সময় একটি ছোট ছেলে এসে একখানা চিঠি দিয়ে চলে গেল। বেশ মোটা খামের চিঠি। আটা দেওয়া। ডাকে এসেছে। কিন্তু তার কাছে নয়, অন্য কারও কাছে। রাধারাণী অবাক হয়ে গেল। চিঠি তাদের বড় একটা আসে না। কে দেবে? ওদের চিঠির উত্তর এলোকেশী দিয়েছিল একবার।

বিস্মিত রাধারাণী মুখ তুলে চাইলে। কিন্তু ছেলেটি চলে গেছে তখন। চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল। মুক্তার মতো ঝরেঝরে হাতের লেখা। গড়গড় করে পড়া যায়।

১৮, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা
বিজয়া দশমী, ১৩৫০

স্নেহের রাধু,

এতদিন তোমাকে চিঠি দিইনি। সাহস করিনি বলেই দিই নি। কিন্তু আজ বিজয়ার দিনে তোমার জন্যে মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে। কেবলই তোমার কথা মনে হচ্ছে। তোমাকে আশীর্বাদ জানাবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তাই চিঠি লিখলুম, তোমার ঠিকানায় নয়, একটি বন্ধুর ঠিকানায়। সে নিশ্চয় যথা সময়ে তোমার হাতে চিঠিখানা পৌঁছে দেবে।

আমার শুভবিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও আশীর্বাদ নাও।

কত কথা তোমাকে বলার আছে। কিন্তু সেই দীর্ঘ কাহিনী শোনার তোমার ধৈর্য আছে কিনা জানি না। থাকে পোড়ো, না থাকে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিও। আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হব না।

প্রথমত, তোমাদের কাউকে কিছু না বলে, কারও সঙ্গে দেখা না করে হঠাৎ চলে আসায় তোমরা নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলে। তারপরে যখন টের পেলে, একা নয়, বিমলাকে শুদ্ধ নিয়ে পালিয়ে এসেছি, তখন হঠাৎ চলে আসার কারণট বুঝলেও বিস্ময় নিশ্চয় কাটেনি।

সেই কথাটাই বলি ঃ

রাজবাড়ি থেকে তোমাকে পৌঁছে দেবার সময় যে কাণ্ডটা করলুম, তা নিশ্চয়ই ভোলনি। মন তখন আমার কানায় কানায় মধুতে ভরে আছে। আপনমনে গুণ গুণ করে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ফিরছি। গলির ভিতর গ্যাস-পোস্টটা ছাড়িয়ে একটু যেতেই একটা ছায়ামূর্তি যেন আকাশ থেকে নেমে এসে আমার হাত চেপে ধরলে। এবং আমার বিস্ময়ের ঘোরটা কাটবার আগেই আমাকে তাদের বাড়ির ভিতর টেনে নিয়ে গেল।

সে বিমলা।

রাত তখন ক'টা হবে? একটা বোধ হয়।

বিমলা কিছুই না বলে আমার পায়ের উপর উবু হয়ে পড়ে, দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে অঝোরে কাঁদতে লাগল। শুধু কাঁদে, কিছু বলে না।

তোমার ছোঁয়ায় আমার মাথায় তখন একটা অস্ফুট স্বপ্ন ঝিমঝিম করছে। কিছুই বুঝতে পারছি না আমি···ওকে হাত ধরে তুললুম। জানতে চাইলুম, ব্যাপারটা কি। যা বললে, তাতে আমার চক্ষুস্থির!

বিমলা সন্তানসম্ভবা। এবং সে দায়িত্ব যে আমারই তাতে আমার সন্দেহ মাত্র ছিল না। আমার কাছে সে কোনো প্রত্যাশা করেনি শুধু একটু বিষ চেয়েছিল, খুব উগ্র কোনো বিষ। যাতে এই লজ্জা থেকে সে পরিত্রাণ পেতে পারে।

শুনে আমার সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল। বললুম, একটা রাত্রি আমাকে সময় দাও বিমলা। এর ব্যবস্থা আমি করব।

টলতে টলতে ফিরে এলুম বাড়ি। অঞ্জলি জেগেই ছিল। ভাবলে, আমি মাতাল হয়ে ফিরেছি। ভাবা বিচিত্র নয়। মদ আমি মাঝে মাঝে খাই। মাতাল হওয়া ও দেখেছে। কিছু বললে না। মাতাল হয়ে ফিরলেও কিছু বলে না। বলতে সাহস করে না বোধ হয়। শুধু বলে গেল, টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা আছে।

খাবার আমার ছুঁতেও ইচ্ছা করল না। সারারাত পাগলের মতো পায়চারি করতে লাগলাম ঃ কি করা যায়! কি করা উচিত!

রাধু, আমি লোক ভালো নই সত্যি। উচ্ছৃঙ্খল, অস্থিরচিত্ত! সত্যি। কিন্তু আমার সমস্ত মন্দের মূল হল দুর্বলতা। আমি দুর্বলচিত্ত এবং খুবই কোমল। যার ফলে আমি মাতাল, আমি দুশ্চরিত্র।

····সারারাত্রি ভেবে স্থির করলুম, বিমলাকে আমি বিয়ে করব। কিন্তু অঞ্জলির সঙ্গে বিবাহের কথাটাই সকলে ভেবে রেখেছে। অঞ্জলি নিজে এবং তার বাপ-মা সবাই। সে দায়িত্বও আমারই। আকারে ইঙ্গিতে

আমিই সে আশা জাগিয়েছিলুম। সুতরাং অঞ্জলির সঙ্গেও একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

কিন্তু সব আগে বোঝাপড়া বিমলার সঙ্গে।

চিঠি দিয়ে জানালুম ঃ আজ রাত্রি দুটোয় তৈরি থেক। তোমাকে নিয়ে চলে যাব এবং বিবাহ করব।

জবাব এল ঃ রাজি।

তারপরে অঞ্জলিকে নিয়ে পড়লুম। কান্নার একটা সমুদ্র অনেকক্ষণ থেকেই আমার বুকের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। অঞ্জলিকে বিয়ে করতে না পারার জন্যে নয়, বিমলাকে বিয়ে করতে হচ্ছে বলে। এ যেন আমি সইতে পারছিলুম না।

অঞ্জলিকে বললুম, তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

ভেবেছিলুম, অঞ্জলি বেগ দেবে। কিন্তু যেই তাকে সমস্ত ঘটনা বলে বুঝিয়ে দিলুম, বুঝিয়ে দিলুম আমার মতো একটা উচ্ছৃঙ্খল, অস্থিরচিত্ত লোককে বিবাহ করার বিপদ, এবং প্রতিশ্রুতি দিলুম একটা ভালো ছেলের সঙ্গে সামনের অগ্রহায়ণেই ওর বিবাহের ব্যবস্থা করে দোব আর তার সমস্ত খরচ আমিই বহন করব,—তখন অতি সহজেই ও রাজি হয়ে গেল।

মুক্তি পেলুম। ভাবলুম, এইবার তোমার কাছে ছুটে যাব।

কিন্তু পারলুম না। নানাকারণে, নানাদিক ভেবে সাহস হল না।

তারপর বিয়ে হয়ে গেল, সে খবর নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে পেয়েছ। নিজের মনের উপর আমার নিজেরই বিশ্বাস নেই। সুতরাং কালবিলম্ব না করেই বিবাহ করি। অঞ্জলির জন্যে একটি পাত্রও পেয়েছি। আমার মতো উড়ণচণ্ডী ছেলে নয়। গৃহস্থ ছেলে। একটি বিলিতি কোম্পানীতে মাঝারি গোছের একটা চাকরি করে। গোছাল ছেলে। জমা-খরচে জমার অঙ্কটা সব সময়ই খরচের চেয়ে বেশি থাকে। সম্ভবত সামনের অগ্রহায়ণেই চার-হাত এক হবে।

এই হল মোটামুটি কাহিনীটা।

ভালো করলুম কি মন্দ করলুম, সে হিসাব করি না। তার সময় এখনও আসেনি, সেও বটে, হিসাব করা আবার স্বভাব নয় সেজন্যেও বটে। কিন্তু একটা কথা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই।

সেটা হচ্ছে, বিধাতার পরিহাস।

একদিন বিমলাকে নিয়ে পালিয়ে আসব, তাকে বিয়ে করব, এ আমার স্বপ্নেও কোনো দিন ছিল না। তাই হল। কি করে যে হল ভেবে পাই না।

ওকে আমি কোনোদিন ভালোবাসিনি। ওর মনের কথা সবটা হয়তো জানি না। কিন্তু এটুকু বুঝি, আমাকে ও ভালো যতখানি বাসে, ঘৃণা করে তার চেয়েও বেশি। আর বিশ্বাস একেবারেই করে না। ভবিষ্যতে যাতে অসহায় হয়ে না পড়ে, সেজন্যে সঙ্গে সঙ্গে পড়া আরম্ভ করে দিয়েছে, যাতে এবারেই পরীক্ষাটা দিতে পারে। মেয়েটা পড়াশুনায় ভালো।

তারপরে দেখ অঞ্জলি। আমার যতদূর বিশ্বাস, এবং এতদিন ধরে যে পরিচয় ওর পেয়েছি, তাতে মনে হয় আমাকে ও গভীর ভালোবাসে, অন্তত বাসত। আমাকে ঘিরে অনেক স্বপ্নই হয়তো ও রচনা করেছে। সে সমস্ত ছিঁড়ে ফেলে ও কোথায় যাত্রা করবার জন্যে তৈরি হচ্ছে দেখ।

আর আমার কথাটাও ভাব। তোমাকে বলি, কোনোদিন আমি বিমলাকেও ভালোবাসিনি, অঞ্জলিকেও না। আমি ভালোবাসি তোমাকে। কিন্তু আজীবন নিঃশব্দে ঘর করে যাব বিমলাকে নিয়ে। ভাবতেও হাসি পায়!

কিন্তু তারও চেয়ে আশ্চর্যের কথাটাই বলা হয়নি এখনও। বিমলা সন্তান-সম্ভবা নয়। আমাকে পাবার জন্যে অনেক ভেবে ওই চালাকিটা বের করেছিল। কী সংঘাতিক মেয়ে বোঝ!

যাই হোক, এই থাক। অনেক বড় চিঠি মনের আবেগে লিখে ফেললুম। এই ভেবে যে, আর হয়তো জীবনে আমাদের কোনোদিন

দেখা হবে না। চিঠি লেখারও কোনো উপলক্ষ্য ঘটবে না। যদিও সন্দেহ হচ্ছে, এত বড় একখানা চিঠির সমস্তটা পড়বার ধৈর্য তোমার থাকবে কি না। না থাকে, নাই রইল। আমার মনের কথা তোমাকে যে সব জানালুম, এর মধ্যেই একটা তৃপ্তি আছে। আমার সেই অপরিসীম তৃপ্তি তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

সবশেষে একটি অনুগ্রহ তোমার কাছে প্রার্থনা করব। উপরে ঠিকানা দিলাম। চিঠি কোনোদিন লিখবে না জানি। তবু কোনোদিন যদি আমাকে তোমার কোনো প্রয়োজন হয়, অকপটে আদেশ করতে দ্বিধা কোরো না। কোনোদিন তোমার কোনো কাজে যদি আসতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করব। ইতি

তোমার চিরশুভার্থী
নতুনদা

পুনশ্চ ঃ

চিঠি দেওয়ার যদি অসুবিধা থাকে, তোমার পাশের বাড়ির অরবিন্দকে (অরবিন্দ মিত্র) কোনো প্রকারে জানিও। তাহলেই আমি জানতে পারব।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে রাধারাণী স্তব্ধভাবে বসে রইল।

মনে পড়ল প্রেমদাসের কথা ঃ অরণ্যের অভিশাপ। অরণ্যের অভিশাপে সত্যই কি এদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেল ? অরণ্য কি সত্যই অভিশাপ দেয় ?

কে জানে। প্রেমদাস মাঝে মাঝে কেমন হেঁয়ালি বলে। সব গোঁসাই-এর কথা। রাধারাণী এর মানে বুঝতে পারে না।

চৌদ্দ

এই সময়েরই কাছাকাছি নালতেডাঙায় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ভোর হবার আগেই দুঃসংবাদটা ছোট মোড়লের বাড়ি পৌঁছে গেল। ওই ভোরে কে মাঠের দিকে গিয়ে দেখে আসে এবং গ্রামে ফিরে শুধু ছোট মোড়লের বাড়িতেই নয়, গোটা গ্রামেই খবরটা পৌঁছে দিলে, তা বোঝা যাচ্ছে না।

পাগলের মতো ছুটল ছোট মোড়ল, তার পিছনে বড় গিন্নি এবং তার পিছনে এলোকেশী। তাদের পিছনে গোটা গাঁয়ের লোক, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে।

ছোট মোড়ল ছুটছে। তার সঙ্গে গাঁয়ের যত পুরুষ। ছুটছে বড় গিন্নি। মাথায় কাপড় নেই। চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছে। কিন্তু পুরুষ মানুষের সঙ্গে সমান তালে ছুটতে তো সে পারে না। পিছিয়ে পড়ছে। হাঁপাচ্ছে। আর পারছে না। তবু ছুটছে। ছুটছে আর মুখ দিয়ে কেমন একটা অব্যক্ত শব্দ করছে।

সকলের শেষে এলোকেশী। ছুটছে না। গতি মন্থর, শিথিল। পা-দুটো যেন চলতে চাইছে না। মাথার কাপড় কখনও থাকছে, কখনও থাকছে না, আবার টেনে দিচ্ছে অভ্যাসবশে। কৌতূহলের তাড়নায় সবাই আগে ছুটেছে। শুধু গ্রামের দুই-একটি বউ, দুই-একটি বিবাহিতা মেয়ে, তারই প্রায় সমবয়সী, তারাই তার সঙ্গে চলেছে। আর মাঝে মাঝে ওর থমথমে মুখের দিকে চাইছে নিঃশব্দে। বুঝতে পারছে না, ওর বুকের ভিতর কি হচ্ছে। কিছু হচ্ছে কি না, তাই বোঝা যাচ্ছে না। ওর চোখে যেন দৃষ্টি নেই। মনেও কোনো অনুভূতি নেই।

বুড়ো অশ্বত্থ গাছের ডালে ক'টি শকুন এসে জমেছে। কিন্তু নিচে নামতে ভরসা পাচ্ছে না বোধ হয়। এত লোকজনের আসা দেখে

কয়েকটি শকুন ভয় পেয়ে হুস হুস করে উড়ে অন্য একটি দূরের গাছে গিয়ে বসল।

হ্যাঁ, ওই গাছটার কাছেই।

নতুন পুকুরের পাড়। তার নিচেই নালা। নালা ডিঙ্গিয়েই যে বড় আল, সেই আলের উপর। পা দুটো আলের উপরই আছে। বাকি দেহটা চন্দ্রভূষণের বাকুড়ি জমির উপর, মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে।

এত দূর থেকে মুখ দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু খয়েরী রঙের কোট এবং তার উপর ধুতিটা গোয়াল-ছাঁদে বাঁধা। দেখে মনে হচ্ছে মহাদেবই হবে।

ছোট মোড়ল আরও জোরে ছুটতে লাগল। তার সঙ্গে অন্য অন্য লোকেরাও। ক'টি ছোট ছেলে সকলের আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। দেখা গেল, পুকুরের পাড় থেকে নেমে নালার উপর কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকেই তারা পাড়ের উপর উঠে এল। যেমন ঘেঁষাঘেষি করে তারা দাঁড়িয়েছে, মনে হয় ভয় পেয়েছে। হাত ইসারায় অন্য লোকদের তারা ডাকতে লাগল।

ইতিমধ্যে ছোট মোড়ল পৌঁছে গেল।

হ্যাঁ। মহাদেবই।

পা-দুটো ছাঁদ দেওয়া। হাত সম্মুখের দিকে প্রসারিত। আর মুখের যে অংশটা উপরের দিকে, তার গালের খানিকটা অংশ বোধ করি শিয়ালেই খুব্‌লে নিয়েছে। তার সঙ্গে একটা চোখও। সেটা হয়তো কাকে করেছে।

কী বীভৎস চেহারা!

ছোট মোড়ল চিৎকার করে উঠল: এ কাণ্ড তোর কে করলে রে! কার সঙ্গে তোর এমন শত্রুতা ছিল!

লাসটার চারিদিকে ছোট মোড়ল ছুটে ছুটে বেড়ায়। আর পাগলের মতো মাথার চুল ছেঁড়ে।

বড় গিন্নি তখন এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মহাদেবের প্রাণহীণ শীতল

দেহটার উপর। আর কাৎরে কাৎরে কাঁদে : বাবা রে! আমার গোপাল রে! আমার সোনামাণিক রে!

সে কান্নায় পাষাণও গলে।

সারা গ্রামের লোক, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, কি বৃদ্ধ কি শিশু, সে কান্না শুনে কার সাধ্য স্থির থাকে! তারাও অঝোরে কাঁদে।

ক'টি প্রবীণা চেষ্টা করলে বড় গিন্নিকে মৃতদেহের কাছ থেকে টেনে সরিয়ে আনতে। কিন্তু সে কি সরানো যায়! একটু যদি কেউ সরিয়ে আনে, আবার ছুটে গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শক্ত মাটিতে মাথা কুটে কুটে রক্তাক্ত হয়ে গেল।

কিন্তু এ সব কিছুই যেন এলোকেশীর চোখে পড়ছে না, কানে যাচ্ছে না।

কাঠের মতো শক্ত হয়ে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে। থেকে থেকে থরথর করে দেহটা কেঁপে উঠেই আবার স্থির হয়ে যাচ্ছে। স্থির দুটি চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে পরে একটা করে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। তাতে যেন আগুনের ঝলক!

ক'টি মেয়ে নিঃশব্দে তার কাছে দাঁড়িয়ে।

একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোকও। বার বার সাধছে : একটু কাঁদ। বৌমা, একটু গলা ছেড়ে কাঁদ।

এলোকেশী তার কথা হয়তো শুনতেই পাচ্ছে না। কি হয় তো কাঁদতে পারছে না। চোখের মধ্যে, বুকের ভিতর অশ্রুর চিহ্ন নেই। সব বাষ্প হয়ে উবে গেছে।

বিচিত্র নয়।

হঠাৎ আকাশের দিকে দুই হাত তুলে মুঠি পাকিয়ে ছোট মোড়ল চিৎকার করে উঠল : এ নিশ্চয় সেই হারামজাদার কাজ! ক'দিন আগে জমির ভাগ নিতে এসেছিল। হারামজাদা, শুয়ারের বাচ্চা!

এই শুয়ারের বাচ্চাটি কে, সে বিষয়ে গ্রামের লোকের কাছে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। জমির ভাগ সে গোপনে নিতে আসেনি। গ্রামের

পাঁচজনকে ডেকেই প্রসঙ্গটা, মাত্র কদিন আগে ডোমন তুলেছিল। ডোমন এলোকেশীর দাদা। বিষয়ী, মামলাবাজ লোক।

তারও দোষ নেই। এ রকম ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিষয়ী লোকই এমন করে থাকে।

মহাদেবের সঙ্গে এলোকেশীর যখন বিবাহ হয়, তখন মহাদেব ভালোই ছিল। তার পরেই সে পাগল হয়ে যায়। সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ে গাঁজা-ভাং খায়, শ্মশানে-মশানে ঘোরে।

ডোমন বলে, এই যদি অবস্থা তবে আর এলোকেশী এখানে কী আনন্দে থাকবে! ছোট মোড়ল আর বড় গিন্নি মারা গেলে সবই তো তার। ইতিমধ্যে কিছু জমি তার জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক। তাতে আপাতত তার চলবে।

ছোট মোড়ল মানুষ হিসাবে খুব সরল লোক। এলোকেশী এখানে দুঃখে-কষ্টেও নেই। বলেছিল, কেন, বোনকে দুবেলা দুমুঠো ভাত নিজে দিতে পারবা না? এখান থেকে ধান না নিলে চলবে না?

—ওর আছে যখন।

সরল হলে কি হবে, ছোট মোড়লের রাগ চণ্ডাল। ডোমনকে মারতে গিয়েছিল। গ্রামের লোকে না ধরে ফেললে সেদিন আর ডোমনকে আস্ত ফিরতে হত না।

যাবার সময় ডোমনও শাসিয়ে যায়। সেও কম লোক নয়। আদালতে উকিল মোক্তার থেকে হাকিম পর্যন্ত তাকে চেনে না, এমন কেউ নেই। শাসিয়ে যায়ঃ সিকি জমির ধান যদি আমার খামারে বাঁধতে না পারি তো তল-হাতে রেঁায়া।

ছোট মোড়লের ধারণা সেই এ কাজ করেছে।

গ্রামের লোকও বিবেচনা করলে, এটা একেবারে অসম্ভব নয়। ডোমনের অসাধ্য কাজ নেই। বিশেষ মহাদেব জীবিত থাকলে তার মামলা তেমন বলিষ্ঠ হয় না। সুতরাং মহাদেবকে যদি সে সরিয়ে থাকে, তার পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়।

কিন্তু তাহলে আঘাতের চিহ্ন থাকবে তো ?

দু-একজন লোক এগিয়ে এল। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে যতখানি সম্ভব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করতে লাগল :

কপালে রগের কাছে একটা নীল দাগ আছে বটে। সেটা পড়ে গিয়েও হতে পারে, আবার জোর একটা ঘুঁষিতেও হতে পারে। আর কোথাও কোনো দাগ পাওয়া গেল না। কেবল

হ্যাঁ, কেবল পায়ের বুড়ো আঙুলে যেহেতু-চিহ্নের মতো তিনটে বিন্দুর দাগ। ঠিক যেন কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছে কে।

একজন বললে, না হে ছোটমোড়ল, খুন লয়।

—তবে ?

—সাপে কেটেছে, পষ্ট সাপের দাঁতের দাগ।

কিন্তু ছোটমোড়ল কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়। নেশা-ভাঙ করে করে মহাদেবের দেহে খান কয়েক হাড় এবং একটা চামড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নেশার মুখে রগে একটা ঘুঁষি খেলেই যথেষ্ট। তারপরে, ডোমনচন্দ্র যা লোক, পায়ে তিনটে বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে দাগ করে দিয়েছে। যাতে লোকে মনে করে সাপে কেটে মারা গেছে।

অন্যের বিরুদ্ধে ছোটমোড়লের এই অভিযোগ কেউ বিশ্বাস করত না। কিন্তু ডোমনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া সহজ লয়।

সুতরাং দফাদার থানায় গিয়ে দারোগা নিয়ে এল। দারোগা ছোটমোড়লের গরুর গাড়ি করে লাস চালান দিলে। দিন দুই পরে ডাক্তার রিপোর্ট দিলেন, খুন নয়, সর্পদংশনেই মৃত্যু হয়েছে।

ডাক্তারের রিপোর্টেও ছোটমোড়ল বিশ্বাস করে না। এমন হতেই পারে না। সর্পদংশন কখনই নয়। ডোমন ডাক্তারকে নিশ্চয়ই ঘুষ দিয়েছে এবং বেশ মোটা টাকাই ঘুষ দিয়েছে।

কিন্তু ডাক্তারের রিপোর্টের পরে পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে চিৎকার ছাড়া আর করার কিছুই নেই।

তিনদিন আহার-নিদ্রা ছেড়ে, একবার থানা, একবার মর্গ, একবার কোর্ট ঘোরাঘুরি করে, বহু অর্থ অপব্যয় করে ছোটমোড়ল সদলবলে শবদাহ করে ঘরে ফিরল। তখন সে প্রায় পাগল।

শুধু একটা বুলি: ছোঁড়াটাকে মেরে ফেললে রে, শত্রুতে মেরে ফেললে! আমি ছাড়ব না। ছোটমোড়ল সে পাত্র নয়। আমি দেখে নোব।

লোকজন আসে। নানা কথা বলে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সান্ত্বনা শোনে কে! ছোঁড়াটাকে মেরে ফেললে, আর আমি ছেড়ে দোবো? চালে এক মুঠো খড় থাকতে লয়। তেমন বংশে আমার জন্ম হয় নাই।

চোখ লাল। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙচে ছোটমোড়লের। ছেড়ে সে কিছুতেই দেবে না।

—কাকা!

ছোটমোড়ল চমকে উঠল।

এলোকেশী একটা গেলাসে করে সরবৎ এনেছে। দুটি করপ্রকোষ্ঠ রিক্ত। পরিধানে থান, সিঁথিতে সিন্দুরের রেখা নেই। মাথায় আধ-ঘোমটা। দেখা যাচ্ছে, শান্ত একখানি মুখ,—শীর্ণ, শুষ্ক, করুণ।

ছোটমোড়ল আচ্ছন্নের মতো হাতখানা বাড়ালে সরবতের দিকে। তার হাতের মধ্যে গেলাসটা ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। চলকে পড়ে সরবৎ। গেলাসটাও হাত থেকে পড়ে যায় বুঝি।

এলোকেশী হাঁটু গেড়ে বসে টপ করে গেলাসটা ধরে ফেললে। তারপর মা যেমন করে ছোট ছেলেকে খাওয়ায় তেমনি করে এই উপবাসক্লিষ্ট বৃদ্ধকে ধীরে ধীরে সরবৎটুকু খাইয়ে দিলে।

—তোমার বিছানা হয়েছে, কাকা।—এলোকেশী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে।

জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো ছোটমোড়ল লাফিয়ে দাওয়া থেকে নিচে পড়ল।

বললে, ওইটি বোলো না, বৌমা। শত্রু নিপাত না হওয়া পর্যন্ত

আমাকে খেতেও বলবা না, শুতেও বলবা না। আহার-নিদ্রে বন্ধ। আগে শত্রু নিপাত, তারপরে অন্য কিছু।
ছোটমোড়ল পাগলের মতো পথে পথে ঘোরে।

রাত্রি তখন ন'টা হবে।
বড়গিন্নি তার ঘরে অনাবৃত মেঝের আপাদমস্তক আবৃত করে শুয়ে। ঘুমুচ্ছে কি জেগে আছে, বোঝা যাচ্ছে না। কাঁদছে না নিশ্চয়। এই কদিন অবিশ্রান্ত কাঁদলে বড়গিন্নি। গলা ভেঙে গেছে। এখন আর কাঁদে না, কথা কয় না, একটা শব্দ পর্যন্ত করে না। শুধু দিন রাত্রি আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে নিঃসাড় শুয়ে থাকে। পাড়ার গৃহিণীরা আসে, কত সান্ত্বনার কথা বলে। বড়গিন্নি নিঃশব্দে মুখ ঢেকে পড়ে থাকে। সাড়া দেয় না। কথাগুলো তার কানে যায় কি না, তাও বোঝা যায় না।
এই ঘরটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার। ঘরে একটিমাত্র দরজা। জানলার নাম-গন্ধ নেই।
লোকে হেসে বলত ঃ ঘরে বড় গিন্নির টাকা-কড়ি থাকে কি না। তাই চোরের ভয়ে জানলা রাখে নাই।
কিছু টাকা থাকাই সম্ভব। ওদের জমি-জমা মন্দ নয়। অন্তত এ গ্রামে অত জমি কারও নেই। নিজের হাতে চাষ। ফসল যথেষ্ট হয়। অথচ খাবার লোক নেই। সুতরাং টাকা কিছু থাকাই স্বাভাবিক।
কিন্তু সে যে কত কেউ জানে না। ঈর্ষা-কাতর লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হয় মাত্র।
কয়েকবার চোরও এসেছিল। বাক্স-প্যাঁটরা ভেঙে তছনছ করে যায়। ভোরে উঠে বড় গিন্নির চিৎকারে গ্রামের লোক জড় হয়। 'ওরে আমার সর্বস্ব নিয়ে গেল রে, আমার সর্বস্ব নিয়ে গেল।' একটা বেলার মধ্যেই, পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকের অভিধানে যত গালি আছে, সমস্ত নিঃশেষ করে বড়গিন্নি দম নিলে।

প্রতিবেশীরা অনুমান করতে লাগল, বড়গিন্নির কত টাকা থাকা সম্ভব এবং কতই বা চোরের গর্ভে গেল।

সেই গুজবের কথা শুনে মনে মনে হেসেছিল শুধু চোরেরা আর বড় গিন্নি নিজে। চোরেদের রাতজাগা এবং পরিশ্রমই সার হয়েছিল। একটা ঝাঁকামুটের মজুরিও পোষায়নি। বার বার চেষ্টা করেও বড় গিন্নির টাকা আদৌ আছে কি না, এবং থাকলে কোথায় আছে, কিছুতেই তারা সন্ধান করতে পারেনি।

দিনের বেলাতেই যে ঘর অন্ধকার থাকে, রাত্রে তো তার কথাই নেই।

পাছে শাশুড়ীর গায়ে পা ঠেকে যায়, এই ভয়ে এলোকেশী আর ভিতরে গেল না। দোরগোড়া থেকেই ডাকলে, মা!

সাড়া পেলে না।

আবার ডাকলে, মা!

সাড়া নেই।

এলোকেশী ভয় পেয়ে গেল।

সমস্ত দিন সে মুখ বুঁজে কাজ করে। আগেও করত, এখনও করে। পরিশ্রম সে সমানই করতে পারে। কিন্তু বুকটা কি রকম দুর্বল হয়ে গেছে। কোথাও একটু খুট করে শব্দ হয়, আর চমকে ওঠে। ভয় পায়।

উঠান ঝাঁট দিচ্ছে হয়ত আপন মনে। হঠাৎ নিজের চারদিকে চেয়ে যেই খেয়াল হয়, কাছে কেউ নেই,—ভয় পায়।

আস্তে আস্তে শাশুড়ীর কাছে এসে দাঁড়ায়। বড়গিন্নি হয় তো চেয়েও দেখে না। তবু তার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে একটু সাহস পায়। নয় তো বাইরের ঘরে আসে। বাইরে ছোটমোড়ল অনর্গল চিৎকার করে চলেছে। ও খানিকটা সাহস পায়।

এমনি করে ওর দিন কাটে।

শাশুড়ীর সাড়া না পেয়ে ও ভয় পেয়ে গেল। ঘুমুচ্ছে? না কি

'না কি' যে কি, ভাবতে ওর বুকের রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি একটা আলো নিয়ে এল।

—মা!

বড়গিন্নি একটু যেন নড়ল।

—মা! ওঠ।

অর্থাৎ অন্ধকার হয়েছে। বড়গিন্নি সমস্ত দিন ঘরের বাইরে বেরয় না। কাউকে মুখ দেখাতে লজ্জা করে। স্নান প্রভৃতি যা কিছু সমস্তই করে সন্ধ্যার পরে, অন্ধকার হলে। তখন আর পাড়াগাঁয়ে কেউ ঘাটে-মাঠে যায় না।

বড়গিন্নি উঠল।

এলোকেশী গামছাটা এনে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, বড় অন্ধকার মা, আলাটা লিয়ে যাব?

—কি হবে? আমাকে সাপে কামড়াবে না গো। সে অদেষ্ট কি করিছি।

বড়গিন্নির শরীরটা একবার তুলে উঠল। খুঁটিটা ধরে টাল সামলাল। তারপর কোনো দিকে না চেয়ে ঘাটের দিকে চলে। এলোকেশীও পিছু পিছু গেল।

ফিরে আসতে এলোকেশী শুকনো কাপড় একখানা দিলে। তারপর মুড়ি, গুড় আর দুধ দিলে। আজ দশমী, কাল একাদশী।

—পোড়া পেটে দুটো দিতেই হবে। পেট কথা শুনবে না।

বড়গিন্নি একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলে। সে হাসি যেন বিধাতা পুরুষকেই ভেঙচি কাটলে। তাঁর আশ্চর্য সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে এই ব্যাপারটা যে কত বড় হাস্যকর, এই হাসি তাই যেন আঙুল দিয়ে দেখালে।

কিছুক্ষণ ধরে বড়গিন্নি নিঃশব্দে মুড়ি চিবিয়ে যেতে লাগল। তার মস মস শব্দটা যেন একটা অনাসৃষ্টির মতো উভয়ের কানেই বাজতে লাগল। বড়গিন্নি বিরক্ত ভাবে মুড়ির সঙ্গে এক চুমুক করে দুধ খেতে লাগল, যাতে শব্দ না হয়।

হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করলে, আজ দশমী, নয় বৌমা ?

—হুঁ ।

বড়গিন্নির মুড়ি চিবোন বন্ধ হল ।

—তুমি কি খেয়েছ মা ? তোমারও তো,

কথাটা আর বড়গিন্নি শেষ করতে পারলে না। বাটিগুলো ছুঁড়ে উঠানে ফেলে দিয়ে ছুটে ঘরে গিয়ে খিল লাগিয়ে দিলে ।

—মা, ওমা !

আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দরজায় মাথা দিয়ে এলোকেশী স্তব্ধ-ভাবে দাঁড়িয়ে রইল ।

ছোটমোড়ল তখনও বাইরে চেঁচাচ্ছিল । এলোকেশী দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সে এমনই তন্ময় হয়ে ডোমনকে শাসাচ্ছিল যে, এলোকেশীর থান ধুতির প্রান্ত তার চোখেই পড়ল না ।

তখন এলোকেশীকে ধীর কণ্ঠে বলতে হল: রাত হয়েছে কাকা ।

—রাত ! তাই তো !—ছোটমোড়ল চমকে উঠল,—চল, চল মা ।

খেতে বসতে বসতে বললে, কি জান মা ! সময় যেন আমি আর বুঝতে পারছি না। কখন সকাল, কখন বিকেল, কখন সন্ধ্যে, কখন রাত্রি ঠাহর পাই না। ওই হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চাকে জব্দ না করা পর্যন্ত ঠাহর পাবও না ।

শুধু তাই নয়, উপাদেয় গালাগালিগুলি যে এলোকেশীর সহোদর দাদার উপরই প্রয়োগ করা হচ্ছে, তারই মুখের সামনে, সেটাও ঠাহর পাচ্ছে না ।

এলোকেশী চুপ করেই রইল ।

—তোমার শাশুড়ীর খাওয়া হয়েছে, বৌমা ?—ছোটমোড়ল একটুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলে ।

—দুটো মুড়ি দাঁতে কেটেছে মাত্র ।

—হুঁ। ওর দিকে একটু লক্ষ্য রেখ, বৌমা। কদিন কাঁদছিল। আর কাঁদছেও না। এটা ভালো নয়।

এলোকেশী চুপ করে রইল।

হঠাৎ থালা থেকে হাত গুটিয়ে ছোটমোড়ল বললে, ওর গতিক-সতিক আমার ভালো বোধ হয় না বৌমা।

—না।

—মাথাটা যেন,

—হ্যাঁ।

—এই দেখ, তুমিও লক্ষ্য করেছ ?

এলোকেশী বললে, কথা পেরায় বলে না ; যদি বা কিছু বলে, তা যেন কেমন এলোমেলো।

তার মুখের কথাটা ছোটমোড়ল যেন লুফে নিলে : ঠিক বলেছ ! এলোমেলো। পাগল না হয়ে যায়। লক্ষ্য রেখ।

কিন্তু তখনই আবার বললে, লক্ষ্যই বা কি রাখবা বল ? পাগল যে হবেই তার ওপর কি আর লক্ষ্য রাখা যায় ?

ছোটমোড়ল বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাতে লাগল।

—কিন্তু তাও তোমাকে বলি বৌমা, তোমাদের এইটে আমি বুঝতে পারি না।

—কোন্‌টা কাকা ?

—ছোঁড়াটা মরে গেল। দুঃখ হবারই কথা। কিন্তু পাগল হব কেন ? যতক্ষণ না সেই শুয়োরের বাচ্চাটাকে শ্রীঘরে পুরছি, ততদিন পাগলও হব না, ছাগলও হব না, এই তোমাকে বলে দিলাম।

বলে একটা ডাঁটা তুলে নিয়ে ছোটমোড়ল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভাবে চিবুতে লাগল।

—আচ্ছা বৌমা ?

—কি কাকা ?

—তোমার কি মনে হয় না, কাজটা তোমার দাদারই। আর কারও নয়।

এ কথা তো ছোটমোড়লের মুখ থেকে এলোকেশী ক্রমাগতই শুনে আসছে। এ ছাড়া তার তো আর কোনো কথাই নেই।

এলোকেশী চুপ করে রইল।

—বল! চুপ করে থাকলে তো চলবে না। তোমারও তো স্বামী খুন হয়েছে। তোমারও তো মতামত দরকার।

এলোকেশী চমকে উঠল।

তাইতো! যে লোকটা মারা গেল সে তো তারই স্বামী। সে তো শুধু ছোটমোড়লের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বড়গিন্নির পুত্র নয়। তারও তো স্বামী। অথচ, সকলের দৃষ্টি, এমন কি তার নিজের দৃষ্টিও, ওদেরই উপর নিবদ্ধ। তারও যে স্বামী গেছে, সেও যে শোকার্ত,—অন্যের দূরের কথা, তার নিজেরও যেন সেই বোধটা নষ্ট হয়ে গেছে। সে ঘর-সংসারের সমস্ত কাজ করছে। রাঁধছে, বাড়ছে। শ্বশুর-শাশুড়ীকে স্নান করাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, যত্ন করছে। তাইতো!

—বল। তোমার কি মত? এ কাজ তোমার দাদার নয়?

ছোটমোড়ল আবার চাপ দিলে।

—না।

খুব স্পষ্ট কণ্ঠে এলোকেশী বললে, না।

—না?

—না।

ছোটমোড়ল প্রথমটা হতচকিত হয়ে গেল। তারপর মুখে একটা ব্যঙ্গপূর্ণ ক্রুদ্ধ ভঙ্গি করে বললে, তুমি তো বলবাই। তোমার দাদা কি না?

—না। সেজন্যে নয়।—খুব জোরের সঙ্গে এলোকেশী বললে।

ছোটমোড়ল জিজ্ঞাসা করলে, তবে কি জন্যে? তোমার কি ধারণা তাকে ডোমন খুন করে নাই? কে খুন করেছে তবে?

—আমি।

হঠাৎ ওদের মধ্যেখানে কে যেন একটা বোমা ফাটিয়ে দিলে। প্রথম ধাক্কাটা শব্দের। সেটা কাটলো তো ধোঁয়া। রাশি রাশি ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে লাগল ওদের মধ্যে।

এলোকেশী খুন করেছে! নিজের স্বামীকে! যাকে সে, বলতে গেলে, দেখেইনি ভালো করে! কি বলতে চায় এলোকেশী? তার কথার অর্থ কি? তা সে নিজেও জানে না। তার কেবলই মনে হচ্ছে সেই যেন খুন করেছে। নইলে যে শাস্তি খুনীর প্রাপ্য, সেই শাস্তি সে পাচ্ছে কেন?

ধোঁয়া কাটতে ছোটমোড়ল করুণভাবে মাথা ন্যাড়ল:

—তোমারও অবস্থা ভাল নয়, বৌমা। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ, সেই শুয়োরের বাচ্চাকে যতক্ষণ না শাস্তি দিচ্ছি, ততক্ষণ আমাদের পাগল হওয়াও চলবে না, কিছু হওয়াই চলবে না।

খেয়ে উঠে ছোটমোড়ল তার নিজের ঘরে শুতে চলে গেল।

রাত তখন ক'টা হবে? একটা, দুটো, তিনটে, যা খুশি হতে পারে। ছোটমোড়লের শোবার ঘরে ফুট ফুট করছে চাঁদের আলো। হঠাৎ একটা কোমল স্পর্শে জেগে উঠে ছোটমোড়ল দেখে বড়গিন্নি।

—বড়গিন্নি!

ছোটমোড়লের ওঠবার ক্ষমতা নেই। যেমন শুয়ে ছিল, তেমনি শুয়ে রইল।

—হ্যাঁ।

বড়গিন্নির পরণে একখান ধোপ-দুরস্ত থান কাপড়, মাথার চুল যথাসম্ভব সুশৃঙ্খল। মুখে একটা রহস্যময় হাসি।

—এত রেতে?—ছোটমোড়ল বিহ্বলের মতো জিজ্ঞাসা করলে।

ওর খাটের এক প্রান্তে বসতে বসতে বড়গিন্নি বললে, তোমার শোবার ঘরে এত রেতে এই কি আমি পেথম এলাম, যে অবাক হচ্ছ?

—না, তা নয়। তবে,

—কি তবে ?

ছোটমোড়ল জবাব দিতে না পেরে শুধু নির্বাক চেয়ে রইল।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলা ?—বড়গিন্নি তেমনি রহস্যময় হাসির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে।

—না, ঠিক ঘুমুই নাই। ঘুম আসছে না। মাথায় সব সময় যেন আগুন জ্বলছে! সেই হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চাকে···

উত্তেজনায় ছোটমোড়ল উঠে বসতে যাচ্ছিল। বড়গিন্নি দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাকে ফের খাটে শুইয়ে দিলে।

স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, ঘুমোও। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিছি।

বড়গিন্নির স্নেহস্পর্শে ওর চোখ বন্ধ হয়ে এল।

এক সময় ছোটমোড়ল ডাকলে, বড়বৌ!

—বল।

—মাথা খুব ঠাণ্ডা রেখ। যতদিন মহাদেবের মিত্যুর শোধ না লিছি, ততদিন আমাদের পাগল হয়ে গেলেও চলবে না। পাগল-ছাগল যা হতে চাও সব তার পরে,—সেই শুয়োরের বাচ্চাকে শ্রীঘর পাঠিয়ে তবে। দেখছ না, আমি কি রকম মাথা ঠাণ্ডা করে রয়েছি।

বড়গিন্নি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি জানালার বাইরে, যেখানে বাতাবি লেবুগাছের নিচে আলো-ছায়ায় একটা অদ্ভুত রহস্যের সৃষ্টি করেছে, সেইখানে স্থির হয়ে আটকে আছে। চোখে পলক পড়ছে না।

আরামে ছোটমোড়লের চোখ বন্ধ হয়ে ছিল। নইলে এই দৃষ্টি সে যদি দেখতে পেত তাহলে ভয়ে চিৎকার করে উঠত।

ছোটমোড়লের কথা বড়গিন্নির কানে যাচ্ছিল কি না কে জানে। কিন্তু তার কথার উত্তরে একটা হুঁ দিলে।

—বৌমার দিকে একটু লক্ষ্য রেখ। ছেলেমানুষ!

—হুঁ!

—যে মরেছে সে স্বামী, যে মেরেছে সে দাদা। একটা কথাও বেচারী বলতে পারছে না। এর দিকেও না, ওর দিকেও না।

—হুঁ।

—সুধিয়েছিলাম। কি বললে জান?

—হুঁ।

—বললে, ওই খুন করেছে।

—হুঁ।

—মানেটা বুঝতে পারলা?

—হুঁ।

—মানে, দাদাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে জেলে পাঠাও।

—হুঁ।

—ওর পক্ষে একই কথা: জেলও যা বাড়িও তাই। বিধবা হয়ে বাড়িতে বেঁচে থাকা মানে জেলই ভালো। আত্মীয়-স্বজনের সামনে মুখ দেখাতে লজ্জা করবে না। কি বল?

—হুঁ।

—কিন্তু বিষ্টুচরণের ছেলে যদি আমি হই, তাহলে এর শোধ আমি লোবই। দেখে লিও।

—হুঁ।

বড়গিন্নির চোখের দৃষ্টি ওখান থেকে সরে করবীঝাড়টার নিচে এসে পৌঁছেচে। ওর মনে হচ্ছে কালো মতন কী যেন একটা সেখানে শুয়ে আছে। বেরালের মতন। গায়ে শাদা শাদা দাগ আছে। কিন্তু বেরালের চেয়ে বড়। অনেক বড়।

ছোটমোড়ল ফিস ফিস করে বললে, গয়সাবাদের যতে গয়লাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। ওর মতন খুনে তো এ তল্লাটে নাই।

—হুঁ।

—কাউকে বোলো না যেন, সে রাজি হয়েছে। পাঁচশো টাকা চায়। তা চাইবে বই কি! ডোমনা হারামজাদাও তো সোজা লোক লয়।

তারও এই সব লোক নিয়ে কারবার। সবটাই এখন চায় নাই। বলেছে, এখন অর্ধেক দিতে হবে কাজ হাঁসিল হয়ে গেলে বাকি অর্ধেক।

—হুঁ।

—বলেছি দোব।

—হুঁ।

—অমাবস্যার রাত দোপরে আসবে বলেছে। ওরা তো আবার রণ-কালীর পুজো না করে এসব করে না কি না।

—হুঁ।

—তাছাড়া

হঠাৎ ছোটমোড়লের চোখ পড়ে গেল বড়গিন্নির উপর।

—কি দেখছ?

—হুঁ।

ওই দূরের কোণে জামগাছের মাথার উপর বড়গিন্নির দৃষ্টি। চাঁদের আলোয় জামের চিকন পাতা ঝিকমিক করছে। ঠিক মনে হচ্ছে, কে যেন একখানা ধপধপে শাড়ি পরে গাছে বসে রয়েছে!

ছোটমোড়ল ভয় পেয়ে গেল। বড়গিন্নিকে একটা ঠেলা দিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল: কি দেখছ?

ওর দৃষ্টি ছোটমোড়লের উপর এসে পড়ল। চোখ দুটো চাঁদের আলোয় কাচের মতো চিকচিক করছে। মুখে সেই রহস্যময় হাসি।

বললে, আচ্ছা, তুমি কখনও ছোটবৌকে স্বপ্ন দেখ ঠাকুরপো?

ছোটমোড়লের চক্ষুস্থির। তার গলায় কি যেন একটা ড্যালার মতো আটকে গেছে। কথা বেরুচ্ছে না। মাথা নেড়ে কোনোমতে জানালে, না।

—আমি দেখি। পেরায় রোজই।

বড়গিন্নির ঠোঁটের হাসি যেন ঝিকমিক করে উঠল।

বললে, তার গলায়-দড়ি-দেওয়া সেই চেহারাটা লয়। ঘুরে ঘুরে বেড়াত, কাজ করত, সেই হাসি-হাসি চেহারা।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। খালি ডাকে আমাকে। অনেকসময় দূরের দিকে চাইলেই তার হাত-ইসারা দেখতে পাই।

ছোটমোড়ল অবাক হয়ে দেখলে, ওর মুখে ভয় বা বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই। ও নিঃশব্দে ছোটমোড়লের চুলগুলো নিয়ে খেলা করছে।

—আর ছবি দেখি।—অনেকক্ষণ পরে বড়গিন্নি বললে,—ওর দিকে না চেয়েই।

—কিসের ছবি ?

ছোটমোড়লের বুকের ভিতরটা কি রকম করছে। গলা শুকিয়ে এসেছে। বিহ্বলের মতো কথা বলছে কোনোমতে।

—তুমি দেখ নাই সে ছবি।

আচ্ছন্নের মতো ছোটমোড়ল জিজ্ঞাসা করলে, কার ছবি ? কিসের ছবি ?

—ছবি লয়, সত্যি।

—কি সত্যি ?

—তোমাকে বলি নাই। অনেকদিন আগের কথা। ছোট বৌ তখন বেঁচে নাই।

বড়গিন্নি থামল। তার মুখের ভাব ধীরে ধীরে কঠিন হতে লাগল। চোখের দৃষ্টি হীরার মতো ঝকমক করতে লাগল সুতীক্ষ্ণ নিষ্ঠুরতায়। দুরুদুরু বুকে ছোটমোড়ল চেয়ে আছে তার দিকে, নিঃশব্দে।

বড়গিন্নি বলতে লাগল :

—সেদিনও এমনি চাঁদনী রাত। ফুট ফুট করছে জ্যোচ্ছনা। একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝি। তুমিও জাগিয়ে দাও নাই।

—তারপরে ?

ভয়ে, আগ্রহে ছোটমোড়লের চোখের তারা যেন বেরিয়ে আসছে।

বড়গিন্নির চোখের দৃষ্টি অন্যমনস্ক।

অস্ফুটে বললে, দরজা খুলে বেরুতেই,

—বেরুতেই ?

—মহাদেব !

দুজনেই একসঙ্গে শিউরে উঠল।

—অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলে। সেই চাউনি কোনোদিন ভুলতে পারব না। এখনও পর্যন্ত ওর দিকে চাইতে পারতাম না। চাইলেই সেই দৃষ্টি যেন একখানা বরফের ছোরার মতো বুকে এসে বিঁধত।

স্তব্ধ ঘর। ওরা পরস্পরের নিশ্বাস শুনতে পাচ্ছে।

—তারপর থেকেই তো ও কী রকম হয়ে যেতে লাগল। আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত। বাড়িতে থাকত না। নেশা করতে শিখলে। চক্ষের পলকে কী যেন সব হয়ে গেল।

তারপর স্তব্ধভাবে কতক্ষণ যে কাটল, কেউ হিসাব রাখে না।

এক সময় বড়গিন্নি উঠে বললে, ঘুমোও। আমি চললাম।

বড়গিন্নি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু ছোটমোড়লের আর ঘুম আসে না। চোখ মেলে নিঃশব্দে পড়ে রইল।

তারপরে ভোরের দিকে হয়তো একটু তন্দ্রাকর্ষণ হয়েছে, এমন সময় এলোকেশীর চিৎকারে ছোটমোড়ল ধড়মড় করে উঠে বসল।

—কী হয়েছে ?

—সর্বনাশ হয়েছে ! শীঘ্রি বেরিয়ে এস, কাকা।

এলোকেশীর গলা কাঁপছে।

ছোটমোড়ল লাফিয়ে বাইরে চলে এল। দেখে বড়গিন্নির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এলোকেশী চেঁচাচ্ছে : মা, ওমা, মা !

ছোটমোড়ল আসতেই এলোকেশী অস্থিরভাবে বললে, মায়ের সাড়া পেছি না ক্যানে ? অনেকক্ষণ থেকে ডাকছি।

দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

লাথি মেরে মেরে ছোটমোড়ল দরজা ভেঙে ফেললে। কিন্তু ঘরের মধ্যে একটা পা দিয়েই পিছিয়ে এল।

মাটির ঘর। খড়ের চাল। বাঁশের যে কড়িকাঠ, তাইতে শাড়ি বেঁধে বড়গিন্নি ঝুলছে। অবিকল ছোটবৌয়ের মতো।

এলোকেশীর চিৎকারে দেখতে দেখতে বহু লোক জুটে গেল।

পোনেরো

সন্ধ্যার পরে প্রেমদাস এল।

বললে, একটা খারাপ খপর আছে।

রাধারাণীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করলে, কি আবার খারাপ খবর?

—মহাদেব মারা গেয়েছে।

—সর্বনাশ? কি করে গো?

এ সম্পর্কে যা শুনেছিল সে, সব বলে বললে, মনে হছে সাপে কেটে। অন্ধকার রেতে মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে সাপেই কেটে থাকবে। কিন্তু ছোট মোড়ল বলছে, না। কেউ তাকে খুন করেছে। সে অনেক বিত্তান্ত: পুলিশ এসেছিল, লাস লিয়ে থানায় যায়, দুদিন পরে তবে দাহ হয়।

—পুলিশ কি বললে?

—বললে, সাপে কাটাই বটে। কিন্তু ছোটমোড়লের ধারণা পুলিশকে ঘুষ দেওয়া হয়েছে।

—কে ঘুষ দেবে?

—যারা মেরেছে তারা।

একটু চুপ করে থেকে রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, মহাদেবের কি অনেক শত্রু ছিল?

হাতের তালু উলটে প্রেমদাস বললে, ভগমান জানেন।

তারপর বললে, পাগল-ছাগল মানুষ। কার কি অনিষ্ট করেছে যে, শত্রু থাকবে ? তা লয়। ছোট মোড়লের মাথা খারাপ হয়ে গেয়েছে। তারপরে

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, তারপরে ?

—থাক। তুমি ভয় পাবা। কাল সকালে বলব।

রাধারাণী ওকে চেপে ধরলেঃ না। ভয় পাব না। তুমি বল। না শুনলে সারারাত আমার ঘুমই হবে না।

প্রেমদাসকে বলতে হলঃ বড় গিন্নিও মরেছে।

– সে কি গো!

—হ্যাঁ। গলায় দড়ি দিয়ে। মহাদেবের মরার খপর পাওয়ার পরই সে কি রকম হয়ে যায়: তারপর একদিন ছোট গিন্নির মতোই গলায় দড়ি দিয়ে

—কী সর্বনাশ! কার কাছে খবর পেলে ?

তামাক সাজতে সাজতে প্রেমদাস বললে, ওদের পাশের গাঁয়ের একটি মেয়েলোক ওইখানে ঝি-গিরি করে। সেই কার কাছে খপর পেয়ে অবধূতের দোকানে গল্প করছিল।

রাধারাণী নিঃশব্দে বসে রইল।

প্রেমদাস ডাকলে, রাধু!

– বল।

—চল, যাই।

—কোথায় ?

—আমাদের দেশে! ধানের খপর শুনছি মন্দ লয়। ভেবেছিলাম লবানের পর যাব। কিন্তু ছোট মোড়লের খপরটা শুনে মনটা তন্‌ছট করছে। আর ভালো লাগছে না। চল, যাই।

রাধারাণী সাড়া দিলে না।

প্রেমদাস ওর মনের কথা বুঝলে। শান্তকণ্ঠে বললে, দেখ এটা আমাদের দেশ লয়, আমরা এখানকার লোকও লই। পেটের দায়ে

সোঁতের কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে এসেছিলাম। আর ক্যানে? দেশে ফশল হয়েছে। এবার যাই।

রাধারাণী বললে, আমরা এখানকার লোক নই সত্যি। কিন্তু ছোট মোড়লই বা আমাদের কে যে, তার বাড়িতে বিপদ হয়েছে শুনে ছুটতে হবে?

প্রেমদাস হো হো করে হেসে উঠল: ওরাই তো আমাদের আপ্তবন্ধু। হবার সময় ওরাই কোল দিয়েছিল, মরবার সময় ওরাই কাঁধ দেবে। রাজাও আমাদের কেউ লয়, রাণীও আমাদের কেউ লয়। যাবা?

রাধারাণী সাড়া দিলে না।

তারপরে রাধারাণী অনেক কাজ করলে।

চা তৈরি করলে, রান্না করলে। প্রেমদাসকে খাইয়ে নিজে খেলে। এর মধ্যে হ্যাঁ-না একটা কথাও বললে না। প্রেমদাসও না। অন্ধকার দাওয়ায় বসে একতারা বাজিয়ে সে অনেকগুলো গান গাইলে।

রাত্রে শোবার সময় রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, কবে যাবা তাহলে?

—তুমি মন ঠিক করতে পারলেই যাব।

—আমি মন ঠিক করিছি।

রাধারাণী ওর বুকের একান্ত সন্নিকটে সরে এল।

হেসে জিজ্ঞাসা করলে, আমি না যেতে চাইলে আমাকে জোর করেই লিয়ে যেতা তো?

—জোর তো আমি কারো ওপর কখনো করি না।

—ক্যানে কর না? আমার ওপর কি তোমার জোর নাই?

প্রেমদাস একটু চুপ করে রইল। তারপরে বললে, জোর করে লাভ হয় না। খুশি হয়ে যদি যাও, ভালো। না হলে,

—ফেলেই চলে যাবা?

—ঠাকুর যা করেন।

রাধারাণী খুশি হল না। বললে, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি না

জান বলেই এমন করতে পার। নাহলে পারতা না। তখন ঠিক জোর করতা, হ্যাঁ।

—আমাকে ছেড়ে থাকতে পার কি না জানি না তো।

—না, জান না!

—কি করে জানব? কখনও কি ছাড়াছাড়ি থেকিছি?

—পারি না বলেই থাকি নাই।

—তা হতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে রাধারাণী বললে, বেশি দেরি না করাই ভালো।

নিজেকে সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

প্রেমদাস বললে, কিন্তু তোমার যাওয়া তো সোজা লয়।

—ক্যানে?

—জঞ্জাল যা জমিয়েছ, রেখে যাবা কোথা?

—কি জঞ্জাল?—রাধারাণী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

—যা সঙ্গে লিয়ে এসেছিলাম তা বাদে যা জমিয়েছি সবই জঞ্জাল। গাঁয়ে ফিরে যেতে গেলে গাঁয়ের মতো করেই ফিরে যেতে হবে। তা কি পারবা?

রাধারাণী জবাব দিলে না। ভাবতে বসল।

প্রেমদাস বললে, গোঁসাই বলতেন,

রাধারাণী বারুদের মতো ফোঁস করে বাধা দিলেঃ তুমি দিনরাত গোঁসাই-গোঁসাই কর ক্যানে? আমরা তো আর গোঁসাই লই।

—ওরে বাবা! কী যা-তা বলছ। আমরা তাঁর পায়ের ধূলো।

—তবে গোঁসাই-এর কথা বারবার বোলো না। তাঁদের সঙ্গে আমাদের সাথ?

—তা বলি নাই। বলছিলাম,

—না। কিছুই বলতে হবে না। চুপ কর।

বলে রাধারাণী পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

ষোলো

রাধারাণী কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারছে না।

তখনই মনে হচ্ছে সে যাবে। গ্রামের লোকজন, বন্ধু বান্ধব, গাছপালা, নদীর ধার, নদীর পারে সেই ছায়াঘন তেঁতুলবন, সব যেন তাকে ডাকছে। সকালে সূর্য এখানেও ওঠে। কিন্তু ওদের এই একধারে কোণের মধ্যে গোলপাতার ঘরের ভিতর তার ছোঁয়া লাগে না। আর সেখানে, ঝিকমিকিয়ে ওঠে ভোরের আকাশ, গাছের পাতা, নদীর জল। ভোরের প্রথম আলো চুমা দিয়ে যায় কপালে।

তারপর প্রেমদাস। ওকে ছেড়ে রাধারাণীর জীবনের ঘড়ি চলতে পারে একথা ভাবতেই সে অভ্যস্ত নয়। সুতরাং যেতে ওকে হবেই।

কিন্তু কোথায় ? কেনারামপুরে ? সন্ধ্যাবেলায় সেখানে সিনেমা ঘরে আলো জ্বলে উঠে সমারোহে ? সেখানে জলসা হয় ? রাজবাড়ি থেকে মস্ত বড় মোটর আসে তাকে নিয়ে যেতে ? রাজার রাণী পরিয়ে দেবে তার হাতে সোনার বালা ? রেডিও বাজে নানান সুরে, নানান ছন্দে ?

কি আছে কেনারামপুরে ? 'রাঁধার পরে খাওয়া, আর খাওয়ার পরে রাঁধা'। প্রতিষ্ঠা নেই, যশ নেই, ঐশ্বর্য নেই। রাধারাণী কল্পনা করতে পারে: ভোরে উঠে খিড়কির ঘাটে মেয়েদের গল্প। কে কি খেয়েছে, কে কি খেতে পায়নি। শাশুড়ীর মুখে বউএর নিন্দা, বউএর মুখে শাশুড়ীর। তারপরে রান্না। খাওয়ার পরে পাড়া বেড়ান। সন্ধ্যায় রান্নার বালাই নেই। দিনের ভাত জলে ভিজান আছে। শীতকালে সন্ধ্যা লাগতেই প্রদীপ জ্বেলে ঠাণ্ডা ভাত হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে খেয়ে নিয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া। আর গ্রীষ্মের রাত্রে হয় তো বা একটু পাড়া বেড়িয়ে আসা, নয় তো সরকার-বুড়ির কাছে বসে রূপকথা শোনা। বুড়ি রূপকথা বলে চমৎকার !

কিন্তু এ কি জীবন? নিতান্ত নির্জীব জীবনযাত্রা! কেনারামপুরে কোথায় শহরের সোনা আর প্রাণস্পন্দন!

রাধারাণী ঠিক করতে পারে না। তখনই লোভ হয় যাবার, তখনই বেঁকে দাঁড়ায়। প্রেমদাস বোঝে ওর দ্বিধা। আশা করে এই দ্বিধা ওর কেটে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সোনার মোহ, আলোর মোহ, স্পর্ধিত কৃত্রিম জীবনযাত্রার মোহও।

প্রেমদাস শান্তভাবে অপেক্ষা করে। আর রাধারাণী আশ মিটিয়ে সিনেমা দেখে। প্রেমদাস দেখে যায় ওর হাবভাব। ওর বিলাসিতা যেন বেড়েই চলেছে। বুঝতে পারে না কোথা থেকে আসে ওর রংবেরঙের শাড়ি, মাথার ফুলেল তেল, মুখে মাখার রং। ভয় পায়। অরণ্যের অভিশাপ ওকেও ছোঁয় বুঝি। কিন্তু কিছু বলে না।

এমনি করে অগ্রহায়ণ এল। এমন সময় ওদের দেশের সেই যে স্ত্রীলোকটি পাড়ায় দাসীবৃত্তি করে, সে একদিন প্রেমদাসকে জিজ্ঞাসা করে, যাবা না?

—কোথা?

—দেশে ধান নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

প্রেমদাস জানতে চায় নবান্ন কবে। নবান্নের মুখে যাবে, এই ইচ্ছা ওর মনে আছে। স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলে সে কথা।

ঠিক খবর স্ত্রীলোকটি দিতে পারলে না। তবে সাতুই আর নউই এই দুটো দিনের মধ্যেই ও অঞ্চলের নবান্ন।

বাড়ি ফিরে প্রেমদাস বললে, লবান কবে শুনেছ?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রাধারাণী ভুরু আঁকছিল। আয়নার থেকে চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞাসা করলে, কবে?

—কোথাও সাতুই, কোথাও লউই।

—তাই নাকি?

রং-করা সুন্দর মুখখানি রাধারাণী ওর দিকে ফেরালে। একটা কটাক্ষ হেনে বললে, চললাম।

—সিনেমায় ?

রাধারাণী হেসে বললে, না গো না, আমি রোজ সিনেমায় যাই না। অত পয়সা পাব কোথায় ?

—ফিরবা কখন ?

—তা কি করে বলব ?—রাধারাণী হেসে গান ধরলে ঃ

জানিনে তো ফিরব কি না,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা—

রাধারাণী গানটা আর শেষ করলে না। আদর করে প্রেমদাসের দাড়িতে একটা টান দিয়ে চলে গেল।

সেদিন সকালে প্রেমদাসের জন্যে চা নিয়ে এসে রাধারাণী দেখলে, ওদের দাওয়ায় একখানা মাদুরের উপর বসে প্রেমদাস চিঠি লিখছে।

রাধারাণী পরিহাস করে বললে, সকালেই মা সরস্বতীর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল ! কাকে চিঠি লিখছ গো ?

চিঠি থেকে মুখ না তুলেই প্রেমদাস জবাব দিলে, একখানা হরেকেষ্টকে আর একখানা ছোট মোড়লকে।

পত্ররচনা শেষ হওয়া পর্যন্ত রাধারাণী অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু লেখা আর শেষ হয় না। অভ্যাস তো নেই। ঘাড়টা একবার ডানদিকে বেঁকিয়ে একবার বাঁদিকে বেঁকিয়ে ধরে ধরে ধীরে ধীরে লিখছে।

রাধারাণী বললে, কাল রাণীমা ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় ওর সজ্জার পারিপাট্যের কারণটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল।

লিখতে লিখতেই প্রেমদাস শুধু একটা হুঁ দিলে।

রাধারাণী বলে চলল ঃ শুনলেন আমরা চলে যাচ্ছি। জিগ্যেস করলেন, কি আছে সেখানে ? বললাম, একখানা মাটির কুঁড়ে আছে, আখড়া।

তাও চালে তো খড় ছিল না তেমন। গেল বর্ষায় পড়ে গিয়েছে, না আছে কে জানে।

প্রেমদাস আবার একটা হুঁ দিলে।

—বললেন, কি দরকার মা, তার জন্যে ফিরে গিয়ে? কাছেই আমাদের একটা ছোট বাড়ি আছে। তোমাদের দুটি প্রাণীর দিব্যি থাকা হবে। রাজবাড়ি থেকে রাধাবল্লভের প্রসাদ নিয়ে যাবে। আর সন্ধ্যেবেলায় একটু ভগবানের নাম শুনিয়ে যাবে।

প্রেমদাস চুপ করে রইল।

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলে, কি বলব তাঁকে?

প্রেমদাসের দুখানা চিঠি লেখাই শেষ হয়ে গেল। সে-দুখানা একপাশে সরিয়ে রেখে চায়ের বাটিটা তুলে নিলে। একটা চুমুক দিয়ে বললে, কথা তো ভালোই। আগেকার বড় মানুষেরা তাই করতেন। কিন্তু শহরে আর নয় গো।

— কেন?

—এখানে আমাদের অনেক হারাল। সবটা হারাবার আগে গাঁয়ে ফিরে যেতে চাই।

রাধারাণী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, কী আবার হারাল আমাদের? ছিলই বা কি! বরং পেয়েছিই তো অনেক জিনিস। যা কখনো চোখে দেখিনি।

প্রেমদাস হাসলে। বললে, শহরের আলা তোমার চোখ ঝলসে দিয়েছে। তুমি বুঝবা না।

শান্তকণ্ঠে রাধারাণী বললে, তুমি বুঝিয়ে দাও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রেমদাস বললে, বোঝাতে তোমাকে আর পারলাম কই গো! গোঁসাই বলতেন: 'হীরে ফেলে কাচ কুড়ালি। সোনা ফেলে মাটি॥'

আবার গোঁসাই! কিন্তু রাধারাণী আজ আর দপ্ করে জ্বলে উঠল না।

জিজ্ঞাসা করলে, কি লিখলা চিঠিতে ?

—যেছি, সেই কথা।

—কবে ?

—বুধবারে। তাহলে সাতুই ছোট মোড়লের বাড়ি পৌঁছুব আর লউই আমাদের কেনারামপুরে।

রাধারাণী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, তা আমাকে তো বল নাই ? গোছগাছ আছে তো !

প্রেমদাস হেসে বললে, গোছগাছের কিছু নাই গো ! সেই জন্তেই বলি নাই।

—তবে ?

—এখানে যা জমিয়েছ, সব এখানেই পড়ে থাকবে। একদিন যেমন করে এসেছিলাম, তেমনি করেই হুজনে ফিরে যাব।

চিঠিহুখানা ডাক-বাক্সে ফেলবার জন্যে প্রেমদাস খড়ম পরে বেরিয়ে গেল।

রাধারাণী মনকে তৈরি করতে লাগল। প্রেমদাসকে সে চেনে। বুধবার যাওয়া সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় নেই। সে জোর করবে না, কিছু বলবে না, হয়তো নিঃশব্দে অন্য দিকে চেয়ে একটু হাসবে। এই হাসিটাই ভয়ংকর। তার পর ঝুলিটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে যাবে। রাধারাণীর দিকে ফিরে একবার চাইবে না পর্যন্ত। ও কি কম নিষ্ঠুর !

ওদের যখন বিয়ে হয়, রাধারাণীর বয়স তখন দশ কি এগারো। তখন কি কম শাস্তিটা পেতে হয়েছে ওর কাছ থেকে ?

মনে পড়ে, একবার কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় কোথায় যেন ও বেরিয়েছিল। ফিরতে রাত হয়। প্রেমদাস সেই অপরাধে ওকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। সারারাত বাইরে দাওয়ায় বসে কাটাতে হয়েছে। অন্ধকারে গাছগুলো পাতা ছুলিয়েছে, ঝড়ে তালের পাতা শব্দ করেছে, ভয়ে ওর বুক

কেঁপেছে। তবু দ্বার খুলে দেয়নি! এমনি কঠিন ও। সেই যে প্রেমদাসের সম্বন্ধে ওর ভয়, তা এখনও যায়নি।
বাইরের দাওয়ায় আরও এক রাত্রি ওর কেটেছে, তাও এই সঙ্গে মনে পড়ল। যেদিন রাজবাড়ি থেকে নতুনদা ওকে পৌঁছে দিয়ে যায়। সেদিনও অন্ধকার ছিল ঘুট ঘুটে। কিন্তু দরজা খোলাই ছিল। ও নিজেই ঘরে যেতে সাহস করেনি।
কিন্তু এতগুলো সুন্দর সুন্দর শাড়ি ফেলে যাওয়া যায়! মন তৈরি করে কি করে? মেয়েমানুষের মন তো, না আর কিছু! অঞ্জলিকে দিয়ে যাবে এগুলো? হাতের বালাদুটি? প্রেমদাসের সবই যেন বাড়াবাড়ি। বুকের ভিতরটা ওর মোচড় দিয়ে উঠল। অস্ফুটে বলে উঠল: উঃ!
আজ সোমবার। পরশু ভোর থেকে আবার সেই পথ। মাঠের ভিতর দিয়ে, গাছের নিচে দিয়ে, মুঠো মুঠো ছায়া মেখে আবার চলা। গ্রামের পর মাঠ, আবার মাঠের পর গ্রাম।

বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে রাধারাণী অঞ্জলিদের বাড়ি ছুটল। প্রেমদাস এসে পড়লে আর হয়তো বেরুনই হবে না।

প্রেমদাসকে ভয় করতে ও ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু কদিন থেকে আবার যেন ভয় করতে আরম্ভ করেছে। মাঝে মাঝে কেমন করে প্রেমদাস চায়। মনে হয়, ওর বুকের ভিতরটা পর্যন্ত প্রেমদাস দেখতে পাচ্ছে। সন্দেহ হয়, ওর সব কথা সে জেনে ফেলেছে। নতুনদার চিঠিখানাও পড়েছে বোধ হয়।
কিচ্ছু সে বলছে না বটে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে উত্তাপ জমছে হয়তো। সেই উত্তাপ একদিন ফেটে বেরুতে চাইবে। রাধারাণীর সমস্ত দেহ সেদিন ভূমিকম্পের মেদিনীর মতো কেঁপে উঠবে।
প্রেমদাসকে আবার রাধারাণী ভয় করতে আরম্ভ করেছে।
রাধারাণী ছুটল অঞ্জলিদের বাড়ি। যাওয়ার আগে তার সঙ্গে দেখা করে না গেলে ভালো দেখাবেনা। অগ্রহায়ণের শেষের দিকে ওর বিয়ে নাকি ঠিক হয়ে গিয়েছে। তারই বা আর কদিন!

প্রেমদাসের সবই যেন বাড়াবাড়ি। এই কয়টা দিন থেকে অঞ্জলির বিয়েটা দেখে গেলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত না।

অঞ্জলিদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই তার মনে হল, গলির মধ্যে কে যেন একজন ঘোরাঘুরি করছে। অরবিন্দের মতো। অরবিন্দকে অনুপমের সঙ্গে দু-একবার সে দেখেছে। কথা কয়নি।

হঠাৎ মনে হল, অরবিন্দকেই যেন সে খুঁজছিল। মনের গভীরে। অথচ সেই কথাটাই সে টের পাচ্ছিল না।

হন হন করে এসে অরবিন্দ ওর হাতে একখানা খাম দিলে। বললে, নতুনদা পাঠিয়েছেন।

নতুনদা! অন্ধকারে ভাসতে ভাসতে রাধারাণী যেন একটা কলার ভেলার সন্ধান পেল।

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে, নতুনদা! কোথায় তিনি?

—তিনি তো কলকাতায়।

তাই বটে। নতুনদা তো কলকাতায়।

অরবিন্দ চলে গেল। আর খামখানা নিয়ে রাধারাণী বাড়ি ফিরে এল। দেখলে, তখনও প্রেমদাস ফেরেনি। তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে চিঠিখানা খুলে পড়ল। অনুপম নতুন একখানা বই পরিচালনা করছে। রাধারাণীর ইচ্ছা হলে এ বইতে তাকে একটা পার্ট দিতে পারে।

ওঃ! সিনেমা!

রাধারাণী চিঠিখানাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। আনন্দে তার চোখ বন্ধ হয়ে এল।

সতেরো

মানুষের জীবনে একটা রাত্রি বড় সামান্য সময় নয়।

রূপকথার রাণী নদীতে একটা ডুব দিয়ে উঠল যখন তার সারা দেহ অপরূপ রূপলাবণ্যে ঝলমল করে উঠল। ভাবলে, একটা ডুবেই যদি এত রূপ, আর একটা ডুব দিলে না জানি আরও কত রূপ হবে। দিলে আর একটা ডুব, উঠল কদাকার হয়ে। রাণী কেঁদে আকুল!

যখন লোভ আসে, মোহ আসে, কান্নাই তার শেষ পরিণতি।

অঞ্জলিদের বাড়ি থেকে রাধারাণী যখন বার হল, তার মন অনেকখানি শান্ত হয়েছে। গ্রামের আখড়া তাকে আকর্ষণ করছে না সত্য, কিন্তু প্রেমদাসকে ছেড়ে থাকার কথা সে ভাবতেই পারে না। সারাজীবন তাদের একসঙ্গে কেটেছে। একসঙ্গে কাটাতেই সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সুতরাং কেনারামপুরের আখড়া তাকে আকর্ষণ করুক আর নাই করুক, সেইখানেই তাকে ফিরে যেতে হবে, যখন প্রেমদাস সেখানে ফিরে যাচ্ছে।

মনের মধ্যে একটা ডুব দিয়ে এই বস্তু সে পেয়েছিল। মানুষের সব ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, সমস্ত আশা মেটে না। এই ক'টা মাসে রাধারাণী যা পেয়েছে তা তার আশার অতিরিক্ত। তার স্বপ্নেরও অগোচর। তাইতেই সন্তুষ্ট হয়ে সে ফিরে যাবে তার গ্রামে,—তার পুরাতন স্বাভাবিক জীবনে। একটা ডুবে এই সান্ত্বনা এবং শক্তি সে পেয়েছিল।

ইতিমধ্যে এল অরবিন্দ অনুপমের চিঠি নিয়েঃ রাধারাণী ইচ্ছা করলে অনুপমের নতুন বইতে পার্ট নিতে পারে। ইচ্ছা করলেই?

হ্যাঁ, ইচ্ছা করলেই।

আপন মনেই রাধারাণী হাসলেঃ ইচ্ছা করা এতই সহজ কিনা! ইচ্ছা করলেই হল!

চিঠিখানা সে কিন্তু কোথাও রাখতে সাহস করলে না। কি জানি যদি প্রেমদাসের চোখে পড়ে যায়। ওর চোখ যে সর্বত্র ঘোরে। আর তার পরেই এমন শান্ত, এমন সহজ হয়ে যায় যে, বোঝা যায় না চোখে পড়েছে কি না। সে আর এক বিপদ।

রাধারাণী ব্লাউসের নিচে, বুকের একান্ত সন্নিকটে চিঠিখানা রেখে দিলে।

সেও আর এক বিপদ! ঘুরতে ফিরতে, উঠতে বসতে কেবলই কাঁটার মতো বেঁধে। রাধারাণী স্বস্তি পায় না, শান্তি পায় না।

তারপরে এল রাত্রি।

রাধারাণী ইচ্ছা করেই রান্নাঘরের কাজে অনর্থক নিজেকে ব্যাপৃত রাখলে অনেকক্ষণ। যখন শুতে এল তখন প্রেমদাসের নাক ডাকছে! ঘরে ফিরে যাবার আনন্দে কী পরিতৃপ্তিতে ঘুমুচ্ছে সে!

আশ্চর্য মানুষ প্রেমদাস! এতদিন যে এখানে কাটাল,—কত সুখ, কত আশা, কত আনন্দে, কত ভালোবাসায়,—তবু শহরকে সে মোটেই ভালোবাসতে পারলে না!

আশ্চর্য মানুষ!

রাধারাণী জানালার বাইরে চাইলে। কী ঘুটঘুটে অন্ধকার!

বুকের কাছে চিঠিখানা তখনও খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধছিল। ওর মনে মোহ এল, লোভ এল। লোভে-মোহে তিমিরবলয়িত মনের গহনে রূপকথার সুয়োরাণীর মতো সে দ্বিতীয় একটা ডুব দিলে।

ভাগ্য ভালো, যখন উঠল নিজের রূপ সে দেখতে পেলে না।

যখন ভোর হল, রাধারাণী উঠে বসল। রাত্রে সে কি ঘুমিয়েছিল? মনে করতে পারলে না। না কি জেগেই কাটিয়েছে? ওর নিজের মনে হয়, ঘুমোয় নি। একটি ফোঁটাও না। কিন্তু চোখে ঘুমের ঘোর রয়েছে। ঘুমের ঘোর নয়? কিসের ঘোর তবে?

অপাঙ্গে একবার চেয়ে দেখলে, প্রেমদাস অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ওর দিকে চাইতে পারলে না সে। পাছে হঠাৎ সে জেগে ওঠে। ওর

চোখে চোখ পড়ে যায় তার। তাড়াতাড়ি উঠে রাধারাণী ঘর থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল।

তার সমস্ত দেহে-মনে কেমন যেন ভয়ত্রস্ততা। অকারণে চমকে ওঠে, অকারণে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কাজ করে, কিন্তু কাজে যেন মন নেই। তবু করে, নইলে প্রেমদাসের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

প্রেমদাসকে সকালে চা দিয়ে এল। কিন্তু ওর দিকে না চেয়েই। একটাও মিষ্টি হাসি কিংবা তীক্ষ্ণ পরিহাস না করেই। রান্নাঘরে ফিরে এসে উৎকর্ণ বসে রইল, থলিটা হাতে করে খড়ম পায়ে দিয়ে কখন সে বাজারে যায়।

একটু পরে প্রেমদাস বাজারে গেল।

এবং প্রায় তার পিছু-পিছুই একখানা ছ্যাকড়া গাড়িতে বাজনা বাজিয়ে কোন্ এক সিনেমার বিজ্ঞাপন চলে গেল। ওর বুকের ভিতরটাও যেন তালে তালে নেচে উঠল। চোখের সাননে ভেসে উঠল, সিনেমা-গৃহের আলো এবং বাজনা।

ছুটে বেরিয়ে এসে ও বাগভেরেণ্ডার বেড়ার ধারে দাঁড়াল।

ওটা কে? ওই দূরে গলির ভিতর? একটা ফড়িং-এর কোমরে সুতো বেঁধে তাকে ওড়াচ্ছে আর তার পিছু পিছু ছুটছে? বিমলির ভাই গোপাল না?

গোপাল এই দিকেই ছুটে আসছে।

রাধারাণী তাকে হাত-ইসারায় ডাকলে।

ডাকটা যে সকাল বেলার গরম-গরম তেলেভাজার জন্যে সে বিষয়ে গোপালচন্দ্রের তিলমাত্র সংশয় নেই।

ছুটে এসে ডান হাতটা বাড়িয়ে বললে, কই দাও।

—কি দোব রে?

—পয়সা। তেলেভাজা আনতে হবে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। হবেই তো।

রাধারাণী খুঁট থেকে একটা দুআনি বের করে দিলে। পয়সা পেয়েই গোপাল ছুটছিল।

রাধারাণী বললে, আর একটা কথা শোন্।

—কি কথা?

—তুই অরবিন্দবাবুকে চিনিস তো?

—কেন চিনব না?

—তাকে এক্ষুণি একবার ডেকে দিতে পারবি? এক্ষুণি? বলবি বিশেষ দরকার।

গোপাল বিজ্ঞের মতো একটু চিন্তা করল। জিজ্ঞাসা করলে, আগে তেলে-ভাজা, না আগে অরবিন্দবাবু?

—আগে অরবিন্দ বাবু। ছুট্টে যা। ফেরবার পথে তেলে-ভাজা আনবি। বুঝলি?

গোপাল মুখে এঞ্জিনের মতো একটা হুইস্‌ল দিয়ে ছুটল।

এ-ই সময়!

কদিন থেকে প্রেমদাস আর কাছারীর কাছে আমগাছতলায় গান গেয়ে ভিক্ষা করতে যাচ্ছে না। দুপুরে বাড়িতেই থাকে। এ-ই সময়। প্রেমদাস এখন গিয়ে মুদির দোকানে তামাক খাবে এবং গল্প করবে। কাল ভোরে চলে যাবে। সুতরাং আজ গল্প একটু বেশিই হবে। ওইখানে ওদের একটি দল আছে। তারপরে দেশের সেই যে মেয়েটি পাঁচ-বাড়ি ঝি-গিরি করে, তার সঙ্গেও হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে। তাহলে তো কথাই নেই। বাজার পর্যন্ত প্রেমদাস পৌঁছুতে পারবে কি না সেই সমস্যা।

এ-ই সময়!

রাধারাণী বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছটফট করতে লাগল।

কিছু পরে গোপাল এল, এঞ্জিনের মতো ছুটতে ছুটতে। হাতে এক ঠোঙা তেলেভাজা। তার থেকে একখানা তেলেভাজা তুলে নিয়ে রাধারাণী বললে, ওগুলো তুই খেগে যা।

—সব !—গোপাল অবাক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সব। হ্যাঁরে, সেই বাবুটিকে খবর দিয়েছিস ?

—দিয়েছি। এক্ষুণি আসছেন।

পাছে রাধারাণী মত পরিবর্তন করে আরও গোটা কয়েক তেলেভাজা তুলে নেয়, সেই ভয়ে গোপাল আর দাঁড়াল না। চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাইক্‌ল্ চড়ে অরবিন্দ উপস্থিত।

—আমাকে ডেকেছেন ?

—হ্যাঁ।

—কিছু খবর আছে ?

অরবিন্দের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা।

হঠাৎ রাধারাণীর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। প্রাণপণে সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে বললে, আছে। খুব জরুরী খবর।

—কি বলুন।

—তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজি। কিন্তু আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে কে ?

—বলেন তো, আমি পারি।

—পারেন ? আজকেই পারেন ? আজ রাত্রেই ?

অরবিন্দ ঠিক এ রকম প্রস্তাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। রাধারাণীর চিঠি তার চিঠির মধ্যেই এসেছে। চিঠিতে কি লেখা আছে তা সে জানে। রাধারাণী এত বড় সুযোগ ছাড়বে না বলেই সে অনুমান করেছিল। কিন্তু আজ রাত্রেই নিয়ে যেতে হবে, এমন ভাবেনি।

দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করলে, আজ রাত্রেই ?

—হ্যাঁ। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।—অত্যন্ত দ্রুতবেগে রাধারাণী বলে চলল,—আমার স্বামী কাল ভোরেই আমাকে জোর করে গাঁয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার আগেই না গেলে আর আমার যাওয়াই হবে না।

রাধারাণী এইটুকু বলতেই হাঁফিয়ে উঠল। উত্তেজনায় তার চোখ বড়

বড় হয়ে উঠেছে, কান গরম হয়ে উঠেছে, নাক দিয়ে গরম নিশ্বাস পড়ছে।

অরবিন্দ অনুপমের সুযোগ্য শিষ্য। শুধু বেশে ভূষায়, কথায়-বার্তায়ই নয়, দুঃসাহসেও।

একটু ভেবে বললে, পারি।

—পারেন?—রাধারাণী যেন লাফিয়ে উঠল,—আজ রাত্রেই পারেন?

—তা পারি।

—আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই কিন্তু।

রাধারাণী তেমনি ব্যস্তভাবেই বললে।

—তার জন্যে আটকাবে না।—অরবিন্দ হাসলে। বললে,—কিন্তু নতুনদা রাগ করবেন না তো?

—না, না। আমাকে দেখলে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন।

—তা জানি।—অরবিন্দ আবার হাসলে,—ঠিক আছে। ভোর সাড়ে তিনটেয় গাড়ি। আমি ছুটোয় আসব। এই কথা রইল।

অরবিন্দ তার সাইক্লে উঠে চলে গেল।

শিস দিতে দিতে অরবিন্দ চলে গেল, কিন্তু রাধারাণী পারলে না। তার পা যেন মাটিতে আটকে গেছে। তার যেন নড়বার ক্ষমতা নেই। সেই বাঘ-ভেরেণ্ডার বেড়ার ধারে স্থাণুর মতো সে দাঁড়িয়ে রইল, অরবিন্দের চলে যাওয়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। দেখতে দেখতে ওদিকের রাস্তার মোড়ে অরবিন্দের সাইক্‌ল্ অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু ওর যেন সেদিকেও খেয়াল নেই। ওর মনের চোখের সামনে তখনও যেন সাইক্‌ল্ চলেছে। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে। কত মোড় এঁকে বেঁকে। কত গলি, কত বড় রাস্তা পার হয়ে।

অরবিন্দের সাইক্‌ল্ সেটা নয়। তার জানা-আজানা, চেনা-অচেনা কোনো লোকেরই যেন নয়। তবু বিশেষ একটি সাইক্‌ল্। সেটা

চলছে। অহরহ চলছে। অবিশ্রান্ত গতিতে। থেকে থেকে ক্রিং ক্রিং করে তার ঘণ্টা বাজছে। কোথায়? তারই স্নায়ু-শিরায় কি? অবিশ্রান্ত সাইক্‌ল্ যে চলছে, সেই বা কোথায়? সেও কি তার মস্তিষ্কের অলিতে গলিতে?

রাধারাণী জানে না। এমন কথা সে ভাবতেই পারে না।

কিন্তু বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার সমস্ত দেহে যেন একটা শিহরণ খেলে গেল। একটা অস্বাস্থ্যকর শিহরণ। কিছুকাল আগে একবার তার ম্যালেরিয়া হয়েছিল। শরতের অপরাহ্নে কচুরীপানায় ভরা ডোবার ধার দিয়ে চলতে চলতে সেদিন তার গা এমনি শিরশির করে উঠেছিল। সেই রাত্রেই সে জ্বরে পড়ে।

রাধারাণীর হঠাৎ মনে হল, তার জ্বর হয়নি তো?

গা যেন গরমই বোধ হচ্ছে। দুই চোখে অসহ্য জ্বালা। ঠোঁট-জিভ ঘন ঘন শুকিয়ে আসছে। জ্বর হয়নি তো?

রাধারাণী বাড়ির মধ্যে চলে গেল। শোয়ার ঘরের দাওয়ায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। রোজ সকালে তার কত কাজ। কিন্তু কী যে অত কাজ, দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কিছুতেই যেন সে মনে করতে পারছে না।

গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে প্রেমদাস বাজার থেকে ফিরল:

নয়ন কমল অতি নিরমল
তাহে কাজরের রেখা!
যমুনা কিনারে মেঘের ধারাটি
অধিক দিয়াছে দেখা॥

গাইতে গাইতেই বাজারের থলিটি রাধারাণীর পায়ের কাছে নামিয়ে দিলে।

হাসতে হাসতে বললে, আজ এক কাণ্ড করেছি। খরচ কিছু বেশি হয়ে গেল। কপি এনিছি, লতুন আলু, বড় মাছ আর, তুমি ভালোবাস বলে, কচি লাউ আর কড়া কড়া চিংড়ি মাছ। তারপরে

হঠাৎ প্রেমদাসের দৃষ্টি পড়ল রাধারাণীর চোখের দিকে। সে চোখে যেন পলক পড়ছে না। দুটি তারা স্থির, অচঞ্চল।

—অমন করে চেয়ে আছ ক্যানে? শরীর ভালো নাই?

প্রেমদাস চিৎকার করে উঠল। সেই চিৎকারে একবার চমকে উঠেই রাধারাণী সম্বিত ফিরে পেলে। তাড়াতাড়ি বাজারের থলিটা তুলে নিয়ে দ্রুতপদে রান্নাঘরে চলে গেল। সকাল থেকে কোনো কাজই তার হয়নি। ব্যস্তভাবে উনান ধরাতে বসল।

উনানে কয়লা দিয়ে দাওয়ার উপরে বাজারের তরকারিগুলো ঢাললে। ঢেলে, অপলক নেত্রে সেগুলোর দিকে চেয়ে রইল। বুঝতে বিলম্ব হল না, প্রেমদাস যেন বেছে বেছে, তার সমস্ত-হৃদয় ঢেলে, রাধারাণীর প্রিয় জিনিসগুলো এনেছে!

তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। দুই চোখ দিয়ে দরদরধারে জল পড়তে লাগল। মনে হল, তার সর্বদেহ যেন অবশ হয়ে গেছে। প্রেমদাস সামনে নেই। থাকলে হয়তো গান ধরত, 'ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদে'।

কিন্তু তখনই প্রেমদাসের খড়মের শব্দ পাওয়া গেল। এইদিকেই আসছে। রাধারাণী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ওর দিকে পিছন ফিরে তরকারি কুটতে বসল। যেন প্রেমদাস ওর মুখ দেখতে না পায়। যা তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি! একেবারে বুকের ভিতর পর্যন্ত যেন তীব্র আলোর সূচের মতো বেঁধে!

কিন্তু প্রেমদাস ওর মনের অবস্থা কিছু কিছু বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে, ওর কেনারামপুরে ফেরার আন্তরিক ইচ্ছা নেই। প্রেমদাস কিন্তু তার জন্যে রাগ করছে না। রাধারাণীর এই তো সখ-সৌখীনতা, লোভ-লালসার বয়স। অখ্যাত গণ্ডগ্রাম থেকে হঠাৎ সে বিজলী-আলোর দেশে এসে পড়েছে। ভাগ্যচক্রে যশ পেয়েছে, খ্যাতি পেয়েছে, শ্রদ্ধা-প্রীতি পেয়েছে, প্রত্যাশার বহুগুণ অধিক। ওর বয়সে সেই সমস্ত দুর্লভ বস্তু ছেড়ে যেতে যদি ওর কষ্ট হয়, দোষ দেওয়া যায় না।

প্রেমদাস তা বোঝে। তাই ওর উপরে তার রাগ নেই। নানারকম তোয়াজ করে ওকে যাতে খুশিমনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই ওর চেষ্টা।

রাধারাণীর সামনে কলকেটা নামিয়ে প্রেমদাস বললে, একটু আগুন দাও দিকি।

ওর দিকে না চেয়েই রাধারাণী একটা আধ-জ্বলন্ত ঘুঁটে উনান থেকে বার করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিলে।

আঙুল দিয়ে সেটা ভেঙে কলকেয় তুলতে তুলতে প্রেমদাস বললে, একটু চা হক ক্যানে।

উনান ধরে গিয়েছিল। রাধারাণী নিঃশব্দে চায়ের কেট্‌লিটা তার উপর চড়িয়ে দিলে।

প্রেমদাস বললে, চা কিছু কিনে লিয়ে যেতেই হবে। ওটা ছাড়া যাবে না।

রাধারাণী সাড়া দিলে না।

প্রেমদাস আবার বললে, এবারে যেন কতকটা স্বগতভাবে,—ওঃ! আচ্ছা নেশা ধরিয়েছিলাম যা হোক! ছাড়তে দম বেরুবে!

রাধারাণী নিঃশব্দে তরকারি কুটতে কুটতে অপাঙ্গে একবার কেট্‌লীর দিকে চাইলে। ধোঁয়া বেরুচ্ছে জল দিয়ে। বঁটিটা কাৎ করে রেখে সে কেট্‌লী নামাল। রান্নাঘরের ভিতর থেকে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে, আবারও প্রেমদাসের দিকে পিছু ফিরে চা তৈরি করতে বসল।

তারপরে এক পেয়ালা চা প্রেমদাসের দিকে এগিয়ে দিলে।

রাধারাণীকে মাত্র এক পেয়ালা চা তৈরি করতে দেখে প্রেমদাস অবাক হল। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি চা খাবা না?

রাধারাণী ঘাড় নেড়ে 'না' জানিয়ে অকারণেই রান্নাঘরের ভিতর চলে গেল।

রাগ। অন্তত প্রেমদাস তাই বুঝলে। রাগের সময় রাধারাণীকে ঘাটাঘাঁটি করা নিরাপদ নয়। ক্রোধ উপশমের জন্যে কিছু সময় দেওয়া

দরকার। তামাক টানতে টানতে খড়ম পায়ে প্রেমদাস বোধ হয় তার বন্ধু মুদির দোকানের দিকেই বেরিয়ে গেল।

আর রাধারাণী ভাবতে বসল ঃ

কে বলতে পারে, সে বনবালার মতোই খ্যাতি লাভ করবে না? গানের গলা তারও তো খারাপ নয়। অনুপম নিজেই তো তার মুখের, তার দেহের গড়নের কত প্রশংসা করেছে। কে বলতে পারে, বনবালার মতো সেও আড়াই শো টাকার জুতো পরবে না? কে জানে, আড়াই শো টাকার জুতো হয় কি না। হলেই বা কেমনতর সে জুতো। কিন্তু ভাবতে ভাবতে তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। এবং সেই ঝাপসা দৃষ্টির সামনে আড়াই শো টাকা জুতা-পরা তার নিজেরই পদযুগল যেন দোল খেতে লাগল।

অনেক বিলম্বে প্রেমদাস যখন মুদির দোকান থেকে ফিরল, এক রাশ তরকারির মধ্যে খোলা বঁটির সামনে রাধারাণী বিহ্বলের মত বসে।

—রান্না হয়েছে নাকি?—প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করলে।

রাধারাণী চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। উনানের দিকে চেয়ে দেখলে উনান নিভে গেছে। তার সমস্ত শরীর ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল।

—ও কি! অমন করছ ক্যানে? অমন করে কাঁপছ ক্যানে? শরীর ভালো আছে তো?

রাধারাণী হয়তো পড়েই যেত। প্রেমদাস গিয়ে তাকে ধরে ফেললে। ওর বাহুবেষ্টনের মধ্যেও রাধারাণীর দেহ সমানে কেঁপে চলেছে।

—কী হয়েছে! কী হয়েছে রাধু!

—তুমি আমাকে মারবা না তো?

কোনো রকমে জড়িয়ে জড়িয়ে রাধারাণী বললে।

—মারব?—প্রেমদাসের বিস্ময়ের আর শেষ নেই,—মারব ক্যানে?

—রান্না হয় নাই বলে?

—তাই মারব? কী পাগলের মতো বকছ?

—আমার শরীর ভালো নয়।

তাই বটে। ওর কম্পিত, স্খলিত কণ্ঠে প্রেমদাসেরও সেই সন্দেহই হল। বললে, চল ঘরে গিয়ে শোবা চল।

ওকে ঘরে শুইয়ে এসে প্রেমদাস আবার উনান ধরিয়ে নিজেই রান্না চড়াল। নিতান্ত সাধারণ রান্না। ভাত আর তার সঙ্গে সিদ্ধ। সেগুলো উনানে চড়িয়ে এসে বড় বড় গলদা চিংড়ি দুটির দিকে সকাতরে চেয়ে রইল। তার হাতে পড়ে ও-দুটির যে কী দুর্গতি হবে, ভাবতেই কষ্ট বোধ হল।

এমন সময় ওঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাধারাণী মাছ কুটতে বসল।

—আবার তুমি বেরিয়ে এলা ?

রাধারাণী তার প্রশ্নের উত্তর দিলে না। ভারি গলায় বললে, তুমি চান করে এস। তার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে।

রাধারাণী কিন্তু কিছু খেল না।

প্রেমদাসের খাওয়া হয়ে গেলে তার থালাটা সে ঘাট থেকে ধুয়ে নিয়ে এল। এবং রান্নাঘরের দাওয়াতেই একখানা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও ঘুম আসে না। চোখ বন্ধ করলেই মূল্যবান জুতো-পরা এক জোড়া পা তার চোখের সামনে দুলতে থাকে। কার পা ? বনবালার, না তার নিজেরই ?

রাধারাণীর হল কী ! সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে।

কম্বলের উপর সে উঠে বসল। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে। কিছুই তো তার অপরিচিত ঠেকছে না। রাধারাণী পা টিপে টিপে শোবার ঘরের দরজার গোড়ায় দাঁড়াল। ভিতরে প্রেমদাসের নাক ডাকছে ভয়ঙ্কর শব্দে।

সব ঠিক আছে প্রেমদাসের। প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবন।

হঠাৎ তার মনে হল, একবার বিমলাদের বাড়ি গেলে হয় না ! সে

কেমন আছে, অনেক দিন খবর নেওয়া হয়নি। প্রেমদাস অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক।

বিমলার মা ওকে দেখে খুব খুশি হলেন। বিমলার চিঠি এসেছে। পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত খুব। কিন্তু তারই মধ্যে মাকে নিয়মিত চিঠি দিতে তার মোটে ভুল হয় না।

কন্যাগৌরবে বিমলার মা হাসতে লাগলেন। ভালো আছে, সে খুবই ভালো আছে।

তাই থাকে। কলকাতা গেলে সবাই ভালো থাকে। এই কথাটাই ওখান থেকে ফেরবার পর রাধারাণীর মনে সারাক্ষণ গুঞ্জন করতে লাগল। অরণ্যের অভিশাপ, না ছাই! গোঁসাই-এর মুখ থেকে শুনেছে প্রেমদাস। এত বাজে কথাও গোঁসাই বলতে পারেন! যত উদ্ভট কথা! মাথাও নেই, মুণ্ডুও নেই!

কলকাতা গেলে সেও নিশ্চয় ভালো থাকবে। বিমলার মতোই খুব ভালো থাকবে। কিংবা হয়তো আরও ভালো থাকবে।

কিন্তু প্রেমদাস?

হ্যাঁ। ওর জন্যে রাধারাণীর কষ্ট হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ক'টা দিনের জন্যে? বনবালার মতো হতে খুব বেশি সময় ওর লাগবে না। তখন প্রেমদাসকে ও নিজের কাছে নিয়ে আসবে। আর ছেড়ে দেবে না।

কিন্তু কিছুই যেন রাধারাণী সুস্থভাবে ভাবতে পারছে না। ওর মাথায় যেন সমস্ত ক্ষণ আগুন জ্বলছে। চোখেও। কিসের আগুন কে জানে। থেকে থেকে মুখে মাথায় জলের ছিটে দিচ্ছে। একটু ক্ষণের জন্যে চোখ-মুখ শীতল হচ্ছে। তারপরে আবার যে জ্বালা, সেই জ্বালা!

ও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

কিংবা মহাদেবের মতো ওকেও কি কেউ হাতছানি দিয়ে ডাকছে?

অপদেবতা ভর করেছে কি ওর মাথার উপর?

রাধারাণী কিন্তু ও কথা ভাবতে পারছে না। ও সন্দেহ তার মনের মধ্যে আসছেই না। মহাদেবের কথা হয়তো ভুলেই গেছে ও।

কিন্তু জ্বালা, মাথার মধ্যেকার এবং দুই চোখের ওই জ্বালা ওকে যেন কিছুতে স্থির হতে দিচ্ছে না। ওর বুকের ভিতরে সর্বক্ষণ যেন গুরুগুরু বাজনা চলেছে। মনে হচ্ছে, বুকটা যেন একেবারেই খালি হয়ে গিয়েছে। ওর মধ্যে যেন কিছু নেই। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে হাঁফ ধরে যাচ্ছে।

আর ভয়।

প্রেমদাসকে ভয়। ওর পালিয়ে যাবার মতলবের ইঙ্গিতমাত্রও প্রেমদাস পায়নি। তবু একটা অহেতুক ভয়ে ও আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে। প্রেমদাসকে এড়িয়ে চলছে। প্রেমদাসের কণ্ঠস্বরে ওর বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠছে। দূর থেকে খড়মের শব্দ শুনলে ওর দেহটা কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

প্রেমদাস যে ওর এই অবস্থা লক্ষ্য করলে না তা নয়। কিন্তু সে অন্য রকম বুঝলে। ভাবলে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাধারাণীকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলেই বুঝি এই অবস্থা। কিন্তু সে মনঃস্থির করে ফেলেছে। শহরে আর সে কিছুতেই থাকবে না। দেশে ফিরে যাবেই। সুতরাং দেশে ফিরতে রাধারাণীর যতই অনিচ্ছা থাক, তাকে সে প্রশ্রয় দেবে না। কিছুতেই সে দুর্বল হবে না। মনে তার বিশ্বাস আছে, দেশের গাছ-পালা, পথ-ঘাট, ধানের জমি, এসবের মধ্যে গিয়ে পড়লে শহরের কথা তার মনেই থাকবে না। রাধারাণীকে নির্জনে থাকবার সুযোগ দেবার জন্যে সেও বাইরে-বাইরে ঘুরতে লাগল।

অন্যদিন, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে, সে দাওয়ায় বসে গুণ গুণ করে গান করতে করতে রাধারাণীর জন্যে অপেক্ষা করে। কিছুক্ষণ বসে গল্প করে তারপর দুজনে একসঙ্গে শুতে যায়। আজ নিঃশব্দেই রাত্রের আহার সেরে নিলে। বাইরে দাওয়ায় বসল বটে, কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যেও নয়, রাধারাণীর অপেক্ষাতেও নয়। একটুক্ষণ বসেই ঘরে শুতে চলে গেল।

সন্ধ্যার পর থেকেই রাধারাণীরও দেহে যেন শক্তি ফিরে আসতে লাগল।

তার মুখের ভাব কঠিন হতে লাগল। রান্না করতে লাগল জোরে জোরে। শোবার ঘরে বসেও প্রেমদাস তার হাতা-বেড়ির শব্দ পেতে লাগল।

রাত্রে, রাত্রি ন'টার কম নয় তখন, বেড়ার ওপারে যেন অরবিন্দের উচ্চ-কণ্ঠের স্বর পাওয়া গেল। অস্বাভাবিক জোরে জোরে কাকে যেন কি বললে। ঈঙ্গিতটা রাধারাণী ঝুঝলে। বুঝলে, অন্য লোকটা উপলক্ষ্য মাত্র। তার সঙ্গে অন্য কথার মাধ্যমে আসলে সে রাধারাণীর সঙ্গেই সংযোগ স্থাপন করলে। রাধারাণী আরও শক্ত হল।

শক্ত হল বটে, কিন্তু প্রেমদাসের সামনে যাবার সাহস শেষ পর্যন্ত হল না। শেষ পর্যন্ত চুপি চুপি একবার করে দেখে আসতে লাগল, প্রেমদাস ঘুমিয়েছে কি না। অবশেষে যখন প্রেমদাসের নাসিকাধ্বনিতে নিশ্চিত হল সে ঘুমিয়েছে, তখন চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। চোরের মতোই চুপি চুপি অন্ধকার ঘরের মধ্যে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। কি দেখলে ওই জানে। হয়তো কিছুই দেখলে না। শুধু ছোট স্যুটকেশটা তুলে নিলে।

তারপর সন্তর্পণে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঘরে। পাশের জানালাটাও খোলা ছিল, সেটাও বন্ধ করে দিলে। প্রেমদাসের শরীরটা কদিন থেকে খুব ভালো নেই। একটু সর্দির মতো হয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়াটা ঠিক নয়।

অবশেষে বাইরের দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসলে। কোলের উপর স্যুটকেসটি। তাতে খানকয়েক ভালো ভালো শাড়ি-ব্লাউজ আছে। অপেক্ষা করতে লাগল অরবিন্দের শেষ সংকেতের।

পরদিন প্রেমদাসের যখন ঘুম ভাঙল, তখনও অন্ধকার রয়েছে। আর একদিন এমনি সময়েই তার ঘুম ভেঙেছিল, এমনি চলে যাওয়ার তাগিদে। উঠে জানালার বাইরের দিকে চাইতেই সেই কথাটা মনে পড়ল।

হাত বাড়িয়ে দেখলে রাধারাণী বিছানায় নেই। মুখ ধুতে গেছে বোধ করি। প্রেমদাসও উঠল। মুখ ধোবার জন্যে ডোবার দিকে গেল।

একটু চা খেয়ে যেতে পারলে ভালো হত। রাধারাণীর অসাধ্য কাজ কিছু নেই। বললে, সে ব্যবস্থাও হয়তো করতে পারবে।

কিন্তু ডোবার ঘাটে রাধারাণী তো নেই। কোথায় গেল?

হয়তো রান্নাঘরে একটু চায়ের ব্যবস্থাই করছে। তার তো ভীষণ চায়ের নেশা কি না। গাঁয়ে ফিরে কোথায় চা পাবে কে জানে।

মুখ ধুয়ে এসে রান্নাঘরের সামনে প্রেমদাস দাঁড়াল।

শিকল বন্ধ।

তাহলে কোথায় যেতে পারে? প্রেমদাস ভীষণ রেগে গেল। এই হল রাধারাণীর দোষ। যখন কোথাও যাবার তাড়া থাকে, তখনই তার যত কাজ পড়ে যায়!

থাকগে। মরুকগে। যাবার ইচ্ছা যখন ওর নেই, না গেলেই পারে। কে ওকে যাবার জন্যে সাধছে! সকাল হয়ে আসে। প্রেমদাস আর ওর জন্যে অপেক্ষা করবে না। ইচ্ছা হয়, পরে আসবে। না হলে আসবে না।

প্রেমদাস রাগে গরগর করতে করতে বহির্বাসটা গায়ে দিলে। ঝুলিটা পেড়ে কাঁধে ফেলতে যাবে, হঠাৎ কোণের দিকে নজর পড়ল: রাধারাণীর বাক্সটা নেই তো! ওই বাক্সটাতেই ওর কাপড়-চোপড়, প্রসাধনের জিনিসপত্র, আরও টুকিটাকি কি সব থাকে।

ঝুলিটা আর কাঁধ পর্যন্ত উঠল না। হাতেই ঝুলতে লাগল।

সেইখানে দাঁড়িয়েই প্রেমদাস তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছোট্ট ঘর খানির সর্বত্র বুলিয়ে নিলে। প্রেমদাসের দুখানা ধুতি একটা কামিজ দড়িতে ঝুলছে। কিন্তু না। কোথাও রাধারাণীর জিনিসপত্রের চিহ্ন মাত্র নেই।

স্তব্ধভাবে প্রেমদাস তক্তাপোষের উপর নিঃশব্দে কতক্ষণ বসে রইল। একটা বিড়ি ধরিয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে হাসলে একবার। তারপর ঝুলিটা কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ডানহাতে নিলে একতারাটা। তারপর ঘরের কোনো দিকে দৃষ্টি না দিয়ে পথে নামল। দরজার শিকলটা তুলে দেবার জন্যেও পিছু ফিরে চাইলে না।

একেবারে পথে। যে-পথ গেছে তার গাঁয়ের দিকে।